সমালোচনী মাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বৎসর।

নব বর্ষ।

দেখ, আসিয়াছি। সে গিয়াছে, আমি আসিয়াছি। চাহিয়া দেখ, আঁখির পলক ফেলিতে না ফেলিতে ঐ পশ্চিমের ছায়া-পথ দিয়া সে কেমন করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আর তাহার কোন চিহ্নই নাই। যে যায়, সে এমনি করিয়াই যায়। পিছনে কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় না। কেবল এক মাত্র স্মৃতি পড়িয়া হা হা করিতে থাকে। গান মিলাইয়া যায়, কেবল সুর পড়িয়া কাঁদিতে থাকে। ফুল ঝরিয়া পচিয়া গলিয়া যায়, কেবল গন্ধটুকু বায়ুর উপর ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু ঐ তো দোষ! যে যায়, সে যায়; কিন্তু যে থাকে, সে তার স্মৃতি লইয়া বড় গোলে পড়ে। সে গিয়াছে, কিন্তু তার স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। তাই ঐ ছায়ান্ধকারতলে ম্লানমুখী দিক্‌বধূ বিষাদ-ছায়ায় লুটাইয়া। '৯৩ গিয়াছে—কেমন করিয়া গেল জানি না—কিন্তু '৯৩ গিয়াছে। আমি আসিয়াছি। আমি নববর্ষ। '৯৪।

কিন্তু, সে যাইতে না যাইতে আমি কেন আসিলাম? পুরাতনের কথা না ফুরাইতে ফুরাইতে কেন নূতনের কথা পাড়িতে বসিলাম? কান্নার প্রথম উচ্ছ্বাস না মিলাইতে মিলাইতে, কেন হাসির বার্ত্তা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম? তা, তোমরা কেহ আমার দোষ লইও না। হাসি কান্না কি, সুখ দুঃখ কি তাহা ত বুঝি না। ও বুঝি কয়েকটা পৃথক্ পৃথক্ শব্দ মাত্র! বালকের বুলি! লোক হাসিতে হাসিতেও কাঁদিয়া ফেলে, কাঁদিতে কাঁদিতেও হাসিয়া ওঠে, সুখের উচ্চতম আসনে বসিয়াও দুঃখের ভয়ে ভীত হয়, আবার দুঃখের নিম্নতম কূপে ডুবিয়াও সুখের কল্পনা করিতে থাকে। কোন্‌টা হাসি, কোন্‌টা কান্না, কোন্‌টা সুখ, কোন্‌টা দুঃখ, তাহা বুঝিতে তো পারি না। রৌদ্র হইলে লোকে বৃষ্টির প্রার্থনা করে, আবার বৃষ্টির

হইলে রৌদ্রের জন্য লালায়িত হয়। তবে হাসি কান্না কাহাকে বলে? স্ত্রী স্বামীর প্রবাসবাসে সখীর নিকট দুঃখের কান্না কাঁদিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, স্বামী তাহার জন্য বিদেশ হইতে হাজার টাকার গহনা পাঠাইয়াছে; আর সে চোখের জল পড়িতে পড়িতে পড়িল না; নয়নকোণে হাসির বিদ্যুৎ চমকিল। মাতা বড় দুঃখে আনমনে বসিয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শিশু দৌড়িয়া আসিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, মা কান্না ভুলিয়া গেলেন, আনন্দে পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, হাসি কান্না কি তাহা ত বুঝি না। এ সংসারে কান্না লইয়া কে কবে থাকিয়াছে? কে কবে থাকিতে পারিয়াছে? তা, তোমরা কেহ আমার দোষ লইও না।

একবার প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখ দেখি। আকাশ নীরব, নিস্তব্ধ; জগৎ স্পন্দহীন, চেতনারহিত; পশ্চিমে এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল দেখিয়া দিগঙ্গনাগণ যে যাহার স্থানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া;—মরণের ছায়া স্তূপে স্তূপে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আতঙ্ক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চারিদিকে ফিরিতেছে,—কিন্তু ও কি! পূর্ব্বে ও কাহার হাসি?—মৃদু, মধুর, মোহমাখা, আবেশময়—ও কাহার হাসি? এ হেন সময়েও ঐ পূর্ব্বের দুয়ারখানি খুলিয়া ঘুমচোখে একাকিনী ঈষদুন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়াইয়া উষা ধীরে ধীরে হাসিরাশি ছড়াইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ আবার উষার হাতখানি ধরিয়া পশ্চাৎ হইতে হাসিতে হাসিতে তরুণ অরুণ ধীরে ধীরে দেখা দিল! কান্না পলাইল। শঙ্কা ও ত্রাস ছুটাছুটি করিয়া লুকাইল। যে পৃথিবী এতক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিল, সে এখন ত্রস্তে অঙ্গমোড়া দিয়া উঠিল। যে পাখী শাখায় বসিয়া চক্ষু মুদি নীরবে আপনার ভূতভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিল, সে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। যে সমীরণ স্তব্ধ হইয়া এতক্ষণ এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল, সে এখন নূতনের কথা দেশে দেশে প্রচার করিতে লাগিল দেখ, দেখ, সেই দিক্‌বধূরা কান্না ভুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া আমাকে পূজা করিতে আসিতেছে। ধরণী তাহার সকল শোভা সকল সম্পদ একে একে বাহির করি হাসিয়া হাসিয়া আমাকে দেখাইতেছে সে কান্না আর ত নাই। এ যে হাসি রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির পানে একবার চাহিয়া দেখ দেখি।

প্রকৃতি যে এই নিয়মেই বাঁধা! পুরাতনের বিসর্জ্জন, নূতনের প্রতিষ্ঠা, ইহা তাহার জীবনের মূল মন্ত্র। দিবসের পর রাত্রি, সূর্য্যের পর চন্দ্র, শীতের পর বসন্ত শূন্য লইয়া প্রকৃতি কখন থাকিতে পারে না জড়প্রকৃতি যাহা পারে না, তোমরা তাহা পারিবে কেমন করিয়া? পুরাতনের বিসর্জ্জন হইয়াছে, তবে নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে কেন ভুলিতেছ? এখনও কি অচেতনে নিদ্রা যাইবে? এখনও কি ঘুম ভাঙ্গিবে না? আমি যে তোমাদের কাছে নূতনের সমাচার দিতে আসিয়াছি, আশার কথা বলিতে আসিয়াছি, একবার উঠ। পুরাতন তুমি গিয়াছ, এখন নূতন-তুমি একবার উঠিয়া বসিয়া হাস দেখি!

কতকগুলা লোক আছে, তাহারা নববর্ষের নাম শুনিবামাত্র ডরাইয়া উঠে। প্রক

আনন্দের দিনে নিরানন্দের ... পাড়ে। বলে, নব বর্ষ আসিল বটে, কিন্তু পরমায়ুর এক বর্ষ কমিয়া গেল। বয়শ্চোর দেহ-ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার আর একটী বস্ত্র হরিয়া লইল। ইহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু, হয় ইহারা ধর্ম্মের কিছুই বোঝে না, নয় ইহারা মিথ্যা বলে। যে তুচ্ছ জীবনের হিসাবটা লইয়া এত ব্যতিব্যস্ত, সে আবার ধর্ম্মের কথা বলিবে কি? তোমরা বিবর্ত্তবাদ মান, তোমাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না, বর্ষে বর্ষে জগতের উন্নতি কি অবনতি। যে দেবতা আপন অংশ দিয়া এই জগৎ গড়িয়াছেন, তিনিই ইহার চরমোন্নতি সেই দেবত্বপ্রাপ্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাই জড়ত্ব হইতে পশুত্ব, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব, আর মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব। যতই বর্ষ যাইতেছে, মানুষের সেই চরমোন্নতি প্রাপ্তির সময় ততই নিকট হইতেছে। নব বর্ষ দেখিয়া মানুষ ভয় পাইবে কেন?

তবে এ কথা বলিতে পার, গত এক বৎসরে কি করিলে না করিলে একবার তাহার হিসাবটা খতাইয়া দেখ। আজ নব বর্ষ। আজ তাহাই দেখিবার দিন। আজ নূতন খাতা। ঐ দোকানী আজ তাহার ক্ষুদ্র দোকান খানি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়াছে, গঙ্গাজল ছড়া দিয়াছে, ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলে ঘর খানি পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, দ্বারে আম্র-পল্লব টাঙ্গাইয়াছে। আজ তাহার নূতন খাতার দিন। শুধু তাহার একা নহে, আজ সবারই নূতন খাতা। এই ভবের হাটে আসিয়া দোকানপাট সাজাইয়া এক বৎসর ধরিয়া যে ব্যবসা চালাইলে আজ তাহার খাতা বদলাইতে হইবে। ঐ হৃদয়ের স্থানে স্থানে রাশি রাশি ধূলা মলা জমিয়া রহিয়াছে, তাহা ঝাড়িয়া পরিষ্কার কর; অনেক অপবিত্রতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা জল ঢালিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেল। খরিদ বিক্রী, দেনা পাওনার রেওয়া মিলাইয়া লাভ লোকসান বুঝিয়া দেখ। জমা খরচে কৈফিয়ৎ কাটিয়া নূতন খাতায় জের লইয়া আইস। নূতন খাতায় জের আনিতে পার, ভালই, কিন্তু যদি শূন্য ভিন্ন আর কিছুই না দেখিতে পাও, হতাশ হইও না। কোন্ খাতে লোকসান দিয়াছ, তাহা ধর, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চল; নূতন দিনে নূতন করিয়া ব্যবসার পত্তন দাও, শোধরাইয়া উঠিবে। হয় ত, এই বৎসরেই বাজারে তোমার নামের সাড়া পড়িয়া যাইতে পারে। নব বর্ষ মানুষকে ভয় দেখাইতে আসে না, তাহাকে নূতন উৎসাহ, নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন জীবন দিবার জন্যই আসিয়া থাকে। এ সময়ে কি আলস্যে বসিয়া থাকা সাজে?

তবে, বাজা, কল্পনা, তোর ঐ ভাঙা বীণা লইয়া আর একবার বাজা। আজ নূতনের রাজ্য, আনন্দের মহামেলা, কেন তুই একা পুরাতনের মধ্যে পড়িয়া নিরানন্দে থাকিবি। জড় প্রকৃতি পর্য্যন্ত আজ নূতন জীবন পাইয়াছে, সবই যেখানকার যা, সেখানেই ছিল, কিন্তু এমন তো ছিল না! এত হাসি এত আনন্দ তাহাদের দেখি নাই ত! আজ সকলেই সকলের কাছে নূতনের সমাচার দিতেছে। প্রকৃতি অন্য প্রকৃতিকে বলিতেছে—'হতাশ হইওনা, ভরসা বাঁধ, নূতন আসিয়াছে।' জগৎ জগদন্তরকে বলিতেছে,—'হতাশ হইওনা, ভরসা বাঁধ, নূতন আসিয়াছে।' এক সৌরজগৎ অপর সৌর-

জগৎকে বলিতেছে—'হতাশ হইওনা, ভরসা বাঁধ, নূতন আসিয়াছে।' বায়ু সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া সেই বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। পাখীরা একতানে সেই গানই গাহিতেছে। নিরাশা পলাইয়া গিয়াছে। মরণ ভয়ে লুকাইয়াছে। আজ আশার দিন, আজ জীবনের দিন। চারিদিকে নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন উৎসাহ, নূতন জীবন। আয় কল্পনা, তোরও ঐ ভাবগুলি আজ নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিই।—আগে কি গাহিতে কি গাহিয়াছিস্, বীণা কত বেসুরা বলিয়াছে, কেহ শুনিতে চাহে নাই, যে একবার শুনিতে বসিয়াছিল সে হয়ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে—আজ সে সব ভুলিয়া যা। আজ তো পুরাতনের কথা কেহই বলে না, আজ যে নূতনের ঘোষণা।—আয় কল্পনা, তবে আয়, তোর ঐ ভাব গুলি নূতন করিয়া আজ বাঁধিয়া দিই। একবার তারে তারে ঝঙ্কার দিয়া, নূতন সুরে সুর মিলাইয়া, নূতন তানে নূতন প্রাণে গা দেখি!

ঊষা।

১

নয়নেতে মোহ আঁকা,
অধরেতে হাসি মাখা,
ঘুম-ভাঙা ঊষা-রাণী আসে পায় পায়!
সুনীল মেঘের কোলে
কিরীট-কিরণ দোলে,
সোণার আঁচল লোটে সুমেরু-মাথায়।

২

শুভ্র মেঘ-স্তরে স্তরে
আলো-রেখা খেলা করে;
নিরমল নীলাকাশ বিস্ময়ে চাহিয়া,
হাসিমাখা শুভ্র মুখ,
আধ ঢাকা শুভ্র বুক,
দিক্-নারী সারি সারি রেখে দাঁড়াইয়া।

৩

ম্লানমুখী শুক-তারা,
আলোকে লাজেতে সারা;
লুকায় মলিন ছায়া গিরিতলে, বনে;
নিদ্রা ত্রাসে ছুটে যায়;
স্বপ্ন আলুথালু প্রায়;
কল্পনা চমকি চায় পূর্ব্ব-দিক পানে!

৪

ফুটিছে হাসিয়া ফুল,
দুলিছে লতিকা-কুল;
মহীরুহ নত শির, ঝরিছে শিশির;
পূর্ব্ব-মুখে চেয়ে চেয়ে
পাখী ওঠে গেয়ে গেয়ে;
বহে ধীরি ধীরি অতি শিহরি সমীর।

৫

ভৃঙ্গ গুন্ গুন্ স্বরে
ফুলে ফুলে খেলা করে,
প্রজাপতি দুলে দুলে ভ্রমে মনোসুখে;
চকা চকী চোখোচোখি;
ঘুঘু-দুটি মুখোমুখি;
ময়ূর বেড়ায় নেচে ময়ূরী-সম্মুখে।

৬

ওঠে কাংস্য-ঘণ্টা-রোল,
বব্বম্ বব্বম্ বোল,
প্রাচীন অশ্বত্থ-তলে ভগন মন্দিরে;
ভাঙা সোপানের মূল,
শুষ্ক বিল্বপত্র ফুল,
বহে নদী কুল্ কুল্ মৃদুল অধীরে।

৭

আবক্ষ, নদীর পরে,
দাঁড়ায়ে, অঞ্জলি ক'রে,
তর্পণ করিছে দ্বিজ, মগ্ন সাম গানে;
চলে গ্রাম্যবধূ-গুলি
কুম্ভ কক্ষে হেলি দুলি,
বেড়া ঘেঁসে, মৃদু হেসে চেয়ে ভূমি পানে।

৮

রাখাল গো-পাল পাছে
শিস্ দিয়া চলিয়াছে;
হল-স্কন্ধ চলে চাষী উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে,
ব্যাধ গিরি-পথে ওঠে,
বাঁশীতে ললিত ফোটে,
উদ্ধ কর্ণে মৃগযূথ আসে নেচে ধেয়ে।

৯

নির্ঝরিণী এঁকে বেঁকে,
শত ইন্দ্র-ধনু এঁকে,
ঝাঁপায়ে পড়িছে দূরে গিরি-শির হ'তে;
ঝক্ ঝক্ গিরি পরে,
তুষারে, মেঘের স্তরে
ঢাকিয়া রেখেছে যেন কি এক-জগতে!

১০

ফুটো না ফুটো না, রবি!
থাক ঘোর ঘোর ছবি,
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন, মধুর—মদির!
নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি মোহ, নাহি পাপ,
কেটো না এ আব্ছা-জাল, প্রত্যক্ষ অধীর!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বামনপুরাণ।*

এই পুরাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে;—

১। ভগবান্ বিষ্ণুর বামন রূপ ধারণ।

২। প্রহ্লাদের সহিত নরনারায়ণের যুদ্ধ।

৩। সতীর দেহত্যাগ।

৪। তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতবিধি, দানবিধি।

ইহা ভিন্ন এই পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ, মহিষাসুর বধ, কার্ত্তিক, গণেশের জন্মবৃত্তান্ত, শিববিবাহ প্রভৃতি অন্য অন্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত আছে। রঘুনন্দন, নিজ সংগ্রহের মধ্যে অনেক স্থলে বামনপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বামনপুরাণোক্ত বিধি সমুদয় হিন্দুর পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য।

অন্য অন্য পুরাণের ন্যায়, বামনপুরাণকেও আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, (১) কাল্পনিক, (২) ঐতিহাসিক, (৩) নৈতিক। ঐতিহাসিক ও নৈতিক অংশ সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে মত-ভেদ নাই। কিন্তু কাল্পনিক অংশ সম্বন্ধে পুরাণকারগণ নিজ নিজ কবিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক্ ব্যবহার করিয়াছেন। শিবের অবমাননায় সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক অংশ সকল পুরাণেই ও সকল কাব্যেই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সতী কি ভাবে কোথায় প্রাণত্যাগ

---

* শ্রীঠাকুরদাস চূড়ামণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। ৪১ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে পৌরাণিকেরা সকলেই এক প্রকার পথ অবলম্বন করেন নাই। ভাগবতে সতীর প্রাণত্যাগ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,

"ততো বিনিশ্বস্য সতী বিহায় তং,
শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা।
পিত্রোরগাৎ স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীর্গৃহাণ্,
প্রেম্নাত্মনো যোঽর্দ্ধমদাৎ সতাং প্রিয়ঃ॥"

৪র্থ স্কন্ধ, ৩য় শ্লোক।

অর্থাৎ "সতী শোক-রোষ-পীড়িত হৃদয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহাদেবকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন।" পরে, সতী দক্ষভবনে যোগমার্গে প্রাণত্যাগ করেন।

ততঃ স্বভর্ত্তুশ্চরণাম্বুজাসবং,
জগদ্গুরোশ্চিন্তয়তী নচাপরং।
দদর্শ দেহোহতকল্মষঃ সতী,
সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা॥"

৪র্থ স্কন্ধ, ২৭ শ্লোক।

অর্থাৎ "সতী অননামনে জগদ্গুরু মহাদেবের চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।"

বামনপুরাণে সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কৈলাসে জয়া সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"চতুর্দ্দশেষু লোকেষু
জন্তবো যে চরাচরাঃ।
নিমন্ত্রিত ক্রতৌ সর্ব্বে
কিং নাসি ত্বং নিমন্ত্রিতা।"

অর্থাৎ "দক্ষযজ্ঞে সকল প্রাণীর নিমন্ত্রণ হইল। তোমার নিমন্ত্রণ হইল না কেন?" এই কথা শুনিয়াই সতী—

"জয়ায়া স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতসমং সতী।
মন্যুনাভিপ্লুতা ব্রহ্মন্ পঞ্চত্বমগমত্তদা॥"

অর্থাৎ "জয়ার এই বজ্রসম নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণে সতী শোকাভিভূত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।"

পুরাণে পুরাণে এই যে বিসম্বাদিতা আপাততঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক এই বিসম্বাদিতা কোনস্থলেই গুরুতর বিসম্বাদিতা নহে। "সতী অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন" এই ঐতিহাসিক সত্য ভিন্ন ভিন্ন কবি ও পৌরাণিক ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্নং কাব্যালঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন। এমন কি ব্যাসদেবও নিজ রচিত দুই পুরাণে দুই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্র যেরূপে বর্ণিত আছে, ভাগবতে তাহা নাই। ইহা দেখিয়া এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ধ্রুবচরিত্র বা প্রহ্লাদচরিত্র আমূলতঃ কাল্পনিক। ইহার প্রকৃত মীমাংসা এই যে ভিন্ন ভিন্ন অথবা একই পৌরাণিক ও কবি সাধারণ কয়েকটী ঐতিহাসিক ভিত্তি অক্ষুন্ন রাখিয়া অনেকস্থলে নিজ নিজ কবিত্ব ও কল্পনার ব্যবহার করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে পুরাণের আদ্যোপান্ত ঐতিহাসিক তাঁহারা ভ্রান্ত। এবং যাঁহারা মনে করেন যে পুরাণের আদ্যোপান্ত কাল্পনিক তাঁহারাও ভ্রান্ত। পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা অংশতঃ ঐতিহাসিক, ও অংশতঃ কাল্পনিক অর্থাৎ কবিত্ব ও উদ্ভাবনী পরিপূর্ণ। মিল্‌টন বাইবলের কয়েকটী মূল ঘটনা ঠিক রাখিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে ঐ ঘটনার সহিত বিচিত্র কল্পনা ও বিচিত্র কবিত্বের সংযোজনা করিয়া Paradise Lost ও Paradise Regained প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের পুরাণাদিও ঐ ভাবে রচিত হইয়াছে। পুরাণ

আরব্য উপন্যাসের ন্যায় কাল্পনিক নহে, এবং ইহা Grote বা Gibbon-এর ন্যায় কেবল ঐতিহাসিকও নহে। ইহা কাব্য ও ইতিহাসের সম্মিলন-স্থল।

বামনপুরাণের কাব্যাংশ বা ঐতিহাসিক অংশ তত সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ৬৮৫ পৃষ্ঠায় যে বিরাট-মূর্ত্তির বিবরণ প্রদত্ত আছে তাহা গীতোক্ত বিশ্বরূপের সহিত তুলনায় তাদৃশ মনোহর নহে।

"কুক্ষিভ্যাং অর্ণবাঃ সপ্ত জঠরে ভুবনাস্তথা।
স্থিতা বলিষু নদ্যশ্চ জঙ্ঘাস্ত জঠরেস্তথা॥

* * *

চন্দ্রাদিত্যৌ লোচনে চ পক্ষস্থাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ।
তারকা রোমকূপেভ্যঃ রোমানি চ মহর্ষয়ঃ॥"

অর্থাৎ—"ঐ বিরাট্ পুরুষের কুক্ষিতে সপ্ত সমুদ্র, জঠরে চতুর্দ্দশ ভুবন, বলিতে নদী, জঠরে জঙ্ঘা, লোচনে চন্দ্র সূর্য্য, পক্ষে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রমালা, রোমকূপে তারা, ও রোমে মহর্ষিচয় বিরাজিত আছেন।"

এই বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতোক্ত বিশ্বরূপের বর্ণনার তুলনা করুন, দেখিবেন উভয়ে কত প্রভেদ।

"এবমুক্ত্বা ততোরাজন্
মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায়
পরমং রূপমৈশ্বরং॥
অনেকবক্ত্রনয়নং
অনেকাদ্ভুতদর্শনং।
অনেক দিব্যাভরণং
দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং
দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং
অনন্তং বিশ্বতোমুখং॥"

এই বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মনশ্চক্ষু প্রসারিত হয়, এবং বহিশ্চক্ষু যেন নিমীলিত হইয়া আইসে। প্রীতি, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের যুগপৎ আবির্ভাবে হৃদয়মধ্যে এক অপূর্ব্ব পবিত্রতা ও অপূর্ব্ব শান্তি উদ্রিক্ত হয়। পাঠকের কর্ণে যেন এক স্বর্গীয় বীণাতন্ত্রী নিনাদিত হইতে থাকে, এবং হৃদয়মধ্যে শান্তি, মাধুর্য্য, পবিত্রতা প্রভৃতির এক সুকোমল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়। কিন্তু বামনপুরাণ যেন এ ভাবে লিখিতই হয় নাই। ইহাতে বিস্ময় আনন্দ প্রভৃতি সমস্ত রসের উপাদান একত্রীকৃত পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে যেন স্বর্গীয় অনুপম শিল্পনৈপুণ্যের অভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? যে ব্যাসদেব গীতার রচয়িতা, সেই ব্যাসদেবই ত বামনপুরাণেরও প্রণেতা। তবে, কবি কোথাওবা মনঃপ্রসূতা কোন কন্যাকে মণি মুক্তা প্রবাল হীরকাদি নানা আভরণে ভূষিত করিয়াছেন কেন, এবং কোন কন্যাকেই বা নিরলঙ্কৃতা রাখিয়াছেন কেন? ইহার উত্তর আমার বোধ হয় এইরূপ;—

আমাদের পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারীর উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। যাহার হৃদয় কল্পনাময়, যে সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যপ্রসূ কবিতার পক্ষপাতী তাহার জন্য এক প্রকার পুরাণ এবং যে দুর্ভাগ্যবশতঃ নীরস ও শুষ্ক হৃদয়ের অধিপতি, তাহার জন্য অন্য এক প্রকার পুরাণ। হিন্দুশাস্ত্ররূপ সদাব্রতে কোন অতিথিরই প্রত্যাখ্যান নাই। যে যাহা চাও, যে যাহা ভালবাস, তাহার জন্য স্তূপাকারে সেই প্রকার দ্রব্যই সুসজ্জিত

রহিয়াছে। আমার বোধ হয়, বামনপুরাণ নীরস শুষ্কহৃদয় কঠোর জ্ঞানান্বেষীর জন্য লিখিত হইয়াছে। যে দক্ষিণে বাতাস বুঝে, কিন্তু মলয়ানিল বুঝে না, যে নদী বুঝে, কিন্তু তরঙ্গিণী বুঝে না, যে নক্ষত্র বুঝে, কিন্তু তারকারাজি বুঝে না, যে কৃষ্ণ বুঝে, কিন্তু বনমালাবিভূষিত ত্রিভঙ্গিম মুরলীধর বুঝে না,—সেই ঘটনা-সর্ব্বস্ব, কল্পনাবিহীন, কবিত্ব-বিহীন মনুষ্যের জন্য বামনপুরাণ রচিত হইয়াছে। সুতরাং কবি এই পুরাণে কবিত্ব বা কল্পনা গোপন করিয়াছেন।

বামনপুরাণের নৈতিক অংশ অতি সুন্দর। আমরা দুই একটী স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্ম্মোস্য মূলং ধনমেব শাখা।
পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ॥
অসৌ সদাচারতরুঃ সুকেশে।
সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা॥"

অর্থাৎ "হে সুকেশে! এই যে সদাচাররূপ-বৃক্ষ, ধর্ম্ম ইহার মূল, ধন ইহার শাখা, কাম ইহার পুষ্প এবং মোক্ষ ইহার ফল। যে ব্যক্তি এই বৃক্ষের সেবা করেন, তিনিই পুণ্যবান্।" ইহার ভাবার্থ এই যে, মূলে ধর্ম্ম থাকিলে কাম, অর্থ, মোক্ষ আপনা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"স্বাধ্যায় ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজনমেব চ।
অকার্পণ্যং অনায়াসং দয়াহিংসা ক্ষমাদয়ঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচঞ্চ মাঙ্গল্যং ভক্তিরুচ্যতে।
শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোহয়ং মানবঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ "বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজন, অকার্পণ্য, শ্রমশীলতা, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, শৌচ, মঙ্গলকর কার্য্যে অভিরতি, শঙ্কর, ভাস্কর ও ভগবতীতে ভক্তি মানবের ধর্ম্ম।"

অনুবাদক অনায়াস অর্থে সাবল্য লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয় ইহা ভ্রম। অনুবাদক বা মুদ্রাযন্ত্র আর একটী বিশেষ ভ্রম করিয়াছেন। হিংসাকে মনুষ্যের ধর্ম্ম বলিয়া পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যেও সংস্কৃতে দুই চারিটা ভ্রম প্রমাদ দেখিয়াছি। এতৎ সম্বন্ধে প্রকাশকগণের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

'পরদারবমর্ষিত্বং পারক্যার্থে চ লোলুপঃ।
স্বাধ্যায়ঃ ত্র্যম্বকে ভক্তি ধর্ম্মোয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ॥'

অর্থাৎ "রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম পরদারে অভিলাষ, পরের অর্থে লোভ, বেদাধ্যয়ন ও শঙ্করে ভক্তি।" ইত্যাদি অনেক নৈতিক উন্নতির উপযোগী অনেক কথা বামনপুরাণ হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে।

নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বামনপুরাণের সহিত অন্য কোন হিন্দুশাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও বিরোধ নাই। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রের অনেক শাখা হইলেও মূল কথায় কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ দেখা যায় না। অবান্তর কথায় মতভেদ লক্ষিত হয় এই মাত্র। এক জন ইংরাজও বলিয়াছেন "In all essential matters unity; in non-essential matters liberty; in all charity." হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদা এই উদার নিয়মের প্রতিপালন করিয়াছেন।

এই পুরাণোক্ত ধ্যানগুলিও অতীব মনোহর। দুইটী ধ্যান উদ্ধৃত করিলাম।

"নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে গরুড়ধ্বজ।
শঙ্খ চক্র গদাপাণে বাসুদেব নমস্তুতে॥
নমস্তে নির্গুণাতীত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে।
জ্ঞানাজ্ঞান নিরালম্ব সর্ব্বালম্ব নমস্তুতে॥

যজ্ঞোযুক্ত-নমস্তেস্তু ব্রহ্মমূর্ত্তে সনাতন।
ত্বয়া সর্ব্বমিদং নাথ জগৎ সৃষ্টং চরাচরং॥
সত্ত্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষ্ণুমূর্ত্তে অধোক্ষজ।
প্রজাপাল মহাদেব জনার্দ্দন নমোস্তুতে॥
গুণাভিযুক্তোদেবেশ সর্ব্বব্যাপিন্ নমোস্তুতে।
ভূরিয়ং ত্বং জগন্নাথ জলাম্বরহুতাশনাঃ॥

অপর,

নমস্যামি হরেশ্চক্রং দৈত্যচক্রবিদারণং।
সহস্রাংশুং সহস্রাভং সহস্রারং সুনির্ম্মলং॥
নমস্যামি হরেশ্চক্রং যস্য নাভ্যাং পিতামহঃ।
তুণ্ডে ত্রিশূলধৃক্ শর্ব্ব মারামূলে মহদ্রিভূঃ॥
আরাসু সংস্থিতা দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সার্কাঃ সপাবকাঃ।
জবে যস্য স্থিতোবায়ুরাপোগ্নিঃ পবনোনভঃ॥
আবাপ্রান্তেষু জীমূতা সৌদামীন্যৃক্ষতারকাঃ।
বাহ্যতো মুনয়ো যস্য বালিখিল্যাদয়স্তথা॥
তমায়ুধবরং বন্দে বাসুদেবস্য ভক্তিতঃ।
যন্মে পাপং শরীরোত্থং বাগ্জং মানসমেব চ॥
তন্মে দহস্ব দীপ্তাংশো বিষ্ণুচক্র সুদর্শন।
যন্মেকুলোদ্ভবং পাপং পৈতৃকং মাতৃকং তথা॥
তন্মে হরস্ব তরসা নমস্তে অজিতায়ুধঃ।
আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধযো যান্তু সংক্ষয়ং॥

এরূপ মহামূল্য গ্রন্থের আদর নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এরূপ গ্রন্থ ক্রয় করা ও পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য।

শ্রীনীলকণ্ঠ মজুমদার।

বেদ বিচার।

অনেকের ধারণা আর বিশ্বাস যে, বেদ নিত্য অপৌরুষেয় শাস্ত্র। ইহার রচয়িতা নাই, উহা স্বয়ম্ভু। আত্মা যেমন নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল, বেদও তেমনি। সেই স্বয়ম্ভু বেদ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক চারি অংশে বিভক্ত হওয়ায় তাহার এক ভাগের নাম ঋক, এক ভাগের নাম যজুঃ এক ভাগের নাম সাম, এক ভাগের নাম অথর্ব্ব হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কতকটি উপনিষদও বেদ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাহাও বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে যজুর্ব্বেদ দুই প্রকার। এই বেদ সকল ব্রাহ্মণ আর মন্ত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যকর হওয়ায় বেদ সকলের একভাগ মন্ত্র এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগে ক্রিয়াকাণ্ড, মন্ত্র ভাগে জ্ঞানকাণ্ড আছে। এতাদৃশ বেদ চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। এই বেদ অভ্রান্ত আপ্ত বাক্যে পরিপূর্ণ। এই ত বেদের বিষয়। এক্ষণে বিচারে কি দাঁড়ায় দেখা যাউক। সচরাচর সকলে যাহাকে বেদ বলেন, সেটি বিচারে বেদ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না। উহা বেদ নামধারী শাস্ত্রবিশেষ। বিশুদ্ধ জ্ঞান পদার্থই বেদ। সেই জ্ঞান সর্ব্বত্র সমান, নিত্য পদার্থ। যাহাকে তন্ত্র শাস্ত্র কুণ্ডলিনী বলেন, পুরাণ শাস্ত্র যাহাকে বেদ-প্রসবিনী বাগ্দেবী বলেন, তাহাই প্রকৃত বেদ। সেই বেদ পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী। যাহাকে মূলপ্রকৃতি বা আদ্যা মহাবিদ্যা নিজ কণ্ঠ-দেশে মালা স্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন। এই বর্ণ-

মালাই সকল শাস্ত্রের জননী। বেদ বল, শ্রুতি বল, স্মৃতি বল, পুরাণ বল, আগম বল সকলি ঐ বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। এ নিমিত্ত ঐ বর্ণমালাকে মাতৃকা সরস্বতী বলে। মাতৃকা সরস্বতীও যাহা, মাহাবেদও তাহা। নচেৎ শাস্ত্র বিশেষ বেদ নাম-ধারী ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্বাদি শাস্ত্রকে প্রকৃত বেদ বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত পক্ষে তাহাই যদি হইত, তবে পদ্ম পুরাণে এমন কথা প্রকাশ থাকিত না যে—

'নিগমাদাগমো জাত অগমাদযামলোদ্ভবঃ।
যামলাৎ বেদ উৎপন্নঃ বেদাৎ শ্রুত্যাদযোপিচ।
শ্রুত্যাদেশ্চ পুরাণানি পুরাণাদিতিহাসকাঃ।''

অর্থাৎ নিগম হইতে আগম, আগম হইতে যামল; যামল হইতে বেদ, বেদ হইতে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি। সেই শ্রুত্যাদি হইতে পুরাণাদি জন্মিয়াছে। আবার এই পুরাণ হইতে ইতিহাস সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এইত শাস্ত্রীয় প্রমাণ। লোকে কিম্বদন্তী অপেক্ষা শাস্ত্রীয় প্রমাণকে আদর করেন। বেদ হইতে অর্থাৎ ঋক যজুঃ সামাদি হইতে তন্ত্র শাস্ত্র যে আধুনিক ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ এ সামান্য চক্ষে ত দৃষ্ট হয় নাই। অধিক বিজ্ঞতা, ধার্ম্মিকতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য ইদানীং অনেকে তন্ত্রে দোষারোপ করিয়া বেড়ান, এ কথা সত্য, কিন্তু নিজে ও পরিবারবর্গের সহিত যে তন্ত্রানুমত ক্রিয়া করিতে ক্রটি করেন না, ইহাও দেখা যাইতেছে।

কোন কোন ব্যক্তি বেদের আর শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের রচনার কাঠিন্য আর কোমলতা দেখিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে বেদ মূল আর প্রাচীন শাস্ত্র। এ নিমিত্ত সকল শাস্ত্র হইতে প্রাচীন আর কঠিন। বেদের ব্যাকরণ আর অভিধান এ সকল ব্যাকরণ আর অভিধান হইতে স্বতন্ত্র। বেদ-সমালোচক বলেন, যাহাকে সকলে ঋক বেদ বলেন উহা আদি যুগের ভাষানুযায়ী হওয়ায় অন্যান্য শাস্ত্র হইতে কঠিন ও ভাবগম্ভীর আর সংক্ষেপোক্তিবিশিষ্ট। আদি যুগের মানব সকলের ভাষা ও আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল তাৎকালিক শাস্ত্রও তদনুরূপ হওয়ায় ঋক বেদই তদুপযুক্ত শাস্ত্র হইল। শ্রুতি স্মৃতির রচনা প্রণালী যজুর্ব্বেদানুযায়ী। যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদ হইতে কিছু সহজ হইল। শ্রুতি স্মৃতিকে যজুর্ব্বেদ বলিলে বেদের অনিষ্ট হইতে পারে না। এই যজুর্ব্বেদ কেবল ত্রেতা যুগেরই শাস্ত্র। একালে স্বর ব্যঞ্জন পৃথক পৃথক উচ্চারণের ক্ষমতা ত থাকিল না। সত্য যুগের লোকের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি ও পরমায়ু প্রভৃতি ত্রেতার লোকেরা পাইলেন না। এই জন্য আদি বেদ রূপান্তর হইয়া শ্রুতি স্মৃতি রূপী যজুর্ব্বেদ হইলেন। অতঃপর সামবেদ। এই সামবেদ যজুর্ব্বেদের রচনার ন্যায় কঠিন ও দুরুচ্চার্য্য শব্দে রচিত হয় নাই। সাম বেদের ভাবও কোমল হইবায় উহা দ্বাপর যুগের জন্য পুরাণ রূপে প্রকাশ পায়। এই সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ মিলিত করিয়া যে শাস্ত্র প্রস্তুত হইল তাহারি নাম আগম বা পঞ্চম বেদ হইল। এই আগম শাস্ত্র কলি ও প্রবল কলির শাস্ত্র। কলি আর প্রবল কলির লোক সকলের জন্যই এই শাস্ত্র সকল প্রকাশ পাইল। এ শাস্ত্রের রচনাপ্রণালী ও ভাব কোমলতায় ও গাম্ভীর্য্যে বিমিশ্রিত। এ নিমিত্ত আগম শাস্ত্রকে গুরুমুখী শাস্ত্র বলে। শিব এই শাস্ত্রকে শাম্ভবী বিদ্যা বলিয়াছেন। এ শাস্ত্রে

ভ্রম প্রমাদাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কলি যুগ ভিন্ন অন্য অন্য কোন যুগের জন্য যে সকল শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার ফল লাভ করা দীর্ঘকালসাধ্য। আগমোক্ত ক্রিয়ার ফল অচিরকালে ফলে।

রচনার ইতর বিশেষে যদি শাস্ত্রের নবীনতা ও প্রাচীনতা প্রকাশ পাইত, আর প্রাচীন নূতনের আদর ও অনাদর হইত তবে ঋকবেদ সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে অর্থাৎ যজুঃ ও সাম বেদাদি শাস্ত্র হইতে সর্ব্বোচ্চাসনও প্রাপ্ত হইতে পারিত। হিন্দু সমাজে সকল বেদই সমান। ইতর বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। বরং সামবেদ হিন্দু সংসদি অধিক মান্য। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"বেদানাং সাম বেদোস্মি।"

অর্থাৎ বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। সামবেদের মধ্যে কতকগুলি গান আর যে স্তব আছে তাহা অতিশয় সুমিষ্ট ও মনোহর। ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব শাস্ত্রের নাম যে জন্য বেদ হইয়াছে, তাহার নিদান ও তাৎপর্য্য অনেকে জানেন না বোধ হয়। ঋক যজুঃ সামের প্রকৃত নাম ত্রয়ী। অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই যুগত্রয়ে যে শাস্ত্র মতে লোক সকল ক্রিয়া করিতেন তাহারই নাম ত্রয়ী। বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার এই মাত্র কারণ যে, যাহাতে মাতৃকা সরস্বতী মন্ত্র ও যন্ত্ররূপে নিয়ত অবস্থিতি করেন তিনি জ্ঞানপ্রদ হেতু বেদ পদবাচ্য। ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্বে যত মন্ত্র ও যন্ত্র আছে এত আর কোন শাস্ত্রে নাই। এই ত বেদের সংক্ষেপ সমালোচনা করা গেল।

ইহাতে এই মাত্র প্রকাশ পাইতেছে যে, গৌণ মুখ্য ভেদে বেদ সামান্যতঃ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা পৌরুষেয় পরিবর্ত্তনীয় তাহা গৌণ বেদ, আর যাহা অপরিবর্ত্তনীয় অপৌরষেয় অথচ স্বয়ম্ভূ তাহাই মুখ্য বেদ। এই মুখ্য বেদ নিরাকার সর্ব্বপ্রাণিস্থ। ইহা কেবল বর্ণময় অক্ষর মাত্র। এই বেদ কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাতে প্রকাশ পায়। মানবদিগের শরীরের অষ্ট স্থান হইতে এই বেদ উৎপন্ন হন। অথবা প্রকাশ হন। এ সম্বন্ধে পাণিনি বলেন,

"অষ্টস্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠ শিরস্তথা।
জিহ্বামূল' দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ॥"

মনুষ্যের মধ্যে এমন মনুষ্যও আছে যে তাঁহাদিগের দ্বারা পঞ্চাশৎ বর্ণের মধ্যে কতক গুলি বর্ণ উচ্চারণ হইতে পারে না বলিয়া বর্ণমালার মধ্য হইতে সে সকল বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ণমালা সংকোচ করিয়া তদ্দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোন কোন দেশে শব্দ বা কথা রাশিকে বর্ণস্থানীয় করিয়া কর্ম্ম চালাইতেছেন। মনের ভাব যাহা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহারি নাম বেদ। অথবা যাহাতে পদ পদার্থ বোধ হয় তাহাই বেদ। এ বেদ সর্ব্বত্র সর্ব্বজনসমাজে সমাদৃত। এতাদৃশ বেদকে মুখ্য বেদ বলা যায়। যেমন ঋক যজু সাম অথর্ব্ব শাস্ত্র বেদ বলিয়া পরিচিত তেমনি আবার কোরাণাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রও ম্লেচ্ছ আর যবনদিগের নিকটে বেদ। প্রাচীন বাইবেল ও পুরাতন কোরাণ যেমন রূপান্তরিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সেইরূপ ঋক যজুঃ সামের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পাপ-প্রধান কলি যুগে প্রকৃত যজু ও সাম সর্ব্বায়বসম্পন্ন কুত্রাপি মেলে না। যাহা মেলে

তাহা আসল সকলে মিশ্রিত বিরূপ মাত্র। কি হিন্দু কি যবন কি ম্লেচ্ছ সকল জাতির অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

আগম ভিন্ন আর আর হিন্দুশাস্ত্র সকলের মধ্যে কতকগুলি শাস্ত্র দৈব, কতক গুলি আর্ষ, কতকগুলিকে ক্ষত্রিয়জ শাস্ত্র বলে। গৌণ-বেদ, দৈব আর্ষ উভয় ভাষায় প্রস্তুত হয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে সকল বেদ প্রকাশ পায় তাহা কেবল দৈবভাষায় প্রস্তুত। সে ভাষা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় মানব ভাষার মূল। এই ভাষাকে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা বলা যায়। আর্ষ ভাষাও কোমল সংস্কৃত ভাষা। এ ভাষার ব্যাকরণ অভিধান পাওয়া যায়।

ক্ষত্রিয় ভাষায় বেদ ভিন্ন কতকগুলি স্মৃতি সংহিতা প্রকাশ পায়। সেই স্মৃতির নাম মনু স্মৃতি বা মনু সংহিতা। ইহার ভাষা দৈব ও আর্ষ ভাষা হইতে কোমল। মনু আবার এক খানি নহে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মনু ছিলেন সকলেরি এক এক খানি করিয়া ধর্ম্মসংহিতা থাকায় অগণ্য মনুসংহিতা প্রকাশ হইয়াছিল। কোন গতিকে সে সকল মনুস্মৃতির নাম গন্ধও নাই। এখন যে মনুস্মৃতি পৃথিবীতে দেখা যায়, উহা শ্বেত বরাহ কল্পের বৈবস্বত মনুর কৃত। কিন্তু লোকে কি নিমিত্ত উহাকে সায়ম্ভুব মনুর কৃত বিবেচনা করেন তাহা স্থির করা দুরূহ ব্যাপার।

সে যাহা হউক, আর এক কথা এই, শিব-প্রণীত তন্ত্রশাস্ত্র সকল দৈবভাষায় প্রকাশ না হইয়া কেবল মানবীয় ভাষায় প্রকাশ হইল কেন? এই সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অগ্রে তন্ত্রের সমালোচনা করা আবশ্যক।

যত প্রকার তন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে তৎসমুদায় একই প্রকার ভাষায় প্রস্তুত হয় নাই। নানা লোকের হিতার্থ দয়ালু শিব দেবলোকের জন্য যে তন্ত্র প্রচার করেন তাহা কেবল দেবভাষায়; আর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদির হিতার্থ যাহা, তাহা তাহাদিগের ভাষায়, এইরূপ মানবজাতির জন্য যে তন্ত্র তাহা মানবীয় ভাষায় সংরচিত হইয়াছে। অতি সহজ কথায় সরল ভাষায় এই শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, সে সব অনেক কথা। তাহার সমালোচনার স্থান এখানে নাই। তন্ত্রশাস্ত্র বেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি চারি বেদ মান, তবে আর এক বেদ না মানিবে কেন?

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

লক্ষ্মী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তা, কথাটা এই। মন্মথনাথ কলিকাতা হইতে বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিতেছে, বড় নাকি ডাগর বৌ—তার গায় আবার জামা আঁটা। কথাটা যেই শুনিল, সেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ বিবাহের বিন্দুবিসর্গও পূর্ব্বে কেহই শুনে নাই। মন্মথের গ্রামে প্রবেশের পূর্ব্বেই কথাটা গ্রামে আগে আসিয়াছিল। সুতরাং তাহা লইয়া গাঁয়ে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ছেলে বুড়ো, মাগী ছাগী সবাই

বৌ দেখিতে ছুটিল। গৃহিণী হাঁড়ি নামাইয়া, মেয়ে কুটনা ফেলিয়া, বৌ পানসাজা রাখিয়া, ছেলেরা স্কুল বন্ধ করিয়া বৌ দেখিতে দৌড়িল। যে চুল খুলিয়াছিল সে অমনি চুল গুলা পুনরায় জড়াইতে জড়াইতে, যে তেল মাখিয়াছিল সে মাথায় কতকটা জল থাবড়াইয়া, যে স্নান করিতেছিল সে ভিজা কাপড়েই—যে যে অবস্থায় শুনিল সে সেই অবস্থায়ই ছুটিল। যাহাদের কথা ফুটে নাই, তাহারাও মার কোলে উঠিয়া বৌ দেখিতে চলিল। মন্মথদের বাড়ীতে আজ লোক ধরে না।

মন্মথদের দুই খানি ছোট খ'ড়ো ঘর, আর একখানি রান্না-চালা—চারি দিকে মাটীর পাঁচিল। তাদের অবস্থা তেমন নয়। এক মা ভিন্ন তার সংসারে আর কেহই নাই। তাহার শৈশব অবস্থায় তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। বাপকে বড় তার মনে পড়ে না। বৃদ্ধা পৈতা তুলিয়া, পাট কাটিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিয়াছে। ক্রমে মন্মথ মানুষ হইয়া দুটাকা আনিতে শিখিল, বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না। আজ তাহার সেই মন্মথ বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, মার মনে কত আনন্দ তা কে বলিবে? মন্মথ আসিতেছে শুনিয়া দৌড়াইয়া গিয়া বৃদ্ধা পাড়ার পাঁচজন এয়েস্ত্রীকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া শুভকর্ম্মের সব আয়োজন করিয়া দিল; তখন আল্‌পনার ঘটা পড়িয়া গেল। শাঁখের শব্দে ও উলুধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র বাড়ী খানি কাঁপিতে লাগিল। বরক'নে বাড়ী আসিলে একজন গিয়া তাহাদের বরণ করিতে লাগিল।

যাহারা বউ দেখিতে আসিয়াছিল, মাতা তাহাদিগকে কাহাকেও "এস মা এস," কাহাকে "এস দিদি এস" কাহাকে "এস বাবা এস" বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় আপশোষ হইল, যে তিনি কাহারও হাতে কিছুই দিতে পারিলেন না। কলিকাতায় বিবাহের কথা হইতেছিল, ইহাই তিনি পুত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ যে মন্মথ বৌ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে ইহা জানিতেন না। কোন উদ্যোগ নাই। গ্রামেও হঠাৎ কিছু কিনিতে মেলে না। মাতা বড়ই লজ্জায় পড়িলেন। সে লজ্জা ও কষ্ট জানাইয়া সকলের কাছে ত্রুটি স্বীকার করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাকে বলিল "তা, লজ্জা কি, এ তো অন্য পর কেহ নয়। ভাল, বৌভাতে খুব ঘটা করিও।"

মা বলিলেন "আহা, মা, তোমরা ভিন্নই বা আমার মন্মথের আর আছে কে? আশীর্ব্বাদ কর, ভগবান্ যেমন দুটিকে মিলিয়েছেন, যেন সুখে রাখেন।"

তখন, বরণ হইয়া গেলে, চারিদিক্ হইতে "বৌর মুখ দেখি—বৌর মুখ দেখি" বলিয়া রব উঠিল। যিনি বরণ করিতেছিলেন তিনি বধূর ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইলেন। চাঁদ পানা মুখ। যেমন নাক, তেমনি চোক। তেমনি কপাল। কপালের উপর তেমনি কাল কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। কি গড়ন! নিখুঁত, নিটোল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। একাধারে এত রূপ কেহ আর কখন দেখে নাই। দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সকলে অবাক্ হইয়া গেল। মার বুকখানা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

অনেকে বৌর নাম শুনিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। মাতা কানে

কানে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি, মা ?"

বালিকা মুখখানি নত করিয়া বাম হাতের দুটি আঙুল দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"লক্ষ্মী।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর রামহরি মুখুয্যের আট-চালায় তাস পাশা পড়িয়াছে। গ্রামের যাঁহারা চাঁই তাঁহারা একে একে সকলে আসিয়া জমিয়াছেন। এক দিকে, "ইস্তক পঞ্চাশ—হাতের পাঁচ" আর এক দিকে "ক'চবার—পঞ্জুড়ি" প্রভৃতি শব্দে ক্ষুদ্র আট চালা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রামা চাকরের তামাক সাজিতে সাজিতে প্রাণ অস্ত হইবার যো হইয়াছে। তবে এ আজ নূতন ব্যাপার নয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, প্রত্যহই এইরূপ হইয়া থাকে—সেও অভ্যস্ত হইয়াছে। অনেকে যে কেবল বাড়ীর তামাক খরচটা বাঁচাইবার জন্য এখানে আসেন ইহা তাহার বেশ ধারণা ছিল; কিন্তু সেও প্রভুভক্ত, মনিবের যাহাতে বেশী খরচ না হয় সে দিকে খুব নজর। দশবার ডাক ভাঁড়াইয়া একবারে "এজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিত।

খেলা বড়ই জমিয়া আসিয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী নিষ্কর্ম্মার দল হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া একদৃষ্টে খেলার দিকে দেখিতেছে; এমন সময়ে গ্রামের ন্যায়সিদ্ধান্ত মহাশয় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র রামহরি বাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নীলমণি ঘোষ হাত তুলিয়া বলিল—"প্রাতঃ প্রণাম।" তখন রামা তামাক দিতে আসিয়াছিল, শুনিয়া বলিল "তা সাঁজের ব্যালাও পেরাতঃ পেন্নাম বলতি হবে কেন গা, সিদ্ধন্ন মশাই।" রামহরি তাহাকে বকিয়া উঠিলেন। রামা বাহিরে গেল। ন্যায় সিদ্ধান্ত মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।

তখন খেলা ফেলিয়া সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। রামহরি বাবু বলিলেন "কি, মনে করে ?"

সিদ্ধান্ত মহাশয় টিপের উপর টিপ নস্য লইয়া বলিলেন "শুনেছ, কাল মন্মথের বৌভাত।"

রা। আজ্ঞে, তা শুনেছি।

সি। তার পর, কি স্থির কর্‌লে ?

রা। তার আর স্থির অস্থির কি ?

সিদ্ধান্ত মহাশয় একটু উগ্রস্বরে বলিলেন—"বলি, খেতে যাওয়া হবে ?"

রামহরি ও অন্যান্য সকলে তাঁহার রকম সকম দেখিয়া কিছু চমৎকৃত হইল। বাস্তবিক, তাহারা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করে নাই। রামহরি থতমত খাইয়া বলিল—"তা, আপনি কি আজ্ঞা করেন ?"

সিদ্ধান্ত আরও রাগিয়া বলিলেন—"আজ্ঞা আবার কি ? সে কোথাকার কার মেয়ে বিয়ে করে আনিল তাহার ঠিক্ নাই। বিয়ে করেছে কি নিকে করেছে তাই বা—"

চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কিছু স্পষ্টবক্তা লোক, বলিল "ছিঃ ভদ্র লোকের নামে অমন কথা বল্‌বেন না।"

সি। ভদ্র লোক! কে ভদ্রলোক! অতবড় ধেড়ে মেয়ে আইবুড় কি ভদ্র লোকের ঘরে কখন থাকে।

চ। কেন, কোন্ কুলীনের ঘরে নেই! ২৫ বছরের মেয়েরও যে বে হয় না।

সি। চাল আর বাঁদে! কিসের

কথায় কি কথা আন হ্যাঁ। কুলীনসন্তান আর মন্মথ! ছিঃ তুমি অতি অর্ব্বাচীন।

শ্যামাচরণ কিছু রসিক লোক, বলিল—"মেয়েটা নাকি আবার জামা গায় দেয—কি বাহার!"

সিদ্ধান্ত উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "বল, চন্দ্রনাথ ভাষাকে বল। বেবিশ্যে—বেবিশ্যে—নিশ্চয ও—

চন্দ্রনাথ বড়ই রাগিয়াছিল, বলিযা উঠিল—'সিদ্ধান্ত মশাই, আর সিদ্ধান্তে কাজ নেই। উপাধির ছটা আর টিকির ঘটা থাক্‌লেই পণ্ডিত হয না—বেবিশ্যে নয—বেশ্যা বল্‌তে হয। তা, ধর্ম্ম জানেন, সে কি; কিন্তু খুঁজ্‌লে প্রকৃত বেশ্যা অমন অনেক ঘরে—"

সিদ্ধান্ত তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। চন্দ্রনাথের প্রতি সহস্র "বেল্লিক, পাষণ্ড, অনড়ুন্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিযা পড়িলেন। কোমরের কাপড় খানা খুলিযা যাইবার উপক্রম হইল। রামহরি বাবু দেখিযা শুনিয়া বলিলেন—"চন্দ্র, তুমি বড় ছেলে মানুষ—থাম না।"

চন্দ্রনাথ চুপ করিযা রহিলেন। সকলে মিলিযা সিদ্ধান্ত মহাশয়কে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইলেন। তখন ভাল হইয়া বসিযা আর দু টিপ নস্য লইযা বলিলেন "দেখ, এ ছেলেমানুষি নয়—এ সমাজের কথা। শাস্ত্রের কথা। আমার মতে ও বৌভাতে কারও যাওয়া উচিত নয়।"

শুনিয়া অনেকে শিহরিযা উঠিল। রাম-হরি বলিল "তবে কি মন্মথকে এক ঘ'রে করিতে বলেন!"

সি। আগুন খেলেই আঙার বমন করিতে হয।

রা। কিন্তু তার এমন কি দোষ।

সি। রামহরি বাবু, তুমিও ছেলে মানুষ হলে। দোষ নয—মহৎ দোষ। বৌভাতে গেলে ঐ মেয়ের অন্ন খেতে হবে। কিন্তু ও কার মেয়ে, কি জাতের মেয়ে তা জান? আর এটাও বুঝ্‌তে পার না, যদি ভালই হবে, তবে লুকিয়ে বে হবে কেন? বের আগে কেউ একটা কথাই বা জান্‌তে পার্ল্লে না কেন? এর ভিতর নিশ্চয়ই গলদ্ আছে—গলদ্ আছে—গলদ্ আছে।"

"অমন প্রকাণ্ড বলদ নৈলে কে গলদ্ বার কর্ত্তে পারে বল! দূর হোক।" ঈষৎ অনুচ্চ স্বরে এই কথা বলিয়া চন্দ্রনাথ সেখান হইতে উঠিযা গেলেন।

রামহরি বলিলেন, 'কিন্তু—'

সি। আবার কিন্তু কি! আপনার আপনার জাত বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে তো কেহই নিমন্ত্রণে যেও না। ইহাই আমার শেষ কথা।

সিদ্ধান্ত মহাশয় আর বসিলেন না। একেবারে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে দুয়ারের কাছে একটা কুকুর শুইয়া ছিল, সে তাঁহার মূর্ত্তি ও ভঙ্গি দেখিয়া 'ঘেউ ঘেউ' করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

সিদ্ধান্ত মহাশয চলিয়া গেলে মুহূর্ত্তের জন্য সকলে অবাক্ হইযা রহিল। তাস পাশা বন্ধ হইয়া গেল। তখন সেই কথারই আন্দোলন চলিল। কু ও সু সকল রকমই লোক আছে। কু ও সু সকল রকমই যুক্তি উঠিতে লাগিল। শেষ স্থির হইল, নিমন্ত্রণে না যাওয়াই শ্রেয়।

পরদিন মন্মথের মাতা যথাসঙ্গতি আয়োজন করিয়া সব প্রস্তুত করিল। আজ

তাহার মন্মথের বৌভাত। তাহার আনন্দের সীমা নাই। সেই বৃদ্ধ বয়সেও যেন তাহার যৌবনের বল ফিরিয়া আসিয়াছে। একাই সে কত লোকের রান্না বাঁধিল। সব প্রস্তুত। কেহই আসে না। ডাকিবার জন্য লোক গেল। কেহই আসিল না। লোকের মুখে মন্মথ সব শুনিল। ডাকিয়া মাতাকে তাহা শুনাইল। বৃদ্ধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কতক্ষণের জন্য তাহার মুখে কথা আসিল না। শেষ নিজে মন্মথকে সঙ্গে লইয়া সবাইকে ডাকিতে গেল। কেহই ঘরে নাই। কর্ত্তারা নাই, সুতরাং ছেলেরাই বা যায় কি প্রকারে? কাঁদিতে কাঁদিতে মাতাপুত্রে গৃহে ফিরিল। তখন, সেই রাশীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন বাঙালী ডাকিয়া বিলাইয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আকাশে অনেক রাত্রে চাঁদ উঠিল। চাঁদের আলোয় উঠানে বসিয়া মন্মথ ও তাহার মাতা। মা বলিলেন "আমার মাথা খা, সত্য করে বল্ বাবা, তুই কার মেয়ে ঘরে আন্‌লি।"

ম। আমি তো বলেছি, মা, আমি না জেনে শুনে এ কাজ করি নি।

মা। কিন্তু সবাই যখন চর্চ্চাতে চায়, তখন যে আর আমি মুখ পাইনে।

ম। তাও তো আমি তোমাকে বলেছি; তাই কেন ভেঙে সকলকে বল না।

মা। তা কি বলিনি? কিন্তু কেউ তো বিশ্বাস করে না। যে বরং আগে আমার দিকে টানিত সে এখন বলে— 'তোমারই ছেলের দোষ—বাপ মা না থাক্ মেয়ের তিনকুলে কি কেউ নেই, যে আপনার জন বলে পরিচয় দেয়।'

ম। বিশ্বাস করে না! একজনও না!

মা। তবে আর মাথা বল্‌ছি কি! সত্য ক'রে বল্ বাবা, তুই কোথায় ও মেয়ে পেলি।

ম। তবে, তোমারও বিশ্বাস হয় না, মা!

মা। আমি তো, বাবা, অবিশ্বাস করি নি! আ মরি মরি! অমন বৌ কি হয়! মা আমার লক্ষ্মী তো যথার্থই লক্ষ্মী! যেমন রূপ তেমনি গুণ! কি কথা, কি কাজ কর্ম্ম, বের ক'নে—এখনই কত যত্ন আত্তি! এমন বৌ নিয়েও আমি দুদিন সুখে ঘর কর্ত্তে পার্লেম না! বিধাতা কি এ কপালে কেবল ছাই গুলে লিখেছিলেন!

একেবারে সহস্র দুঃখের কথা তাঁহার মনে পড়িল। আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দুই চক্ষে জলধারা বহিল। চাঁদের আলোয় মন্মথ তাহা দেখিল। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল—'কেঁদো না মা, কেঁদো না। এ সব আমারই অদৃষ্টের ফের, নহিলে কেন এমন ঘটনা ঘটিবে? তুমি জানিবে না, অন্য কেউ জানিবে না, কেনই বা আমি বিয়ে ক'রে আসিব? বিয়ে ক'রে আসিলাম তো এ অভাবনীয় ব্যাপারই বা কেন ঘটিল? পরিচয় দিবার একজনই বা রহিল না কেন? হে ভগবন্! সকলই তোমার খেলা!'—

মন্মথের কান্না আসিয়াছিল। কণ্ঠ বাষ্পপীড়িত হইয়াছিল। মা বলিলেন—"চুপ কর বাবা। ছিঃ, বেটা ছেলে, তোমার কান্না কেন? ধর্ম্মপথে থাকিলে কখনই মন্দ হবে না।"

ম। মা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিসে হয় কেমন করিয়া বুঝিব? শুনিয়াছ তো, এ গল্প

কত দিন করিয়াছি বাসার কাছে একজন ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটী কন্যা। ব্রাহ্মণ অতি শান্ত, সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান্। পূজাহ্নিকেই দিনের প্রায় সকল সময় কাটিয়া যাইত। যে টুকু অবকাশ তাহা সদালাপে ও শাস্ত্রালোচনায় কাটিত। আমি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইতাম। তাঁহার উপদেশপূর্ণ কথাগুলি শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতাম। তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাটীর ভিতরেও আমার যাইতে নিষেধ ছিল না। কন্যাটী বাপের কাছে পাঠ অভ্যাস করিত। কখন বা আমি গিয়া পড়িলে আমরা দুজনেই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিতাম। একদিন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী দুজনেই তাঁহাদের কন্যাটীকে আমার সহিত বিবাহ দিবার কথা পাড়িলেন। তখন আমি কিছুই বলিতে পারি নাই, বলিয়াছিলাম 'মাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না।' তার পর তোমায় বলিলাম। শুনিয়া তুমিও রাজি হইলে। আমিও গিয়া তাহাই বলিলাম। তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে আমি তাঁহাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত বন্ধ করিলাম। একদিন আপিস হইতে আসিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে একজন লোক আমায় ডাকিতে আসিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমায় শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু উপস্থিত। তাড়াতাড়ি গেলাম। ব্রাহ্মণীর ওলাউঠা হইয়াছিল, একদিনেই শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছে। তখন শ্বাস টানিতেছে। তখন ধরাধরি করিয়া বাহির করিলাম। সে সময়েও ব্রাহ্মণী আমার দিকে একবার সজলনেত্রে চাহিলেন, আমি মুখের কাছে কান লইয়া গেলেম। বলিলেন, "হাত"। আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। শিওরের কাছে তাঁহার কন্যা বসিয়া কাঁদিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহার হাত খানি লইয়া আমার হাতের উপর রাখিলেন। একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। চোখের তারা স্থির হইল। ব্রাহ্মণী স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সে দৃশ্য এখনও যেন চোখের উপর দেখিতেছি। মনে করিলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ব্রাহ্মণীর সৎকার হইয়া গেল। আট দিন পরে একদিন ব্রাহ্মণ আমায় বলিলেন, 'মন্মথ, আজ দিন ভাল আজই গোধূলি লগ্নে তোমার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। তোমার কি মত? আমি বলিলাম, "মা জানিলেন না, কাহা-কেও বলা হইল না।" তিনি বলিলেন, "তোমার মা তো রাজি আছেনই।" তখন আমি বলিলাম "সবে আট দিন আপ-নার স্ত্রী গত হইয়াছেন, কালাশৌচ, এখন বিবাহ কেমন করিয়া হইবে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তবে শোন মন্মথ, এটী আমাদের আপনার কন্যা নহে পালিতা কন্যা। দুই বৎসরের সময় কাশীতে আমি ইহাকে পাই। রাঢ়ীয় শ্রেণী এক ব্রাহ্মণ এই কন্যাটী লইয়া সস্ত্রীক কাশী গমন করেন। আমি তখন সেইখানেই থাকি। তাঁহারা এক রাত্রি আমার নিকটে অবস্থিতি করেন। পরদিন প্রভাতে নৌকারোহণে দেশ যাত্রা করেন। সে দিন আকাশে বড় মেঘ উঠিয়াছিল। আমি অনেক মানা করি-লাম, না শুনিয়া নৌকায় উঠিলেন। তারপর ঝড় উঠিল। সে নৌকার কি হইল জানি না, কিন্তু স্নানের সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়াইয়া যখন সন্ধ্যা করিতেছিলাম, তখন

দেখিলাম একখানি কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে, কাঠের উপর একটী শিশুকন্যা। দেখিবামাত্র চিনিলাম—এ সেই ব্রাহ্মণ কন্যা। সাঁতারিয়া তাহা ধরিয়া তীরে উঠাইলাম। অনেক সুশ্রূষায় কন্যাটীর চেতনা হইল। বাড়ী লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণীকে দিলাম। কন্যাটীকে আপনার অধিক করিয়া পালন করিতে লাগিলাম। তার পর ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, কোন উদ্দেশই পাই নাই। ক্রমে কন্যাটী বড় হইল। কার্য্যগতিকে কলিকাতায় আসিতে হইযাছিল। এখন ব্রাহ্মণী চলিয়া গেল, আর সংসারে থাকিতে বাসনা নাই। কন্যাটীকে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীধামে ফিরিয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে এ জীবনের শেষ বোঝা নামাইব ইচ্ছা করিয়াছি।” শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। কিছুই বলিতে পারিলাম না। যথা লগ্নে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। দুই দিন পরে ব্রাহ্মণ কাশী চলিয়া গেলেন। আমি তোমার দাসী লইয়া তোমার নিকট আসিলাম। তোমার কাছে, মা, আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু ধর্ম্ম করিয়াছি কি অধর্ম্ম করিয়াছি তাহা বলিয়া দাও।”

মা নীরবে সব শুনিলেন। আজ আট দিন মন্মথ বাড়ী আসিয়াছে, আজ আট দিন মা অনেকবার এ কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু তবু যখন শুনেন, তখনি যেন নূতন বলিয়া মনে হয়। মন্মথও যখন বলে তখনি যেন তাহার নূতন বলিয়া বোধ হয়। বলিতে বলিতে মন্মথ আত্মহারা হইয়া পড়ে; শুনিতে শুনিতে মাও আত্মহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু লোকে তো তা বুঝে না। মার আবার চোখে জল দেখা দিল।

দেখিয়া মন্মথ বলিল ‘কাঁদিতেছ, মা?”

মা। সাধে কাঁদি, বাবা। কি করি তাই ভাবিতেছি। ইচ্ছা করে যে পোড়া দেশ থেকে এখনই সবাই মিলে উঠে আর কোথাও যাই।

ম। কোথায় যাব, মা? যদি কলঙ্কই না গেল, তবে দেশ ছাড়িয়া গিয়া কি করিব?

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

মন্মথ বলিল “সকলে কি বলে?”

মা। পোড়া লোকে পোড়া কথা কয়; তাহা আর বলিব কি? বলে, মন্মথ ও বৌ ত্যাগ করুক; তার পর একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলে সব চুকিয়া যাবে। মন্মথের বিবাহের ভাবনা কি।

মন্মথ আর কিছু বলিল না। বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। একবার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নৈশ সমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই বায়ুর সঙ্গে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মিশাইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র গৃহের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বিছানা। সেই বিছানায় শুইয়া—লক্ষ্মী। মাথার কাছে জানালাটী খোলা। চাঁদের আলো আসিয়া বিছানার উপর পড়িয়াছিল। চন্দ্রের রশ্মি বালিকার মুখে, চুলে ও সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া খেলা করিতেছিল। কখন বা রশ্মিগুলা একত্রে একস্থানে জড় হইয়া ভাবিতেছিল, তাহাদের স্পর্শমাত্রেই তো পদ্ম মুদিয়া যায়, কিন্তু আজ এ পদ্মটা তাহারা যতই নাড়িতেছে চাড়িতেছে,

ততই মুদিত না হইয়া ক্রমশঃ আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে কেন?

বালিকা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে; চুলগুলি গোছায় গোছায় থাকিয়া থাকিয়া মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, মৃদুবায়ুস্পর্শে ধীরে ধীরে ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে, ঈষদুদ্ভিন্ন অধরৌষ্ঠ যুগল মধ্যে মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় দন্ত-রেখা দেখা যাইতেছে; অলসে একখানি হাত নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—মরি মরি কি রূপ! চন্দ্রকরে রঙ্ যেন আরও ফাটিয়া পড়িতেছে। সে ক্ষুদ্র গৃহ আলো হইয়া রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অতৃপ্ত-লোচনে মন্মথ সে রূপরাশি দেখিতে লাগিল। পা নড়ে না, চক্ষু ফেরে না। সব ইন্দ্রিয় অবশ। দেখিতে দেখিতে দেখিতে মন্মথের চক্ষে ফোটা ফোটা করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। চক্ষু মুছিয়া আবার মন্মথ দেখিতে লাগিল। আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

এই বালিকা—সরল, নির্দ্দোষ, পবিত্র—কিছুই জানে না, সংসারের কোন রৌদ্র এখনও পোহায় নাই—আপনার যে হৃদয়ের দুঃখ তাহা আপনিই নীরবে হৃদয়ে বহন করে, কাহাকেও বলে না, কাহাকেও জানায় না—আপনার আশা ভরসা, সুখ শান্তি, সকলই একজন অপরিচিতের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত—মুখে চিন্তার ছায়া মাত্র নাই, অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে;—এই দেববালার স্বামী হইবার যোগ্য কি অধম সংসারের কীট মন্মথ! বিধাতা, কেন এমন মিলন করাইলে? যে চির-দরিদ্র তাহাকে কেন এ দেবদুর্লভ রত্নের লোভ দেখাইলে? ছি ছি! মন্মথ মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিল, শত-বার আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—"হে সমাজ, এ বালিকা তোমার কে? তোমার জন্য কত লোক আছে, এ ক্ষুদ্র বালিকাকে তোমার দলাদলির কুটিল চক্রে পিষিয়া কি ফল? নিরপরাধে ইহাকে বধিয়া তোমার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে?" চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বালিকা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিতেছিল যেন, তাহার মা আসিয়া তাহকে বলিতেছেন 'আয় বাছা, এখানে আর থাকিসনে, আমার সঙ্গে চলিয়া আয়।' স্বপ্নে বালিকা 'মা মা' করিয়া কঁদিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, শিওরের কাছে দাঁড়াইয়া মন্মথ। মন্মথ নীরবে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বালিকা স্বামীর হাত ধরিল। বলিল—"ও কি! অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন?"

মন্মথ কথা কহে না।

"বল না—মাথা খাও, বল না।"

তবু মন্মথ কথা কহে না। কথা কহে না, কাঁদে।

তখন বালিকা স্বামীর হাত ধরিয়া বিছানায় আনিয়া বসাইল। বালিকাসুলভ আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞাসিল "বল না, তোমার পায়ে পড়ি, কি হইয়াছে, বল না।"

মন্মথ বলিতে গেল; কিন্তু পারিল না। শুইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা বিষম দায়ে পড়িল। কিছু

বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণেক পরে সে নিজে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কতক্ষণ পরে মন্মথ বলিল "ছি! কাঁদিতেছ কেন?"

"তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"আমি অভাগা তাই কাঁদিতেছি, কিন্তু তুমি কাঁদিবে কেন?

"তুমি কাঁদাইতেছ তাই কাঁদিতেছি, নহিলে তোমার কাছে থাকিয়া কেন কাঁদিব?"

মন্মথ বালিকার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বলিল—"তবে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিয়া উঠিলে কেন?"

"সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

কি স্বপ্ন মন্মথ তাহা শুনিবার জন্য জেদ করিল। বালিকা তাহা বলিল। শুনিয়া মন্মথ শিহরিয়া উঠিল। বালিকা বলিল "তা, ও কিছু নয়। স্বপ্ন কি কখন সত্যি হয়? বাবার মুখে শোন নি।"

মন্মথ আবার তাহার মুখের প্রতি চাহিল। বালিকার সরল প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। আবার আপনার উপর ধিক্কার জন্মিল। আবার মন্মথ কাঁদিল।

তখন বালিকা কথাটা শুনিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। মন্মথ কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। মার সঙ্গে তার যে কথা হইয়াছিল তাহা সমস্তই বলিল। স্থির হইয়া বালিকা সমস্তই শুনিল। শেষ কথাটী আরও স্থির হইয়া শুনিল। স্থির হইয়া বলিল "তার পর, তুমি কি ঠাওরাইলে?"

মন্মথ উত্তর করিল—"কি ঠাওরাইব? আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

বালিকা গম্ভীরে বলিল—"তোমার মাথামুণ্ডু তোমাতে নাই, তাহা হইলে এরূপ ঠাওরাইতে না। অন্য মত করিও না, যাতে সব দিক বজায় থাকে তাই কর। আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী, আমার জন্য কেন আপনি মজিবে ও মাকে মজাইবে?"

শুনিয়া মন্মথ অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, এ কি বালিকা! বলিল—"তুমি বে'র ক'নে, ছেলে মানুষ, ছেলে মুখে তোমার এ সব বুড়ো কথায় কাজ কি?"

বালিকা ঈষৎ হাসিল। বলিল—"বাবা কি বলিতেন মনে পড়ে।"

"কি?"

"কর্ত্তব্যের কাছে, ধর্ম্মের কাছে ছেলে বুড়ো নাই। পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুব বনে বসিয়া 'হরিনাম' সাধনা করিয়াছিল। বালক প্রহ্লাদ হাতে খড়ির দিন 'ক'য়ে কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছিল, শিশু বৃষকেতু খেলা ছাড়িয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে পিতার করাতের নীচে মাথা পাতিয়া দিয়াছিল, বেহুলা বিবাহরাত্রে মৃতস্বামীর গলিত শব বুকে বাঁধিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—সে সব কথা মনে পড়ে না? পুরাণের সে সব বিষয় ভুলিয়া গিয়াছ কি? আমি বালিকা হই আর শিশুই হই, তোমার ধর্ম্মপত্নী তোমাকে ধর্ম্মের কথা কেন না বলিব?"

মন্মথ নির্ব্বাক, হতবুদ্ধি। এই বয়সে এত জ্ঞান! হা ভগবন্! এমন রত্ন দিয়াও তাহা কাড়িয়া লইতেছ! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর মন্মথকে ছলিবার জন্যই কি ইহাকে ইহার মধ্যে এত রূপে গুণে সাজাইয়াছিলে? জগদীশ! তোমার খেলা তুমিই বুঝ। মন্মথ বালিকার যতই গুণের পরিচয় পাইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার

উপক্রম হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে হৃদয় বাঁধিয়া বলিল—"এস, লক্ষ্মি, রাত হইয়াছে, এস আমরা শুই।"

দুই জনে দুই জনের পাশে শুইয়া পড়িল।

* * *

প্রভাতে মন্মথ উঠিয়া দেখিল, লক্ষ্মী নাই। উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ খুঁজিল। দেখিতে পাইল না। ঘাটে, পথে, রান্নাঘরে কোথাও লক্ষ্মী নাই। মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতর ধড় ধড় করিতে লাগিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধা আকাশ হইতে পড়িল। 'সে কি—বৌমা কোথায়?' বৃদ্ধা আতিপাতি করিয়া খুঁজিল, লক্ষ্মী নাই। তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, তাহাদের দুই জনে কোন কথা হইয়াছিল কি না। যে কথা হইয়াছিল, তাহা সব মন্মথ মাকে বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধা কপালে কর হানিল। বলিল—"হা ভগবান্! আমার এমন বাড়া ভাতেও ছাই দিলে। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী আমার ঘরে আসিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আমি অভাগী কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!" ক্রমে কথাটা গ্রামময় হইয়া গেল। যে শুনিল, সেই বিস্মিত হইল। মুখে মুখে কথাটা অনেকটা উপ-ন্যাসের আকার ধারণ করিল। ক্রমে সবারই দৃঢ় প্রত্যয় হইল, যথার্থ ই লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বৈকুণ্ঠপুরী হইতে ছলিতে আসিয়াছিলেন। অনেকে হায় হায় করিতে লাগিল, কেন তাহারা ধনপুত্রে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বর মাগিয়া লইল না!

ভৌতিক প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি।

পুরুষের বিশেষত্ব তাহার স্বাধীনতায়—জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে। সে নিজে আপনাকে একজন ব্যক্তি বলিয়া জানে এবং আপনাকে অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহ হইতে বিভিন্ন জানিয়া স্বকীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। অপরন্তু, সে জানে যে, সে তাহার কর্ম্মের কর্ত্তা এবং সে তাহার সৎ অসৎ কর্ম্মের জন্য তাহার ভগবানের নিকট দায়ী। এই উভয় প্রকার স্বাধীনতা লইয়াই পুরুষের জীবন। পুরু-ষের এই যে ব্যক্তিত্বভাব, এই যে অহং-জ্ঞান এইটুকু বাদ দিলে, তাহার সহিত জড় প্রকৃতির সঙ্গে কোন বিভিন্নতা থাকে না। এই স্বাধীন ব্যক্তিত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ-তর জীবন। ইহাই তাহার ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান শতাব্দির বিজ্ঞানের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অনেকে ভীত হইতেছেন যে, মানু-ষের এ স্বাধীনতা বুঝি আর থাকে না। অনেকে মনে করিতেছেন যে মানুষের এই ভাবটি কেবল তাহার আত্মগরিমা-প্রসূত কল্পনা মাত্র। চারিদিকে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে পরিবেষ্টিত অচ্ছেদ্য নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বস্তুতঃ প্রকৃতির অনিবার্য্য শক্তি প্রসূত যে মানুষ, সে মানুষ যে আবার স্বাধীনতার কথা বলে ইহা যদি উন্মাদের [illegible] বুঝি উন্মত্ততা বলিয়া

একটা কিছু আর নাই। বস্তুতঃ বিজ্ঞান যেন চিরকাল মানুষের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করিতেছে, এবং দিন দিন যেন সে কৃতকার্য্যও হইতেছে। নিয়মের রাজত্ব যতই বিস্তৃত হইতেছে, ততই যেন স্বাধীনতার শেষ হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর জগৎ হইতে দূরে পলাইতেছেন। বিজ্ঞানের চক্ষে মানুষ প্রকৃতির অসংখ্য ভৌতিক শক্তির মধ্যে একটি মাত্র। এবং বস্তুতঃ মানুষের সমস্ত জীবন, তাহার আত্মা, এবং দেহ উভয়ই ভৌতিক শক্তির পরিবর্ত্তনের এবং বিবর্ত্তনের ফল। মানুষের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু, তাহার প্রতি অঙ্গের শক্তি সমস্তই সে বাহিরের পদার্থ সমূহে নিহিত শক্তি হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার জ্ঞানশক্তি ত ভৌতিক শক্তির ফল বলিতে হইবে, কেন না ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে মানুষের মানসিক ক্রিয়াগুলির সমস্তই তাহার মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-প্রণালীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। মস্তিষ্কের ভৌতিক শক্তির পরিবর্ত্তন এবং ব্যাবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ও ব্যাবৃতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে জ্ঞানময়ী শক্তি মনে করি, সে ত ভৌতিক নিয়ম এবং ভৌতিক শক্তির ফল মাত্র। এমন এক সময় ছিল, যখন ধর্ম্ম বিজ্ঞানের দখলের বাহিরে অনিয়মের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দৈবশক্তি এবং স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করিত। কিন্তু সে কাল আর নাই। ভৌতিক বিজ্ঞান এখন মানুষের জ্ঞেয় জগৎ জুড়িয়া বসিয়াছে। গগনচারী নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি হইতে ঐ অন্যমনস্ক বালকের অপ্রস্ফুটিত ভাব পর্য্যন্ত সমস্তই অচ্ছেদ্য ভৌতিক নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছে। ঘটনার পাশে ঘটনা, ভৌতিক শক্তির পর ভৌতিক শক্তি অচ্ছেদ্য নিয়মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে। কোথায় দেবতা? কোথায় স্বাধীনতা?

তবে কি বাস্তবিকই সজ্ঞান আত্মা অজ্ঞান জড়শক্তির বিকাশ মাত্র? বাস্তবিকই তবে জগতে ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন প্রকার স্বাধীন তত্ত্ব কি নাই? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় আছে। আপাততঃ আমাদের একটি কথা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। সে কথাটি এই। পূর্ব্বে যে ভাবে স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সে ভাবে কোন চেষ্টা এখন আর সফল হইবে না। বিজ্ঞানের দখলের বাহিরে অনিয়মের উদাহরণ দেখাইয়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞেয়, অদৃশ্য ও আশ্চর্য্য গুণের আধার বলিয়া তাহাতে দেবত্ব আরোপ করার চেষ্টাও বিফল। ভৌতিক নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা জানি না, মানি না, বুঝি না। প্রকৃতির শক্তি-বিশেষকে কবি কল্পনা প্রসূত অস্ফুট আলোকে জড়াইয়া তাহার উপাসনা করিয়াও আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। এখন আর আমরা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারি না, যিনি এখানে আছেন সেখানে নাই, অথবা সেখানে আছেন এখানে নাই। সুতরাং মানুষের বাল্য-জীবনের সেই কবিতাময় স্বপ্ন, সেই ভাবুকতা-প্রসূত দেবতা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিজ্ঞান জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই বিশ্লেষণ করিতেছে। যাহাকে বিশ্লেষণ করিতেছি যাহার অস্তিত্ব ও

উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে অন্যান্য শক্তি ও নিয়মের সাহায্যে বুঝিতে হয়, তাহাকে কেমন করিয়া পূজা করিব! দৃশ্যমান প্রকৃতির ঘটনা-শৃঙ্খলের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করা যেমন অসম্ভব, এই শৃঙ্খলের একটা আরম্ভ কল্পনা করিয়া সেই অদৃশ্য আরম্ভের উপাসনা করা তদ্রূপ অসম্ভব। ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা ভাবিয়া, জগতের একটা আরম্ভ কল্পনা করিয়া যে ঈশ্বর খাড়া করা হয়, তাঁহার নিকট আমরা মস্তক অবনত করিতে পারি না। কেন না সে ঈশ্বর এই দৃশ্যমান ঘটনা শৃঙ্খলের অদৃশ্য বিস্তৃতি বা তীত আর কিছুই নয়। দেখিতে পাই না বলিয়া, দৃশ্যমান অংশের উপর, তাঁহার কোনরূপ প্রাধান্য স্বীকার করিতে পারি না। পরিমিত ঘটনাবাজির অনন্ত শৃঙ্খলকে যে দিক্ দিয়া দেখি না কেন, অনন্তের ভাবই দেখি, অথবা তাহার আংশিক পরিমিত ভাবের প্রতিই দেখি, কোন খানে উপাসনা আসিতে পারে না। উপাস্য দেবতার অন্বেষণ করিতে হইলে এমন একটি তত্ত্বকে ধরিতে হইবে, যাহা হইতে এই বৈচিত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এবং যে তত্ত্ব এই চিত্রের মধ্যেও নিজের অখণ্ড স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। যে ঈশ্বর কেবল জগতের কালান্তর্গত সৃষ্টিকর্ত্তা মাত্র, যাঁহার সম্বন্ধে কেবল এই মাত্রই জানা যায়, যে তিনি কোন কালে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের উপাসনায় আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। ঘটনাশৃঙ্খলের অনন্ত বিবৃতির মধ্যে কবিত্বও নাই ধর্ম্মও নাই। এ দুইয়ের কাহাকেও পাইতে হইলে সেই পরমতত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে— যে তত্ত্ব (জগতের কালান্তর্গত কারণ নয়) জগতের ব্যাখ্যা, যে তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্রের ব্যাখ্যা ও আধার হইলেও তাহার নিজের অখণ্ড স্বভাব কখন বিকৃত হয় না; যে তত্ত্ব সকল ক্রিয়ার সকল নিয়মবন্ধনের আধার এবং মূল কারণ হইয়াও স্বয়ং স্বাধীন, দেশকালাতীত, ক্রিয়াবিবর্জ্জিত। প্রত্যুত যে তত্ত্ব সকল প্রকার সম্বন্ধ ও বৈচিত্রে পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মূল হইলেও, সম্বন্ধরহিত অখণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। গীতা এই তত্ত্বে এইরূপ বর্ণনা আছে—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

গীতা, ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৩-১৭।

যখন আমরা এই পরম তত্ত্বটি বুঝিতে পারিব, তখন দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মাণ্ডের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য ভৌতিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাত প্রসূত অনন্ত বৈচিত্র্যময় ঘটনা-শ্রেণীর মধ্যে তখন সেই মহাপুরুষের মুখচ্ছবি এবং এই ব্রহ্মাণ্ডকে সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষের জীবনলীলা ভাবিয়া আমরা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইব। জীবশক্তি জড়শক্তি সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধনিচয়ের মধ্যে তখন পরস্পরের বন্ধন না দেখিয়া, দেখিব যে সকলেরই মধ্যে সেই এক স্বাধীন পুরুষের বিকাশ হই-

তেছে। সকলেই সেই স্বতঃ ক্রিয়াশীল পুরুষের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই যে পরমতত্ত্ব যিনি সকল জীবের মধ্যে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তির মধ্যে, নিজের স্বাতন্ত্র স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া, অথচ সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া, জীবন মৃত্যুর মধ্যে সকলের আধার স্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন—এই গীতা-প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্বই কেবল প্রাকৃতিক জগতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারে, এবং জ্ঞানময় আত্মার স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে।

এই যে তত্ত্বটির কথা উল্লেখ করা হইল, এইটি কোন রূপে আমাদের জ্ঞানগম্য হইতে পারে কি না, ইহার কোনরূপ প্রমাণ আছে কি না এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করাই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচ্য। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্নটির মীমাংসা বিশেষ রূপে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কেন না, আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের প্রাকৃতিক ঘটনা-শ্রেণীর জ্ঞান বিশেষ রূপে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনার বিশ্লেষণ হইতেছে এবং প্রত্যেক ভৌতিক নিয়মের গ্রন্থন ক্রিয়া সকল আলোচিত হইতেছে। সুতরাং এখন আর এখানে যে কোন একটু ভৌতিক শক্তি মধ্যে দৈবশক্তি মিশ্রিত করিয়া দিবেন তাহার যো নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপী ভৌতিক শক্তির ক্রিয়াভূমিতে যে কোন বিশেষ স্থানে দৈবশক্তির আবির্ভাব কল্পনা করা হইবে, তাহারও আর যো নাই। এ ভাবে ঈশ্বর খুঁজিতে গেলে তাহার উত্তর বিজ্ঞান দিয়াছে—"I have swept space with telescope but found no God." অখণ্ড জগৎরাজ্যের মধ্যে কোথাও স্থান নাই। এরূপ অবস্থায় যদি কোথায় দৈবশক্তি দেখিতে হয়, যদি কোথায় কোন আত্মার ক্রিয়া দেখিতে হয় তাহা হইলে জগতের সর্ব্বত্রই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে হইবে। জগতের মধ্যে অনন্ত ঘটনা-শ্রেণী ব্যতীত যদি আর কিছু দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আগা গোড়া সমগ্র-ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, আমাদের বিজ্ঞানকে দর্শনের আলোকে আমূল সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। এবং তখন এক নূতন চক্ষে বিজ্ঞানের মীমাংসা গুলিকে পাঠ করিতে হইবে। বাহির হইতে কেবল Exceptions দেখাইয়া বিজ্ঞানকে জয় করিবার আশা আর নাই। বহু কালের শিক্ষায় বিজ্ঞান বুঝিয়াছে যে এ সকল Exceptions কেবল তাহার নিয়ম সকলের পরিশুদ্ধি, বিস্তৃতির উপায় মাত্র। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানকে আক্রমণ করিতে হইলে, তবে তাহার মূল তত্ত্ব লইয়া, তাহার ভৌতিক পদার্থ এবং ভৌতিক নিয়মের জ্ঞান লইয়া করিতে হইবে।

Kant জার্ম্মাণিতে যে দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যান, এবং তাহার পরে যে কয়েকটি প্রধান প্রধান দর্শনের আবির্ভাব সেখানে হইয়াছে, সকল গুলিরই উদ্দেশ্য কতকটা এই রকম। ভৌতিক নিয়ম এবং আত্মার স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা এই দুইয়ের সামঞ্জস্যের জন্যই সে দর্শনের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের ভৌতিক নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে এবং সর্ব্বব্যাপী ভৌতিক শক্তির ক্রীড়াভূমিতে, আত্মার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য Kant যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য।

সে উপায় কেবল Kant-এর ন্যায় মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হওয়াই সম্ভব। নিয়মের বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, Kant নিজে বৈজ্ঞানিক নিয়মের ভিত্তি আরও কঠিন করিয়া দিলেন। এবং ভৌতিক জগতের আধার কাল এবং দেশকে আমাদের জ্ঞানের রাজ্য জুড়িয়া বসাইলেন। তাঁহার দর্শন যদি কিছু করিয়া থাকে, তবে তাহা এই প্রমাণ করিয়াছে যে, অনিয়মিত কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এমন কিছু ভাবিতে পারি না যাহার একটী বিশেষ এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এবং স্বভাব (deffinite and particular quality and quantity) নাই। Kant আমাদের জ্ঞেয় বিষয়কে দুই প্রকার শক্তির ক্রিয়া বলেন। তিনি বলেন যে, বাহির হইতে যে শক্তি আমাদের উপর আঘাত করে, তাহার উপর আমাদের জ্ঞানের একটি প্রতিঘাত ক্রিয়া না হইলে, প্রকৃতভাবে তাহা 'বিষয়' (phenomena) নাম পাইতে পারে না। "বিষয়" তাহাই যাহা জ্ঞানগম্য। কিন্তু যাহা শক্তি সকলের মূল প্রকৃতি (things in themselves) আমাদের নিকট চিরকাল প্রচ্ছন্ন থাকিবে। কেন না, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হইলেই, তাহারা আমাদের জ্ঞানের প্রতিঘাত ক্রিয়ার দ্বারা বিকৃত হইয়া আসিবে। এই জগত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু প্রকৃতিশক্তি সকলের মধ্যে যে পরস্পরের সম্বন্ধ, যাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলা হয়, এইগুলিই কেবল নিত্য এবং স্থির। আমাদের জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়েরই মধ্যে এইরূপ দুটি দিক দেখা যায়। একটা শক্তি চিরপরিবর্ত্তনশীল, আর একটা নিত্য। এ পদার্থটির আজ এই পরিমাণ আছে, কাল আর এক পরিমাণের হইল, আজ একরূপ স্বভাব রহিয়াছে, কাল আর এক স্বভাব ধারণ করিল, আজ এখানে আছে, কাল সেখানে আছে। কিন্তু ইহাকে সকল সময়ে একটা স্বভাব, একটা পরিমাণ, একটা দেশ অধিকার করিয়া থাকিতেই হইবে। এই যে দেশ, কাল, পরিমাণ প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব, এইগুলির উপর বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, এবং এই গুলি জ্ঞানের মধ্যে নিত্যাংশ। আমরা যে বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করি না কেন, আমরা যে বিষয়েরই চিন্তা করি না কেন, এই সকল তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের আধার স্বরূপ হইয়া নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তত্ত্বগুলি, ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই গুলি আমাদের জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া। যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল তাহা বাহির হইতে আসিতেছে, কিন্তু আমাদের সজ্ঞান আত্মা আমাদের চিরসঙ্গী। সুতরাং তাহারই ক্রিয়া এই সকল নিত্যতত্ত্ব। কেননা, এইগুলি জ্ঞানের জীবন, জ্ঞানের ভিত্তি। সুতরাং, বুঝা যাইতেছে, যত দিন না আমাদের জ্ঞানের মূল পরিবর্ত্তন হইতেছে, যত দিন না আমাদের মূল প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ততদিন আমরা Chaos বলিয়া একটা কিছু কল্পনা করিতে পারি না। নিয়ম সর্ব্বত্র অচ্ছেদ্য। কেন না নিয়মই জ্ঞানের ভিত্তি, নিয়মই জ্ঞানের জীবন। কোন একটা কিছু যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহার অর্থ যে, সে নিয়মিত।

Kant যদিও এইরূপে বিষয় বিষয়ীর

(phenomena and conscious Ego) নিত্য সম্বন্ধ দেখাইয়া জ্ঞেয় বিষয় মাত্রেরই মধ্যে নিয়মের সূত্র প্রবেশ করাইয়া দিলেন; প্রত্যুত যদিও তিনি নিয়মকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমষ্টি (Generalization) হইতে দার্শনিক তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবিতার পদে তুলিলেন; তথাপি তিনি এই খানেই স্বাধীনতা ও আত্মার স্বাতন্ত্র রক্ষার উপায় করিলেন। যখন চারিদিকে নিয়মের বন্ধন তাঁহাকে নাগপাশে ঘিরিয়াছে, ঠিক সেই সময় তিনি আপনার অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে সেই পাশ ভেদ করিয়া স্বাধীনতার জয়ধ্বজা তুলিলেন। আত্মার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভৌতিক জগৎ, যাহা নাগপাশের ন্যায় আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরা আপনারাই আপনাদের শৃঙ্খল প্রস্তুত করিতেছি। আমাদেরই জ্ঞান আমাদের জন্য এই দেশকালান্তর্গত ভৌতিক জগৎকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিতেছে। যাহাকে দেখিয়া আমরা ভীত হইতেছিলাম, সে বস্তুতঃ আমাদেরই ছায়া—কেননা বিষয়ের নিয়ম বন্ধন সমস্তই বিষয়ী পুরুষের ক্রিয়া। যাহাকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত, জ্ঞানের সীমাবন্ধনকারী বিপরীত শক্তি মনে করিতেছিলাম, বস্তুত সে আমাদেরই জ্ঞানের বিষয়, তাহার অস্তিত্ব আমাদেরই জন্য এবং আমাদেরই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অবশ্য আমরা আপনারাই আবার আপনাদের জ্ঞানের বিষয়—কিন্তু সেই টুকুই আমাদের সমগ্র জীবন নয়। আমরা যে কেবল জ্ঞানের বিষয় তাহা নয়, আমরা বিষয়ী। আমরা যে প্রকৃতির অনেকের মধ্যে একটি, অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়, তাহা নয়; আমরা স্রষ্টা এবং সকল বিষয়ের আধার। আমি না থাকিলে জগতের কোন জ্ঞেয় বিষয়েরই অস্তিত্ব সম্ভবে না। আমি যেমন এক দিকে জগতের অন্যান্য সকল পদার্থের মধ্যে একটি হইয়া দেশ কালের অন্তর্গত হইয়া অহরহঃ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, সেইরূপ অপর দিকে আবার আমি সজ্ঞান বিষয়ী হইয়া পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত, কালের মধ্যে কালাতীত হইয়া এবং নিয়মের মধ্যে নিয়মাতীত নিয়মকর্ত্তা হইয়া রহিয়াছি। আমি নিয়মাতীত, কেন না আমি নিয়মের কর্ত্তা, নিয়মের আধার। নিয়ন্তা স্বীয় নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নয়। আমার ভিতর এই যে সকল তত্ত্ব রহিয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধে আর কিছু জানি আর না জানি, এই নিশ্চয় জানি যে তাহারা বিষয়ের নিয়মে আবদ্ধ নয়। কেন না বিষয়ের নিয়ম বিষয়ীতে বর্ত্তাইতে পারে না। মোট কথা এই যে, দেশ এবং কালগত প্রকৃতির বিকাশের জন্য দেশকালাতীত এক তত্ত্বের প্রয়োজন। জ্ঞানজীবন আত্মাই সেই তত্ত্ব। এই আত্মা ইন্দ্রিয়গোচর প্রকৃতির নিয়ম সকলের আধার হইয়া, ক্রিয়াশীল প্রকৃতির জীবনস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং আপনার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া ইহাদের অস্তিত্ব সম্ভোগ করিতেছে।

অভাব পক্ষে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে এ কথা বলা গেল যে সে প্রাকৃতিক নিয়মের আধার, সুতরাং নিয়মভঙ্গের ভয়ে তাহার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে

পার না। সেই রূপ ভাব পক্ষে এই স্বাধীনতার কিছু বিশেষ প্রমাণ আছে কি? Kant বলিলেন, হাঁ, আছে। কিন্তু সে দার্শনিক জ্ঞানের প্রমাণ হইতে পারে না। দার্শনিক জ্ঞান এই অভাব পক্ষীয় প্রমাণ টুকুর বেশি যাইতে পারে না। তবে আমাদের ধর্ম্মবৃত্তি হইতে আমরা এ সম্বন্ধে একটি অতি সুদৃঢ় প্রমাণ পাই। আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি যে মুহূর্ত্তে আমাদের ন্যাযান্যায় জানাইয়া দেয়, সেই মুহূর্ত্তেই ন্যাযের অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য, এই কথা বলিয়া দেয়। প্রত্যেক ধর্ম্ম নিয়মের সঙ্গে একটা অবশ্য-কর্ত্তব্যতা ভাব (categorical imperative) জড়িত। এই অবশ্য-কর্ত্তব্যতার ভাব আমাদের সকল কর্ম্মের দায়িত্ব, কোনরূপ ওজর আপত্তি না শুনিয়া, আমাদেরই স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়। এইভাবে ধর্ম্মবুদ্ধি যে কেবল এটি ন্যায ওটি অন্যায একথা বলিয়া দেয় তাহা নয়, সে আরও বলে যে এটি কর্ত্তব্য ওটি অকর্ত্তব্য। বস্তুত ন্যায় এবং কর্ত্তব্য একই কথা। কিন্তু এই ন্যায এবং কর্ত্তব্যের একত্বের ভিত্তি স্বাধীনতা। আমার যদি ন্যায পথে চলিবার স্বাধীনতা না থাকে, তবে এটি আমার কর্ত্তব্য—এটির জন্য আমি দায়ী একরূপ কথার কোন অর্থ থাকে না। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে দায়িত্ব নাই, কর্ত্তব্যও নাই। সুতরাং ধর্ম্মবুদ্ধির ভিত্তির স্বরূপ স্বাধীনতা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যতিক্রম অপরাধে যে স্বাধীনতা বিরুদ্ধে কোন যুক্তি উঠিতে পারে না, Kant পূর্ব্বেই তাহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মবুদ্ধিজাত এই প্রমাণটি আকাট্য মানিতে হইবে। স্বাধীনতার সঙ্গে ঈশ্বর ও মানবাত্মার অমরত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মজীবনের যে বিবাদ (moral struggle), বাসনা ও ধর্ম্মের যে নিত্য সংগ্রাম সে বিবাদের অর্থ কিছুই থাকে না, যদি এমন এক পুরুষ না থাকেন, যাঁহার জীবনে এই বিবাদের সামঞ্জস্য হইয়াছে, এবং যাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই আমাদের জীবন। এই পুরুষই ঈশ্বর। জীবাত্মার স্বাধীনতার ন্যায় পরমাত্মার স্বাধীনতা সম্বন্ধেও কোন আপত্তি খাটে না। আমাদের জীবনে এই বিবাদের সামঞ্জস্য একেবারে কখনই সম্ভব নয়। কেন না, আমাদের ধর্ম্মজীবন এই বিবাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জ্ঞানের জন্য যেমন একটী বাহ্য শক্তির উপর নির্ভর করি, সেইরূপ ধর্ম্মের জন্য নীচ বাসনা সকলের উপর নির্ভর করি। সুতরাং আমরা চিরকাল সেই মহান্ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইব, কিন্তু কখন সে আদর্শ সম্পূর্ণরূপ জীবনে পরিণত করিতে পারিব না। আর অধিক দূর Kant-এর সঙ্গে না গিয়া এইখানে আমরা তাঁহার দর্শনের মূলতত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা যে উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে Kant-এর দর্শন কি আলোক দিতে পারে তাহা দেখা যাউক। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি তত্ত্বের আবিষ্কার করা যাহার জীবনে ভৌতিক প্রকৃতির এবং ভৌতিক নিয়মের সহিত জ্ঞানের স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য হইতে পারে। আমরা ইহাও জানি যে Kant-এর দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই। এখন দেখা যাউক তিনি তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে

যে Kant যখন বলিয়াছেন যে "বিষয়" মাত্রই "বিষয়ীর" সহিত সংযুক্ত--জ্ঞান-সূত্রে গ্রথিত, আর, বিষয়ী-বিযুক্ত জ্ঞান-বহির্ভূত অনিয়মিত প্রকৃতি যে আমাদের কল্পনা করিবারও সাধ্য নাই—এ কথা তিনি ঠিক বলিয়াছেন। এই টুকুই তাহার দর্শনের মূল কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই তত্ত্বটি যতদূর গ্রহণ করা উচিত ছিল তাহা তিনি করেন নাই। বিষয় বিষয়ীর নিত্য সম্বন্ধ তিনি ভালরূপে বুঝিয়া তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাই তিনি একটা বস্তুরাজ্য রাখিয়া দিয়াছেন, যাহার প্রকৃত স্বভাব, তিনি মনে করেন, আমাদের নিকট চিরকাল প্রচ্ছন্ন থাকিবে। এই বহিস্থিত বস্তুজগৎ (Noumenal world) আমাদের জ্ঞানের উপর আঘাত করিলে তাহার যে প্রতিঘাত উৎপন্ন হয়, সেই ঘাত প্রতিঘাতের সংযোগেই আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন দুই বিপরীত শক্তির সংযোগে উৎপন্ন। কিন্তু হায়, দুই জগৎকে একবার পৃথক করিয়া তাহাদের সংযোগ করনের চেষ্টা বৃথা। এইখানেই Kantএর দুর্ব্বলতা। বস্তুতঃ এই দুই জগতের অস্তিত্বই যখন পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন আবার উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? সতত পরিবর্ত্তনশীল দেশ-কালান্তর্গত জগৎ না থাকিলে জ্ঞানের জীবন নাই। আবার অতীন্দ্রিয় নিত্য জ্ঞানময় পুরুষ না থাকিলে প্রকৃতির প্রকাশ নাই। বাসনার রাজ্য ব্যতীত ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ প্রকাশ পাইবার ক্ষেত্র কোথায়? ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাদ না থাকিলে বাসনার দুর্জ্জয় বল কেমন করিয়া অনুভব করি? সুতরাং বৈজ্ঞানিক জগৎ ছাড়িয়া বাসনার রাজ্য ছাড়িয়া যে Kant ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিফল হইয়াছে। এই হেতু Kantএর দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ, নিয়ম ও স্বাধীনতা, বাসনা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি পরস্পরবিবাদী তত্ত্বশ্রেণীর কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। তিনি ইহাদের সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই এই জন্য যে, তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন এই ভুল বিশ্বাস লইয়া যে বস্তু জগৎ বলিয়া এমন একটা কিছু আছে, যাহাকে জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে না। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ গমন বা মহাদেবের বিষপানের ন্যায়, তাঁহার দুই দিক বন্ধ। তিনি তাহাদিগকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতেও পারেন না, কেন না তাঁহার দর্শনের মূল তত্ত্বটি তাহা হইলে ছাড়িয়া দিতে হয়, অথচ তিনি তাহাদের সামঞ্জস্যও করিতে পারিলেন না। এই ভাবে দেখিতে গেলে Kantএর দর্শন বস্তুতঃ যে প্রশ্নটির মীমাংসা জন্য জন্মিয়াছে সেই প্রশ্নটিই আরও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল। আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—তিনি দেখাইলেন যে, সে সম্বন্ধ কেবল চিরবিবাদের। [ক্রমশঃ

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

বুঝেছি আমার।

(গান)

ভূপালী——একতালা।

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুল গুলি নাই
রয়েছে ডোর!
নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
জেগে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
ঘুমের ঘোর,
বাহুলতা শুধু বাঁধনের মত
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না ত ধরা
অধর-কোণে!
আপনারে আর চাহে না লুকাতে
আপন মনে!
মাথামাখি হয়ে মিলনে বিরহে
মলয় পবন প্রাণে নাহি বহে,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়ন-লোর!
আঁখিজল আর চুরি ত করে না
সরম চোর!

বসন্ত নাহি রে এ ধরায় আর
আগের মত,
চাঁদিনী রজনী মলিন বয়ন,
নয়ন নত!
আর বুঝি কেউ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর!
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর!

বাঁশী বেজেছিল, ধরা দিনু যেই,
থামিল বাঁশী;
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি!
আর কেন হাসি, আর কেন কথা,
নয়নে নয়নে কিসের বারতা,
যদি দিবে ব্যথা, দাও তবে ব্যথা
অতি কঠোর!
ভালবাসা নেই, কেন থাকে তবে
মিছে আদর!

কতই না জানি জেগেছ রজনী
কতই দুখে!
করুণ নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে!
বুঝি এত ভার, সহেনাক আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
কেন আসি আর আসি বার বার
দুয়ারে তোর!
ঘুমাও ঘুমাও আঁখি ঢুলে আসে
ঘুমে কাতর!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক-রহস্য নাটক।

TRAGI-COMEDY.

হরিহর ও অঘোর কুমার আসীন।
দূরে ক্ষুদ্র ডেস্কের পাশে বালক অপ্রকাশ-
চন্দ্র খাতায় মক্স-করণে নিযুক্ত।

হরি। আজ্ কোন মতেই পাচ্চিনে।

অঘোর। না মশাই, আজ্ না দিলে চল্‌ছে না। ছমাস হ'যে গেল!

ভীমকান্তের প্রবেশ।

হ। আসুন্ মশাই।

ভীম। এক খানা "হ-য-ব-র-ল" পত্রিকা পাঠিযেছি, পেযেছেন?

হ। আজ্ঞে পেযেছি। আপনি?—

ভী। আমিই তার সম্পাদক।

হ। ও!

ভী। (সগর্ব্বে) আপ্‌নার কাগজে এবার সমালোচনা ক'রেছেন কি?

হ। না, হ'যে ওঠে নি।

ভী। দেখুন্, সব কাগজেই হ'যেছে, শুধু আপনি—(পকেট হইতে ৩।৪ খণ্ড সংবাদ-পত্র বাহির করণ) দেখুন্, সবাই কি ব'ল্‌ছে—(পাঠ) "বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, ওজস্বিতা সম্বন্ধে, মূল্য সম্বন্ধে, ছাপা সম্বন্ধে ত্রিভুবন মধ্যে এ পত্রিকা-খানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কু কিছুই নাই, মাঝামাঝি কিছুই নাই। প্রেম, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, গান, দর্শন, চুটকি সবই আছে। সকলগুলিই সুন্দর, সুরস, সুললিত, সুনির্ব্বাচিত, সুপরিস্ফুট, সুলিখিত। মলাট-খানি পর্য্যন্ত, বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত সু—"

হ। আর থাক্ মশাই।

ভী। না না, আর একখানা দেখুন।

হ। দেখ্‌বো কি, আমি তো কাগজ-খানা সবই প'ড়েছি।

ভী। আচ্ছা—আচ্ছা, বেশ বেশ। আপনি প'ড়বেন নাতো প'ড়বে কে? তা, আপনি কি সমালোচনা ক'রবেন?' এটা জিজ্ঞেসা করা অসভ্যতা মনে ক'রবেন না, আমরা সমধর্ম্মী। আমাদের মধ্যে courtesy কি?

হ. আমার কবিতাটা ভাল লাগে নি।

ভী। বলেন কি মশাই! কবিতাটী নবীন সেন, হেম বাঁড়ুয্যে দুজনেই recommend ক'রে পাটিয়েছিলেন।

হ। হেম বাবু, নবীন বাবু!—আপ-নাকে চিটিতে কি লিখেছিলেন?

ভী। না, কিছু লেখেন নি। লেখক কবিতাটীর সঙ্গে একখানা মস্ত চিটি লিখেছিলেন। লেখক মস্ত পণ্ডিত, সবাই-কার সঙ্গে বড় আলাপ—খাতির করে।

হ। আমার তো আদৌ ভাল লাগে নি।

ভী। (সগর্ব্বে) হুঁ। বড় দাদা গোড়ার লাইনটা প'ড়েই ব'লেছিলেন, "বড় চমৎকার হ'যেছে।" রবি ঠাকুরকে লেখাবার জন্য যাই, সঙ্গে প্রুফটা ছিল। তাঁকে শোনাতে ব'ল্লেন—"আমাকে কেন অপদস্থ ক'রবেন? এত বড় কবি

আপনাদের থাকতে—।'দেখুন না, ঢের ঢের বিরহের কষ্ট দেখেছেন, কিন্তু এমন কষ্ট—

(মুখস্থ)

দাঁড়াতে বিরহ ভরে
এক পায়ে তরু পরে
পারি না পারি না—ওগো আর!
মাথা ঘুরে পড়ি বুঝি,
(উচ্চৈস্বরে) পড়ি বুঝি মাথা ঘুরে
তরু তলে হ'য়ে চুরমার।!

উ! আহা হা। আচ্ছা মশাই, গানটা?

হ। কোন্ গানটা?

ভী। দেওগিরি—

"দুরন্ত বসন্ত অনন্ত সনন্ত
হসন্ত সুবন্ত প্রায়।
রবি ছবি কবি অটবি ভাববি
সবি মৌলবী গায়!"

হ। আমি কিছুই বুঝতে পারি নে।

ভী। হা হা হা। ও পাড়ার ভূদেব বাবু, শম্ভু বাবু, বঙ্কিম বাবু, দ্বিজেন্দ্র বাবু সবটা মুখস্ত ক'রেছেন।' স্বরলিপি শুদ্ধ! আর দিন রাত্রি গাইছেন।

হ। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে।

ভী। হ্যাঁ মশাই। আচ্ছা, গল্পটা?

হ। (ভয়ে ভয়ে) মন্দ হয় নি।

ভী। মন্দ হয় নি কি মশাই? অনুগ্রহ?

হ। (কম্পিত স্বরে) না, তবে—তবে—

ভী। আপনি কিছু বোঝেন না। একে বলে Tale—tale—incidental tale। এক ফর্ম্মার মধ্যেই নায়ক নায়িকার চাওয়া চাওয়ি, হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি, পালান, দেব-মন্দির, গভীর অরণ্য, সাঁতার, এজেহার, জোবানবন্দি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বিদায়, কারাগার, গলায় দড়ি, দাহ সব লিখতে হবে। আবার আসচে সংখ্যায় এক ফর্ম্মার মধ্যেই দেখাতে হবে—স্বর্গ, নরক, দেবতা, দৈত্য, পরমেশ্বর, খেমটা নাচ, বাই নাচ, দিল্লীওয়ালীর গান, খেয়াল, ধ্রুপদ, মিলন, পুষ্পবৃষ্টি—

হ। (ক্রন্দন স্বরে) আমি জানতেম না, তাই—

রক্ষাকালী বাবুর প্রবেশ।

আসুন।

রক্ষা। সমালোচনা?

হ। কিসের মশাই?

র। "ষ্টুভিঃ ষ্টষ্যদাস্তটোঃ" পত্রিকার।

হ। না, এবার হয় নাই।

র। না হোক্ তার জন্য ভাবি নে, আশ্চেবার ক'রবেন। এবার আমার বইখানার—

হ। কি বই?

র। "মজার বাসর।"

হ। এবার হবে না।

র। আচ্ছা, না হোক। তবে একটা লেখা দিন।

হ। লেখা।।

র। হ্যাঁ দিতেই হবে।

হ। ও কাগজে!—কাগজটা একটু ভাল করুন।

র। কাগজ ভাল ক'রবো কি? মা জগদম্বার কৃপায় সাড়ে উনিশ জন গ্রাহক জুটেছে। লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি হিন্দু চাঁদা—donation দেবে—পত্র লিখেছে। আর এক সংখ্যা পেলেই তারা দুই—আঠারো—ছিয়াত্তর—দেড়শ—এক এক লক্ষ ক'রে টাকা পাঠাবে।

হ। বলেন কি? আমি ত কোনোটা বুঝ্‌তে পারি নে।

র। কোনোটাও না? আচ্ছা, "হিন্দু-ধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা?" (মুখস্থ)—"বিরাটতনয়দিগেদেশে বিবাটরূপ নিতান্ত-লাক্ষাবসরাগলোহিতাম্বর-চরণযুগল-পবিধৃত-তিরস্কৃত-পরভৃত-নিনাদ-নূপুর-নিক্কণ-নোদিত ত্বিষাম্পতি-কলানিধ্যুশনস্‌-শনৈশ্চর-ধূমকেতু-গ্রহোপগ্রহগ্রামকিরণনিকরোচ্ছুবিতোদবজলধর পটলপাটলখ'লিহ মেনকামনোমোহন গৌরী-গুরু গিবি হিমালয, বামেতবে অবিবতপবন-বিধূননোত্থিতোত্তালতবঙ্গবঙ্গভঙ্গসংক্ষুব্ধ নক্র-তিমিমৎস্যকুর্ম্মকুম্ভীরশম্বুক-ভেক-সমাকুল ভ-য়াল বিশাল বারিনিধি, প্রাচীপ্রতীচীপ্রদেশ-পরম্পরে প্রতিহারীপ্রতিম প্রচুর প্রাচীন প্রকৃতি-প্রাচীর, মধ্যভাগে মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক-যোগীজনযোগভূমি সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পুণ্যক্ষেত্র ত্রিকোণমিত জম্বুদ্বীপ—"

হ। এ কি Geometry, ভূগোল, না কাদম্বরী?

র। হা হা! দেখুন লেখাটা প'ড়ে সমালোচক কি ব'লেছেন—(বগল হইতে সংবাদপত্র বাহির করণ, পাঠ) "হিন্দুধর্ম্মের সরল ব্যাখা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দে প্রায় নৃত্য করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সম্পাদক অধুনাতন পতিতোন্মুখ হিন্দুধর্ম্মের—হিন্দুসমাজের কল্কি অবতার। এ পত্রিকা যদি উঠিয়া যায়, আমরা শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, আমরা আত্মঘাতী হইব। আমাদের পাঠকগণকে, বিজ্ঞাপনদাতাগণকে, সংবাদদাতাগণকে, আমাদের কাগজে যাঁহারা মসলা বাঁধেন, জুতা বাঁধেন, আমা-দের প্রেসের দপ্তরী, কম্পোজিটার, কালী-ওয়ালা ছোকরা—সকলকেই ইহার গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ—"

হ। আর থাক, মশাই।

বা। দেখুন না, ইনি আবার আমাকে (অন্য কাগজ উল্টান) শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ দশা-বতার ব'লেছেন—

হ। দশ অবতারই—মীন, কূর্ম্ম, বরাহ।

র। দেখুন না, চোক্‌ থাকৃতে কাণে কেন? তা লেখা দেবেন কি না, বলুন। আপনার শ্বশুরালয আমার মাতুলানীর পিতৃস্বসার জামাত আলয়ের নিকটে। আপ-নার উপর আমার জোর খাটে। (হস্ত ধরিয়া) দেবেন কি না?

(হস্ত মুচড়াইবার উপক্রম।)

[হরির হস্ত ছিনাইয়া অন্দরে বেগে প্রস্থান।

(রক্ষাকালী অঘোরকুমারের নিকট সরিয়া আসিয়া)

লেখা?

অ। (ঢোক গিলিয়া) মশাই—আমি, মশাই—

র। আমি কি?

অ। আমি—আমি—কাপড় বেচি, বড়-বাজারে আমার দোকান, আ—

র। ঠাট্টা! তোমার বগলে কি?

অ। আজ্ঞে, খাতা।

র। দাও। (কাড়িবার উপক্রম।)

অ। হিসাবের খাতা—হিসাবের খাতা। মশাই, পায়ে পড়ি,—

র। টাকা নিয়ে লেখ, তাই দেবো। দাও, ছাপ্‌তে দিইগে।

[অঘোরকুমারের উর্দ্ধশ্বাসে খাতা ফেলিয়া প্রস্থান।

(খাতা বগলে লইয়া, অপ্রকাশচন্দ্রের নিকট আসিয়া) লেখা?

অপ্র। আজ্ঞে, লিখ্‌ছি।

ভী। (সরিয়া) সমালোচনা?

(অপ্রকাশচন্দ্রের ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টে চাওন।)

আমার বেলাই—(অপ্রকাশের কাণ ধরিয়া) স—মা—লো—চ—না—আ—

অপ্র। কাকা—ও কাকা—ওঁ—ওঁ—

[সারাদিন হরিহরের বৈঠকখানায় "লেখা,—লেখা, সমালোচনা—সমালোচনা, কাকা ও কাকা।' অন্দর হইতে করুণ কণ্ঠে—'বাবারে পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। কাকা ও কাকা।'

প্রেমদাস।

অজীর্ণের টোট্‌কা।

সচরাচর দেখা যায়, আমাদের অধিকাংশ রোগ আমাদের আহার হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তার মধ্যে অজীর্ণই সর্ব্বপ্রধান। অজীর্ণ হইতে অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা ব্যাধি জন্মে। আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে এ রোগ দেখিতে পাই। হজ্‌মিগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া Eno's Fruit Salt পর্য্যন্ত ইহার ঔষধও অনেক হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ততটা কাজ দেখিতেছি না। আমরা সেই জন্য সহজলভ্য গোটাকত 'ঘর কোটালে' টোট্‌কার কথা লিখিতেছি। ইহা কেবল ঔষধ নহে, আহার ঔষধ দুই। যে সামগ্রী খাইয়া অজীর্ণ হইলে যে সামগ্রী খাইলে তাহা সারিবে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদান করিলাম।

আদা—ইক্ষুগুড়।
আম, আঁব—দুধ, মৎস্য, সৈন্ধবলবণ, পলাশের মূল।
আমলকী—কাঁঠাল, ধুনা।
আলু—চালুনি জল।
ইক্ষুগুড়—আদার রস, জল।
ওল—গুড়, তেঁতুল।
কৎবেল—নিম ফল।
কর্পূর—মৃগনাভি।
কবেলা—শ্বেত সর্ষপ।
কলম্বা নেবু—তপ্ত জল, আম্রবীজ।
কলা—ঘৃত, কাঁঠাল।
কাঁকুড়—গম, রুটি।
কাঁঠাল—কলা।
কাঁজি—মাংস, তিল তৈল।
কেসুর—শিঙ্গাড়া, পানীফল।
কিস্‌মিস—পদ্মের মৃণাল।
কুঙ্কুম—জায়ফল।
খেজুর—চিনি, নিম ফল।
খেজুর গুড়—শুটের গুঁড়া।
খিচুড়ী—সৈন্ধব লবণ।
গণ্ডার মাংস—ভেরাণ্ডার তৈল।
গম—কাঁকুড়, অল্প ধুতুরা পাতা।
গাব—বকুল।
গুড় (খেজুর)—ওল, শুটের গুঁড়া।
গুড় (ইক্ষু)—আদার রস।
গোঁড়া নেবু—জল, চুনের জল।
ঘৃত—নেবুর রস, কলা, ঘোল।
ঘৃতপাক দ্রব্য—জামের রস, শিরকা।
ঘোল—দুধ, ঘৃত।
চাউল—নারিকেল, তালশাঁস।

চাঁপানটে শাক—শ্বেত সর্ষপ।
চুন—বাদাম, নারিকেল, নেবুর রস।
ছোলা—কাঁকুড়, অল্প ধুতুরা পাতা।
জীরা—বড়া।
জল—পিঠে, জলে রূপা বা সোণা ৭ বার পোড়াইয়া ৭ বার ডুবাইয়া সেই জল খাইবে।
জৈত্রি—সমুদ্র ফেনা।
জাম—লবণ।
জায়ফল—কুস্কুম।
ঝাল—পদ্ম।
তপ্ত জল—কলম্বা নেবু।
তালশাঁস—চাউল।
তিল তৈল—কাঁজি, তেঁতুল।
তেঁতুল—লবণ, তৈল।
তাল—নোয়াড়ির ফল।
দুধ—ঘোল, আম, সল্‌ফর।
দালিম—নেবু।
দুধ ও দধি (মহিষীর)—শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ।
ধনে—বড়া।
নারিকেল—চাউল।
নেবু—শাকের ডাঁটা, চুন।
পিঠে—জল।
পলাশের মূল—আম্র।
পান ও সুপারি—নারিকেল জল।
পক্ষী মাংস—কেশের মূল জল দিয়া পিষিয়া গরম করিয়া খাইবে।
পানে অধিক চুন—নারিকেল, বাদাম, তেলে ছাই।
পায়েস—মুগের যুষ।
পটল, পালম ও পুঁই—শ্বেত সর্ষপ।
পাঁপর—সজিনা বীজ।
পদ্মের মৃণাল—কিস্‌মিস্‌।
ফেনী—লবঙ্গ।
বকুল—বকুলের মূল বা গাব।
বেগুন—শ্বেত সর্ষপ।
বর্ব্বটী—দধি।
বুকে গ্রাস লাগা—আবার সেইরূপ গ্রাস করিবে বা জল খাইবে।
ভাত—সজল দুধ।
মটর, মুগ—অল্প ধুতুরা পাতা।
মাংস—লবণ, শুক্‌না চিনি, কাঁজি, আম্রবীজ।
মৎস্য—আঁব, মাংসের কাবাব।
মদ—গেরি মাটি গুলিয়া।
মরিচ—বড়া।
মাষকলাই—নিম্ব ফল।
মৌয়া—ফলসা, মুথা।
রসুন—মুথা।
লবণ—অম্ল, চালুনি জল।
শ্রীফল—ক্ষীরী ফল।
শূকরের বা কচ্ছবের মাংস—কাঁজি, লবণ।
সকল প্রকার শাক—তিল গাছের ক্ষার।
হিং, হরিদ্রা—বড়া, মুথা।

কোন্ দ্রব্যের সহিত কোন্ দ্রব্য খাইলে শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহা এই ফর্দ্দ মনে রাখিলে জানিতে পারিবে যথা;—আঁবের সহিত দুধ; ঘৃতের সহিত লবণ, নেবু বা কলা; ভাতের সহিত সজল দুধ ইত্যাদি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অস্তমান জীবনের পত্র।

ভাই, দেখিতে দেখিতে—অতি ধীর পদ-ক্ষেপে—আমার এই সৌরভহীন শত-অভাব-ময় সংসারের শত-ধূলি-মাখান চির-শূন্য জীবনের অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। দুঃখ-কীট-দষ্ট জীর্ণ গলিত-প্রায় জীবন-পুস্তকের আর এক খানা পাতা অবশিষ্ট! জীবন-প্রদীপ নিবিতে আর অধিক দেরি নাই! তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছে! সে দক্ষিণে বাতাস চিরদিনের মতন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রভাত-তপনের অনন্ত পথে অগ্র-সরের জন্য সে মধুর আহ্বান আর শুনিতে পাই না। বুঝি সময় আসিয়াছে। জীবন

অবকাশের জন্য ব্যাকুল। জীবনের চারিদিক ঘোর অন্ধকার করিয়া, এ পৃথিবী হইতে চির-অদৃশ্য করিবার জন্য বিস্মৃতি-রূপিনী কাল বিভাবরী আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কাণের কাছে, প্রতিদিনের শত শত দীর্ঘনিশ্বাস ও শত শত অশ্রুকণাবাহিনী বৈতরণীর কি এক অস্ফুট-তরঙ্গ-গর্জ্জন অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে! হৃদয়ের কোন্ দেশ হইতে কে যেন প্রেম-হীন কঠোর কণ্ঠে ডাকিতেছে। হায়! এত দিন—এ সুদীর্ঘ কাল কি করিলাম? এ অমূল্য শত পুণ্যফলের মানব জীবন বৃথাই গেল! জীবনের একটাও কাজ করিলাম না! এই অনন্ত বিশ্বের কিছুই জানিলাম না! কেবল ক্ষুদ্র পাখীর মতন এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের চারি ধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। সংসারের স্রোতে হৃদয়-তরি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। চিরদিন বিফল উচ্ছাসে গা ঢালিয়া, এমন সাধের মানব-জীবন, অসার শোকের আলয়, বাসনার কারাগার ও মিছে কথা ছলনার উৎস করিয়া ফেলিলাম। উন্মাদ, নব নব খেয়ালে মত্ত ধনী সন্তানের মতন জীবন লইয়া ভাঁটা খেলিলাম। একবার ভাবিলাম না যে, ইহার পরিণাম আছে। কার্য্য-ফল অবশ্যম্ভাবী। কার্য্য-ফল সম্বন্ধবদ্ধ। জীবনের উদ্দেশ্য কি? কেন জন্মিলাম? এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? জীবনটা কি ছায়া? "আসে, থাকে, আর মিলায়ে যায়?" হায় হায়! এত দিন কি করিয়াছি!

আজ কাঁদিতেছি। ভাবিতেছি। আজ এই অনন্ত নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগৎ তন্ন-তন্ন করিয়া কারণ অনুসন্ধানে রত হইয়াছি। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভাল করিয়া দেখিতেছি জীবনের কোন্ বরগা খানায় ঘুন ধরিয়াছে—কোন্ তারটা বেসুরো বাজিতেছে। হায়! কেন কাঁদি, যাহা স্বহস্তে স্বইচ্ছায় নষ্ট করিয়াছি, তাহার জন্য আবার কাঁদি কেন? দুঃখের মালা যখন সাধ করিয়া গলায় পরিয়াছি, তখন আবার তাহা খুলিয়া ফেলিতে এত ব্যস্ত, কেন? ঐ ত দুঃখ! জগতের ঐ ত রহস্য! আজীবন যাহা খুঁজিলাম, যাহার জন্য দেহ মাটি করিলাম, তাহাকে ত পাইলাম না। যাহাকে হীরক মনে করিয়া ছুটিলাম, তুলিয়া দেখি তাহা কাচ। কেন এ ভ্রমে পড়িলাম? কে প্রলোভন দেখাইল? বাহ্য সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া কে এ নির্ব্বোধের চির-দিনের মত সর্ব্বনাশ করিল? মানুষ এত ইচ্ছাধীন কেন? কেন সে ইচ্ছা সদা চঞ্চল-ময়ী? বৃত্তিগুলা সর্ব্বদা এত ভেল্কী লাগায় কেন? মনের উপর ভৌতিক পদার্থের এত প্রভুত্ব কেন? জীবনের সুখ এত পরের উপর নির্ভর করে কেন? এ কি কম দুঃখের কথা যে, মানুষ, মানুষের কোন কাজের কর্ত্তা নয়। কেবল কার্য্য-বাহক দাস মাত্র। আমি কি করি? আমার কোন্ কাজের আমি কর্ত্তা? আমার কি জানি আমি? কি বুঝি? সকল কাজের আজ্ঞাইত আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে আসিতেছে। শরীরী-আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি মাত্র। যন্ত্র যেমন মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়,—আমরাও সেইরূপ পরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি। তাহার অধিক ক্ষমতা আমাদের আর কোথায়? প্রতিদিন চারিদিক হইতে কত নিন্দা, কত গালিগালাজ শুনিতেছি। কত লোকে, কত প্রকারের কঠোর, মর্ম্মভেদী বচনে হৃদয় আমূল বিদ্ধ করিতেছে। সব

দেখিতেছি, সহিতেছি। কি করিব বল! কাহাকে কি বলি। জানিয়াছি, বুঝিয়াছি যে, মানুষের স্বভাবই এইরূপ। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতি। তাই ত কাঁদি। মানুষের এই ভ্রান্তিপূর্ণ পরমুখ-প্রেক্ষী অবস্থা স্মরণ করিয়া তাই ভাবি যে, প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কেন এমন হইল? কে তাহাকে এরূপ অসম্পূর্ণ করিয়া গড়িল? পদে পদে দুর্ব্বল করিল? চিরদিনের এ দুর্ব্বলতা হইতে মানুষকে কে রক্ষা করিবে? এ পৃথিবীতে যে মানুষ বড়—বড় দুর্ব্বল। আমিও তাই, বড়—বড় দুর্ব্বল। কিন্তু দোষ কার? আমার? আমি কি স্বইচ্ছায়, সাধনা করিয়া, দুর্ব্বল হইয়াছি? দেখিতেছ না, কে আমাকে প্রতিদিন একটু একটু করিয়া বিশ্বের মোহময় বিচিত্র মায়াজালে শতপাকে জড়াইয়া বিকল করিয়া ফেলিতেছে। জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক চোখের সম্মুখে রাখিয়াও, মায়ার অন্ধকার ত দূর করিতে পারিতেছি না। তাই বলি, মানুষের কি দোষ? দোষ মূলে,—সৃষ্টির অভ্যন্তরে। একবার গোড়ার কথাটা—সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যটা—বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি। মনশ্চক্ষে চাহিয়া দেখ দেখি, আমাদের সকল কর্ম্মের, জগৎ-রহস্যের, পিছনে দাঁড়াইয়া কে। কে ভিতর হইতে অদৃশ্য সূত্র ধরিয়া সকল কল চালাইতেছে। বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে দেখিতেছ, মানুষ যাহা কিছু করিতেছে, সে সকলই ত সেই অনন্ত অদ্বিতীয় সর্ব্বমূলাধারের অচিন্ত্য লীলায়—হুকুমে।

কে তিনি? কোথায়? অনেক দিন ধরিয়া যে তাঁহাকে খুঁজিতেছি। ডাকিতেছি। আর যে পারি না! দেহ যে অবসন্ন—মৃতপ্রায়! এ মনের দুঃখ আর কাকে জানাইব? তিনি ভিন্ন এ জগতে আমার দুঃখ আর কে বুঝিবে? আমার কত দুঃখ! আমার দুঃখ, কেন তিনি মানুষকে অন্ধ করিয়া, পাপপ্রবণ করিয়া, শত অভাবের সমষ্টি করিয়া সৃজন করিলেন? মানুষ, কেন মরণাধীন? জগতের যে দিকে চাই, দেখিতে পাই, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। তবে কোন্‌টা ঠিক? সত্য কাহাকে বলি? জীবন সত্য, না, মৃত্যু সত্য? জীবনের পুরস্কার কি কিছুই নাই? জীবনের পুরস্কার হ'ল অন্ধকার—মৃত্যু? আলোর পরিণাম শেষ অন্ধকার? ইহাই কি উন্নতি? ইহাকেই কি পূর্ণতার পিছনে দৌড়ান বলে? তাঁহার কার্য্য আমরা কিছুই জানি নাই, বুঝি না বটে। তাঁহার সকলই ধূঁয়ায় আচ্ছন্ন। তবু প্রাণ কাঁদে। তবু প্রাণ কাঁদিয়া বলে যে, তিনি,—সৃষ্টিকর্ত্তা, মনে করিলে কি তাঁহার সৃষ্টি পূর্ণ করিয়া, সকল অভাব শূন্য করিয়া গড়িতে পারিতেন না? মানবের এ চির-কান্না কি ঘুচাইতে পারিতেন না? পৃথিবীতে কি সকল জীব আজীবন ধরিয়া কাঁদিয়া—অন্ধকার হইতে অন্ধকারান্তরে ঘুরিয়া যাইবে? তবে ইহাকে কি করিয়া সৌন্দর্য্যের আধার সর্ব্বকারুণিকের রাজ্য বলিব? কি করিয়া বলিব যে, তিনি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ প্রেমময়?—তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রেম যে তিনি অহরহঃ ভাঙ্গিতেছেন! তাঁহার সূত্র, তাঁহার মালা, তাঁহার ঐকতানিকতা যে তিনি নিজেই নষ্ট করিতেছেন!—তিনি প্রাণ, আমি দেহ! তিনি গান, আমি বাঁশী। তিনি ইচ্ছা, আমি বিকাশ। কেন তিনি

এ দেহ মাটি করিলেন? এ সুখের বাসা কেন চিরদিনের মতন ভাঙ্গিলেন? বাঁশী কেন আর রাধা-গান করে না? ইচ্ছা কেন বিকৃতি প্রাপ্ত হইল? আমার সু ও তিনি, কু ও তিনি। কেন তিনি সবটা সু করিলেন না? যদি তুমি বল যে, তিনি মানুষে সু ও কু দুই সমান পরিমাণে দিয়া, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত জগতে পাঠাইয়াছেন। কু'র পরাজয়ই মানুষের মহত্ব— মনুষ্যত্ব। তাহা হইলে আমি বলিব, যিনি সকল প্রকার সুখ-দুঃখ এবং জগত বন্ধনের অতীত, যিনি অবিকৃত ও অব্যয়, তাঁহার আবার পরীক্ষা কি? কিসের জন্য তিনি পরীক্ষা করিবেন, বল? তাহাতে তাঁহার কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য, কোন্ অসীম কার্য্য সিদ্ধ হইবে? কোন্ অসম্পূর্ণ অদৃশ্য রহস্যের মূল বাহির হইবে? অথবা কেবল তাহাই বা বলি কেন? যে এক অসম্পূর্ণ চির-অজ্ঞাতমূল জীবময়ী অশরীরী বিরাট কার্য্য-শক্তি, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাহার প্রাণে-প্রাণে মিশিয়া, পূর্ণতার গীতিময় অসীম বিজন পথে অবিরাম চলিয়াছে; তাহার সঙ্গে মানবীয় সুখ-দুঃখ রহস্যের কি সম্বন্ধ বল? এ সৃষ্টি-রহস্য মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত। ইহার সঙ্গে মনুষ্য-সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতির কিছু সম্বন্ধ নাই। থাকিলেও, তাহার জন্য সে দায়ী নহে। তাহাকে কখন দায়ী করিও না। মনুষ্য ইহা হইতে অনেক দূরে। ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব জগতে কোথায়? সুখ-দুখ-সৃজন কারী এবং পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার-দাতা-স্বরূপ কোন দেবতা মানব-অদৃষ্ট-খাতা হাতে করিয়া কোথাও বসিয়া নাই।

দেখ, সকল মানুষই এইরূপে কাঁদে। এইরূপে তাহারা আপনাদের অদৃষ্টের জন্য ঈশ্বরে দোষারোপ করে। ইহা ভ্রান্তি, অজ্ঞানতার ফল। বিশ্ব-তত্ত্ব, বিশ্ব নিয়ম তাহারা কিছুই বুঝে না। কে বলে বিশ্ব পূর্ণ? বিশ্ব পূর্ণ নহে। কোথায় দেখিয়াছ, গাছ জন্মাতে না জন্মাতেই আগে ফল জন্মিয়াছে? বিশ্বের জন্ম কাজ হইতে, অপূর্ণতা হইতে, আরম্ভ হইতে। শেষ হইতে নহে। পূর্ণতার গতি নাই। পূর্ণতা অপরিবর্ত্তনশীল। জগৎ অপূর্ণ। তাই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। বিশ্বের গতি, অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে। তার পর সুখ-দুঃখের কথা। সুখ দুঃখ ঈশ্বর-দত্ত নহে। যে পদার্থে মানব সৃজিত, সুখ-দুঃখ সে পদার্থের নহে। তাহাকে আমি মানবীয় বৃত্তি বলিতেও পারি না। মানবীয় সুখদুঃখের উপর ঈশ্বরের কোনও হাত নাই। সুখ-দুঃখ, মানবের অবস্থান্তর মাত্র। মনের গতির সঙ্গে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ। সমাজ তাহার জন্য দায়ী। আর এক কথা। সুখ-দুঃখের হাহাকার রব কখন ঘুচিবে কি না জানি না। ঘুচা উচিত কি না তাহাও বলিতে পারি না। দুঃখ না থাকিলে কে সুখ চাইত? কে তাহার সাধনা করিত? বিশ্বের উন্নতি এত কোথা হইতে হইত? "Suffering spiritualizes!" দুঃখই সুখের মূল। স্বর্গের দ্বার। অনন্তের একমাত্র পথ। তাই বলি ভাই, দুঃখের জন্য কখন কাঁদিও না। দুঃখ সহ্য কর। দুঃখে ধৈর্য্য, অনাসক্ততা, অধ্যবসায়িতা শিক্ষা কর। দুঃখ-আগুণে পুড়িয়া আপনাকে পবিত্র, উন্নত কর। ঈশ্বরগত সমস্তভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর, বিভোর

কর। এই সুখ দুঃখের জোয়ার ভাটা খেলিতে খেলিতে অগ্রসর হও, অনন্ত-সৌন্দর্য্যময় চিরদিবসের অপরিবর্ত্তনশীল পূর্ণতা-মহাসিন্ধু মিলিবে। দুঃখ যাইবে। ঈশ্বর-প্রাপ্তি হইবে। জলবিন্দু সাগরে মিশিবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

তুলার চাস।

তুলার চাস আমাদের দেশ হইতে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। সে তাঁতিবংশ লোপ পাইয়াছে; সুতাহাটা উঠিয়া গিয়াছে; ঘরে ঘরে চরকা-কাটার সে ধুম আর নাই। তুলার চাসও এ দেশে আর বড় হয় না।

এখন হয় না, কিন্তু তখন খুব হইত। তখন ঘর ঘর চরকা কাটিত, ঘর ঘর তুলার চাস না করুক,যাহার ভদ্রাসন ভিন্ন অন্য জমি আর নাই সেও উঠানে দুই চারিটা কাপাসের গাছ দিত। বাঙ্গালায় তুলার চাসের নিতান্ত দুরবস্থা হইলেও আমেদাবাদ প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলে এবং গুজরাটি প্রদেশে অনেক দিন এ চাস রীতিমত চলিয়াছিল। এখনও হয়, কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য মাত্র। দিন দিন ইহার অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে ভয় হয়, তুলার চাস বোধ হয় আর এ দেশে হইবে না।

অথচ তুলার চাস আমাদের দেশে হওয়া উচিত। হওয়া দরকার। ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত আমরা কোন কালে প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না। তবে ম্যাঞ্চেষ্টারকে যতদূর আমরা হাতে রাখিতে পারি এখন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার এক মাত্র উপায়, তাহাকে তুলা ও পাট যোগান দেওয়া। ইহাতে বেশ দু পয়সা লাভও আছে। তুলার দর ভাল। কাপড় বেচিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার তো দেশ হইতে সব টাকা লইয়া গেল, তবু তুলার চাসে আমরা যদি তাহার কাছ হইতে কতক টাকাও ফিরাইয়া আনিতে পারি, মঙ্গলের কথা। ভারতের ভূমি স্বর্ণপ্রসূ, আর কিছুর জোরে আমরা লড়িতে পারি না পারি, আমাদের জমির জোর আছে। দুঃখের বিষয়, ইহা সকলে বুঝে না। আজ আমেরিকা ম্যাঞ্চেষ্টারকে তুলা যোগাইয়া বড় মানুষ হইয়া গেল, আর আমরা মূর্খ কেবল ম্যাঞ্চেষ্টারের বিরুদ্ধে আর্টিকেল লিখিতেছি, বক্তৃতা দিতেছি, আর বোকার মত তাহার কাপড় কিনিতেছি।

আমরা না কি নিতান্ত মূর্খ ও অকৃতজ্ঞ, তাই বুঝি মাতা ভারত-ভূমিও আমাদের প্রতি বিরূপা হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সর্ব্বলোকবিদিত উর্ব্বরশক্তি কমাইয়া লইতেছেন। আইন আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই, তখন প্রতি একার ভূমিতে ২২৩ পৌণ্ড তুলা জন্মিত, আর এখন প্রতি একারে ৫২ পৌণ্ড মাত্র জন্মে! তাও সকল সময়ে নহে। কেন এমন হইল? মাতা কম দুঃখে সন্তানের প্রতি বিমুখ হন না। হতভাগ্য আমরা আমাদের নিজের ভদ্রাভদ্র বুঝি না, লাভ লোকসান ভাবিয়া দেখি না, জিনিস থাকিতেও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে জানি না, তাই তো আমাদের এ দুর্দ্দশা। তুলার চাস আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কেমন করিয়া তাহার আবাদ করিতে হয় তাহা আর মনে নাই। যাহা

কিছুও এখন করি, তাহা হেলায় শ্রদ্ধায়। কাজেই ফসলও আর তেমন হয় না। কোথায় আমরা এখন লেখাপড়া শিখিতেছি, আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার চাসের উন্নতি চেষ্টা করিব, না একেবারে ইহা ভুলিয়া যাইতেছি, কাজেই ভারতভূমিও আর সে ফসল দিতে রাজি নহেন। নহিলে, আমেরিকায় প্রতি একারে আজ ২০০ পৌণ্ড জন্মে, আর স্বর্ণপ্রসবিনী সেই ভারতে জন্মে কি না ৫২ পৌণ্ড!

তবু এখনও যে জমি সেই জমিই আছে; ভারতসাগরের জলে এখনও তাহা ভাসিয়া যায় নাই; বুঝিয়া স্বঝিয়া আমাদের এ চাসের প্রণালী শিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। রীতিমত চাস করিতে পারিলে ভারতে অন্য দেশ অপেক্ষা যে বেশি ফলিবে ইহা নিশ্চয় কথা। Mr. Rivett-Carnac লিখিয়াছেন, বেরার প্রদেশে একবার একটু ভাল করিয়া চাস দেওয়ায় প্রতি একারে ২৫৫ পৌণ্ড পর্য্যন্ত তুলা হইয়াছিল। তবে দোষ কাহার? ইহার চাসে আপনার ভাল; দেশের ভাল, তবে কেন ইহাতে হেলা করিবে? আমরা সংক্ষেপে সেই চাসের প্রণালীই আজ লিখিতেছি।

১। চাসের সময়। তুলার চাসের সময় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অনেক স্থলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই বীজ বুনে; আবার জাহানাবাদ ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে কার্ত্তিক মাসে বীজ বুনিবার প্রথা আছে। ফলতঃ গরমেই তুলা ভাল হয়। সেই জন্য বাঙ্গালা অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই তুলা বেশি জন্মে। গ্রীষ্মকালই চাসের প্রশস্ত সময়।

২। জমি। যে জমি বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, কি যাহা এত নীচু যে বৃষ্টির জল সহজে নির্গত না হয়, সে জমিতে তুলা করিবে না। আলগা মাটীতে কার্পাস ভাল জন্মে না। পলি মাটিতে কি দোয়াশ জায়গায় গাছ খুব সতেজ হয়, কিন্তু ফলে কম। আঠাল মাটিই ইহার বিশেষ উপযোগী। চৈত্র মাসের বৃষ্টিতে মাটী কিছু নরম হইলে চাস আরম্ভ করিবে। কাপাসের মূল প্রায় এক হাত পর্য্যন্ত মাটীর নীচে যায়, অন্ততঃ এক ফুট পরিমাণ খনন করিবে। কার্পাস-ক্ষেত্রে অস্থিচূর্ণ সার বড় উপকারী। যেখানে তাহা মেলে না, সেখানে বিঘা প্রতি চারি মণ কার্পাসের খইল দিবে। তাহাও না মিলিলে সরিষার খইল ব্যবহার করিবে। চারি মণ খইল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চারি মণ ঝুরা মাটী মিশাইয়া এক সপ্তাহ ঢাকা দিয়া রাখিবে, যেন জল বাতাস না লাগে। তার পর তাহা হইতে একটা গরম ভাব বাহির হইবে; তখন তাহা চসা ক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিবে। জমি এইরূপে তৈয়ার হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ বপন করিবে।

৩। বীজ। কার্পাস নানা জাতীয়—আমেরিকান, ভোটাঙ্গি এবং দেশী। বীজ লইতে গেলে এই তিনের মধ্যে বাছিয়া যাহা ভাল, তাহাই লওয়া উচিত। দেশী কাপাসের গাছে এক বৎসরের অধিক কাপাস পাওয়া যায় না, গাছ মরিয়া যায়। ভোটাঙ্গি বীজের গাছ অনেক দিন থাকে, কিন্তু তুলা পরিষ্কার হয় না, আঁস বড় মোটা। আমেরিকান বীজের গাছ তিন বৎসর থাকে, এবং কার্পাস বড় ভাল হয়। সুতরাং আমেরিকান বীজই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এইরূপ শ্রেষ্ঠতা দেখিয়াই ভারত-গবর্ণমেণ্ট একদিন এখানে আমেরিকান

কার্পাসের চাস প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। Schrottky সাহেবও এই জন্যই বলিয়াছেন—"On account of the greater length of fibre and the general superiority of the American cotton, it was but natural that the Indian Government should have concentrated its attention in the attempt to introduce and acclimatize in India the American variety of the cotton plant." বস্তুতঃ বীজের মধ্যে আমেরিকান বীজই প্রশস্ত।

৪। বুনন। বীজ প্রথম জলে ভিজাইবে। ছুই প্রহর কাল ভিজিলে, তুলিয়া জল ঝাড়িয়া থলিয়ার উপর ঘষিবে। তাহাতে খোসা পাতলা ও নরম হইয়া যাওয়ায় শীঘ্রই অঙ্কুর উদ্গমের সহায়তা করে। ঘসা হইয়া গেলে, কতকটা সোরা জলে ফেলিয়া বীজগুলা তাহাতে ভিজাইতে হইবে। অনধিক একদিন এইভাবে ভিজিলে, বীজ ক্ষেতে বুনিবে। প্রতি বিঘায় আড়াই সেরের অধিক বীজ লাগে না। বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া না দিয়া, আল বাঁধিয়া বুনাই ভাল। এত হাত সওয়া হাত অন্তর ছুই ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া প্রতি গর্ত্তে চারি পাঁচটী করিয়া বীজ বুনিয়া যাইবে। ইহাতে জল সেচিবার বড় একটা আবশ্যক হয় না।

৫। পালন। কাপাসের চাসে, প্রথমেই যাহা কষ্ট, তার পর পালন করিতে ততটা কষ্ট আর নাই। অবৃষ্টি হইলে, যতদিন গাছ এক ফুট পরিমাণ উচ্চ না হয়; ততদিন মধ্যে মধ্যে জল সেচিয়া দিতে হয়। চারা বাহির হইলে, ছুই তিনটী রাখিয়া ছুর্ব্বলগুলিকে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয় কিম্বা যেখানে হয় নাই, সেখানে রোপণ করিতে হয়। ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গাছের গোড়ায় মাটী দিতে হয়। ফল না হইয়া যখন দেখিবে কেবল কাঠ ও পাতা গজাইতেছে, তখন তাহার আগা ছাঁটিয়া দিবে। আবার যদি অতিবৃষ্টি হয়, তাহার জন্য ক্ষেতের মাঝে ছোট ছোট নালা কাটিয়া রাখিতে হয়। অত্যন্ত শীতলতা এবং অত্যন্ত উষ্ণতা উভয়ই ইহার পক্ষে অনিষ্টজনক।

৬। তুলা সংগ্রহ: আশ্বিন মাসে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ হইয়া সমুদয় কার্ত্তিক মাসই ফুটিতে থাকে। ছু দিন পরে একদিন ক্ষেত্র হইতে কার্পাস তুলিতে হয়। একত্রে অধিক ফুটিলে একদিনে তুলিব বলিয়া যাহারা বসিয়া থাকে তাহাদের অনিষ্ট হয়। কাপাস ফুটিয়া নীচে পড়িয়া ধুলা কাদায় নষ্ট হয়, বাতাসে উড়িয়া যায়, বিশেষতঃ বৃষ্টি হইলে একেবারে অকাজের হইয়া পড়ে।

তুলার চাস যে বিশেষ একটা শক্ত ব্যাপার, নট্‌খটি কাজ, তাহা নহে। তবে ইহা কেন আমরা করিতে পারি না? ইজিপ্টের লোকেরা যাহা পারে, আমরা তাহা পারি না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! Mr. Login বলেন, ইজিপ্টে প্রতি একারে প্রায় ২৬৭ পৌণ্ড তুলা হইয়া থাকে। অথচ সেখানে খরচা বেশী। তিনি দেখাইয়াছেন, সেখানে যে চাস ১৭।৶০ আনায় হয় এখানে তাহা ১৩ টাকাও কমে হইতে পারে। ইংরাজেরা ইহা দেখাইয়া দিতেছে; মিশরবাসীরা আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণ অনুর্ব্বর ভূমিতে থাকিয়া আমাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ ফসল উৎপন্ন করিতেছে; আর আমরা সভা করিতেছি, চীৎকার ছাড়িতেছি, লম্ফ মারিতেছি, আপনারা আপনাদের পিণ্ডি চট্‌কাইতেছি!

আপনি-বড়।

মুখে যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহঙ্কার অল্পেই উদ্বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড় হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আতিশয্য বশতঃ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহঙ্কারের ধর্ম্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটক করিয়া রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহঙ্কারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্ব্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মনের মধ্যে রোধ করিয়া রাখিলে মহৎ ধৈর্য্যজনিত এক প্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহঙ্কারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে পোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া না।

যাহারা দুঃখ শোক নীরবে বহন করিয়া সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখের উপরে এক প্রকার উত্তাপবিহীন জ্যোতির্ম্ময় ছায়া পড়ে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত অহঙ্কার যাহাদের হৃদয়-বিবরে ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নেত্রের অধঃপল্লবে এক প্রকার জ্যোতিহীন জ্বালা, তাহাদের চিরশীর্ণ তীক্ষ্ণ মুখে, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রহস্যরেখা সকল প্রকাশ পায়। বরঞ্চ যৌবনকালে এই উগ্র প্রাখর্য্য তাহাদের সৌন্দর্য্যের তেমন ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের যে বিমল শান্তিময় মমতাপূর্ণ অচঞ্চল শান্ত শোভা তাহা তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। বয়সকালে তাহাদের চক্ষুপল্লবে সেই উজ্জ্বল কোমল অশ্রুরেখার ন্যায় ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি, তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। তাহারা সৌন্দর্য্য প্রাণপণে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকূপ হইতে কুৎসিত বাষ্প অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়। তাহারা বার্দ্ধক্য গোপন করিতে চায়, অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, অথচ কোনকালে বার্দ্ধক্যের পরিণত গাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারে না।

যাহারা কিছু একটা কাজ করিয়া তুলিয়াছে, কোন একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে ক্রমশঃ তাহা সম্পন্ন কবিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার সঞ্চিত হইতে পারে না, কার্য্যস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কিছু করে না, করিতে পারে না, মনে করে করিতে পারি অথচ করিতে গিয়া নিষ্ফল হয়, তাহারা অহঙ্কার বাহির করিয়া ফেলিবার পথ পায় না। তাহারা কিছুতেই আপনার কাছে এবং পরের কাছে প্রমাণ করিতে পারে না যে তাহারা বড়, এই জন্য মনের খেদে মনে মনে আপনার বড়ত্বের প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনাকে প্রাণপণে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কণ্টকশয্যায় যেমন বিশ্রাম নাই, তেমনি সে

সান্ত্বনায় সান্ত্বনা নাই। তাহারা যত আপনাকে বড় মনে করে, ততই আরো অধিকতর দগ্ধ হইতে থাকে।

আমি যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের বুদ্ধি আছে অথচ এমন ক্ষমতা নাই যে কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে। এই বুদ্ধির প্রভাবে তাহারা আপনাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিতে পারে না। কেবল সচেতন বেদনা অনুভব করিতে থাকে। তাহারা দেখিতে পায়, যে, আমরা আপনাকে এত বড় মনে করিতেছি তবুও কিছুতেই বড় হইয়া উঠিতেছি না। এই অলস অহঙ্কার দাস্তের নরকযন্ত্রণা বর্ণনায় স্থান পাইবার যোগ্য। বিপুল অভিমানে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছি অথচ এক তিল প্রসর বাড়িতেছে না, সে কোন্ মহাপাতকের ভোগ।

এইরূপ বুদ্ধিমান গুপ্ত অহঙ্কারী সর্ব্বদাই বৃহৎ সঙ্কল্প সৃষ্ট করিতে থাকে। সকল দিকেই হাত বাড়াইতে থাকে অথচ কিছুই নাগাল পায় না। পাশের লোক তাহাকে যে, কোন বিষয়ে অতিক্রম করিয়া যাইবে ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। এই জন্য কাহাকে কোন লক্ষ্যমুখে যাত্রা করিতে দেখিলে সেও এক এক সময়ে তাড়াতাড়ি ছুটিতে আরম্ভ করে, পথের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসে ও মনে মনে কহে যদি শেষ পর্য্যন্ত যাইতাম ত আমিই জিতিতাম। সে চুপি চুপি এইরূপ প্রচার করে আমি যে কোন কিছুতেই বাস্তবিক কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, সে কেবল মাত্র ঘটনাবশতঃ। কারণ যাহারা নিজ নিজ সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সে আপনাকে মনে মনে এত বড় বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে নিজের অক্ষমতা সে কল্পনা করিতে পারে না। ক্ষমতা আছে অথচ ক্রমিক প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ বড় হইতে পারিতেছি না, এই দুঃখে সে সর্ব্বদাই এক প্রকার তীব্রস্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। এমন কি তাহার ঈশ্বরে ভক্তি চলিয়া যায়। তাহার সমস্ত ভক্তি সে নিজের পদতলে আনিয়া গোপনে আপনার পূজা করিতে থাকে—বলিতে থাকে 'আমি মহৎ—সমস্ত জগৎ আমার প্রতিকূল, ঈশ্বর আমার প্রতিবাদী! কিন্তু যে যাহা বলে বলুক, আমি আমাকেই আমার শিরোধার্য্য করিয়া সংসারের পথে সবলে পদক্ষেপ করিব!" এই বলিয়া সে কখন কখন সবলে বন্ধন ছিঁড়িয়া হঠাৎ এক ঝোঁকে ছুটিতে থাকে, সগর্ব্বে চারিদিকে চাহিতে থাকে—বলে "কি আমার দৃঢ়চিত্ততা! স্বকপোলকল্পিত কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্ত জগৎসংসারের প্রতি কি প্রবল উপেক্ষা!" বুঝিতে পারে না যে তাহা সংসারপ্রতিহত সঙ্কীর্ণ আত্মাভিমানের সফেন উচ্ছ্বাস মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাদের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এত আছে যে, বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছেন কবে ইহারা আপন বুদ্ধিকে স্থায়ী কার্য্যে নিযুক্ত করিবে! বন্ধুদিগের উত্তেজনায় এবং আত্মাভিমানের তাড়নায় তাহাদের বুদ্ধি অবিশ্রাম চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে থাকে, মনে করে হাতের কাছে আমার অনুরূপ কার্য্য কিছুই নাই। কোন একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হয় পাছে ক্ষমতায় কুলাইয়া না উঠে এবং আত্মীয়সাধারণের চিরবর্দ্ধিত প্রত্যাশার মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ফলাফলের ভার বিধাতার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক মহৎ কার্য্যের

অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করা এরূপ লোকের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং অবজ্ঞা, উপেক্ষা, প্রবল তর্ক এবং সমালোচনার আগ্নেয় বেগে ইহারা আপনাকে সকলের উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে চায়। অভিমান-শাণিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহারা সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তোলে। অন্য সকলকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারে বিপর্য্যস্ত করিয়া মনে করে, 'গঠন কার্য্যে নিশ্চয়ই আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে নহিলে এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বুঝিতে পারি কি করিয়া।' কিন্তু এত ক্ষমতাসত্ত্বেও তাহারা কেন যে কোন সৃজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহারা এবং তাহাদের প্রতিবেশী-বর্গ উত্তরোত্তর নিরতিশয় আশ্চর্য্য হইতে থাকে!

ইহারা নিতান্ত পার্শ্ববর্ত্তী লোকের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। কারণ পাশের লোক হইতে নিজের ব্যবধান অধিক নহে। পাশের লোক যদি বড় তবে আমিই বা বড় নহি কেন এই কথা মনে আসিয়া আঘাত দেয়। আমার বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অল্প নহে। বিচার করিতে তর্ক করিতে সূক্ষ্ম যুক্তি বাহির করিতে আমার মত কয়-জন আছে? তবে আমিই বা ইহার অপেক্ষা খাট কিসে! এ ব্যক্তি কেবল আপন সামান্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং পাঁচজন মূর্খ লোকে ইহাকে বলপূর্ব্বক বাড়াইয়া তুলিয়াছে—দৈবক্রমে আমার বিপুল শক্তি মহৎ মস্তিষ্কভারে চাপা পড়িয়া আছে বলিয়া আমাকে আমি এবং দুই একটী বন্ধু ছাড়া আর কেহ চিনিল না! আমি বর্ত্তমান থাকিতে আমার পার্শ্বে যে লোকের দৃষ্টি পড়ে ইহা অপেক্ষা মূঢ়-সাধারণের অবিবেচনার প্রমাণ আর কি আছে। এরূপ স্থলে নিকটস্থ লোককে খাট করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা দূরস্থ লোকের অতিশয় প্রশংসা করে, হঠাৎ এত প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে যে তাহার আর আদি অন্ত পাওয়া যায় না।

অধিকাংশ স্থলে ইহাদের কতকগুলি করিয়া নিজের জীব থাকে। তাহাদিগকে ইহারা সমাধা করিয়া তুলিতে চাহে। এই সকল স্বহস্তগঠিত পুত্তল মূর্ত্তিকে যখন তাহারা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পূজা করিতে থাকে, তখন তাহাতে করিয়া তাহাদের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। কারণ এই পুত্তলপ্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহারা আপনাদের আত্মকর্তৃত্ব বিশেষরূপ অনুভব করিতে থাকে।

ইহাদের একপ্রকার শুষ্ক বিনয় আছে তাহার মধ্যে বিনয়ের মাধুর্য্য কিছুই নাই। সে বিনয় এত কঠিন যে অবিনয় তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে। মনে হয় যেন অহঙ্কার তাহার সমস্ত মাংসপেশী কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত করিয়া সবলে স্থির হইয়া আছে। বিনয়বচনের মধ্যে যেন কেমন একটা পরিহাসের স্বর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভিমান যেন গভীর বিদ্রূপভরে বিনয়ের অনুকরণ করিতেছে। অথবা সে যেন সকলকে ডাক দিয়া বলিতেছে, "আমি নিজের মহোচ্চ স্কন্ধের উপর চড়িয়া এতই উন্নত হইয়া উঠিয়াছি যে বিনয় প্রকাশ করিলেও আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি আপনাকে বিস্তর বড় বলিয়া জানি এই জন্য বিস্তর অহঙ্কারভরে বিস্তর বিনয় করিয়া থাকি।"

ইহারা যতই আত্মসংযম অভ্যাস করুক না, থাকিয়া থাকিয়া আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ইহাদের কঠোর কটাক্ষ, নিষ্ঠুর বাক্য, ক্রুর পরিহাস বাহির হইয়া পড়ে। সম্বরণ করিতে পারে না। তীব্র জ্বালাস্রোত মরু-হৃদয়ের ভূগর্ভে অন্তঃসলিলা বহিতে থাকে, সময়ে সময়ে সামান্য কারণে ক্ষীণ আবরণ ভেদ করিয়া রক্তনেত্র, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, বিদীর্ণ ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া বাহিরে উৎসারিত হইয়া উঠে। এক এক সময়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক একটী ক্ষুদ্র তীক্ষ্ন সহাস্য বাক্যে তাহাদের গোপন মর্ম্মগহ্বরের বিস্তীর্ণ অগ্নিকুণ্ড চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! এরূপ আকস্মিক নিষ্ঠুরতার কারণ তৎক্ষণাৎ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, কিন্তু যে কারণ অল্পে অল্পে বহু দিন ধরিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত হইতেছিল। অবরুদ্ধ অহঙ্কার অজ্ঞানে অলক্ষিতভাবে যখন-তখন আঘাত সহিতেছিল, অবশেষে সহিষ্ণুতা উত্তরোত্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক দিন সামান্য আঘাতে দ্বিধা হইয়া যায়, এবং অভিমানের বিষদন্ত সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই আসিয়া বিদ্ধ করে।

এই হৃদয়বিবরবাসী অহঙ্কারের উষ্ণ নিশ্বাস-বাষ্পে প্রশান্ত স্নেহ, নিরভিমান প্রেম ও উদার করুণা আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া উঠে। আত্মবিস্মৃত সরল সহৃদয়তার সুখ আর ভোগ করিতে পারি না, সর্ব্বদাই রুদ্ধ দ্বার, রুদ্ধ হৃদয়, তামসী মুখশ্রী, সঙ্কীর্ণ জীবনের গতি। গৃহকোণ অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক উদারতার অভাব নাই, অথচ যথার্থ হৃদয়ের সহিত কাহাকেও হৃদয়ের কাছাকাছি অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে পারি না। এই বিচিত্র জনপূর্ণ সহস্র সুখদুঃখময় পৃথিবীতে সকলকে দূরে রাখিয়া, স্বজনদিগকে আঘাত দিয়া, আত্মস্তুতির অন্ধকূপের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া আমাদের মর্ত্ত্যজীবন অন্ধকারে নিষ্ফল অতিবাহিত করিয়া দিই, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই জীবন্মৃত্যু হইতে শুভক্ষণে মুক্ত করিয়া দেয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্মী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম। দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মাথার উপর আগুন ঢালিতেছে। পৃথিবী যেন কামারশালা। এ সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল আরও ভয়ানক। কাহার সাধ্য মধ্যাহ্নে সেখানে বাহির হয়? বালুকার এক একটী কণা যেন এক একটী সূচশলা। তার উপর অবিরত লু চলিতেছে। সে বায়ু লাগিলে গা পুড়িয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পড়ে। পশ্চিমের সুখ অনুভব করিতে চাও তো শীতকালে যাইও, এ সময়ে সোণার বাঙ্গালা ছাড়িও না।

এ ছাড়া পশ্চিমে এ সময়ে আরও ভয়ের কারণ আছে। ওলাউঠার বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়; বসন্তে বিস্তর লোক মারা পড়ে। দুই-ই উৎকট রোগ, দুই-ই এ সময়ে এ প্রদেশকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেখানে একবার দেখা দেয়, হঠাৎ সে স্থান

ছাড়িতে চাহে না। ওলাউঠা অপেক্ষা বসন্তের প্রভাব আরও কিছু বেশী। ভগবান্ এ সুখের সৃষ্টি রচনা করিয়া কেন তাহা দুঃখের আলয় করিলেন তাহা একরূপ বুঝিতে পারি; মানুষকে স্বহস্তে গড়িয়া কেন তাহাকে মৃত্যুর অধীন করিলেন তাহাও কতকটা বুঝিতে পারি; কিন্তু দয়াময় হইয়া তিনি এমন যন্ত্রণাময় ব্যাধির কেন সৃষ্টি করিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এ বৎসর অম্বালায় বসন্তের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সকল লোকেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টও ইহা নিবারণের জন্য যতটা উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা করিতেছেন। তবে কারপরদাজদিগের দোষে বা গুণে সকল নিয়মগুলা ঠিক পালন হইয়া উঠিতেছিল না, বা অতিপালন হইতেছিল। অম্বালার যেখানে ছাউনি—ক্যাণ্টনমেণ্ট—তাহা সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ। এইখানে কমিসরিয়াট আপিষ; সুতরাং কমিসরিয়াট-কেরাণীদিগের এইখানেই বাসা। বসন্ত আগেই ছাউনিতে আরম্ভ হইয়াছে। বসন্ত ছোঁয়াচে রোগ; তাই ছাউনির নিয়ম, বসন্ত হইলে রোগী সেখানে থাকিতে পারে না। দূরে মাঠের এক ধারে তাহাদিগের থাকিবার একটা নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে। সে ঘর গভর্ণমেণ্টের, এই অভিপ্রায়েই তাহা নির্ম্মিত। ভিক্ষুক হইতে ধনকুবের পর্য্যন্ত সবারই সে অবস্থায় এই আশ্রয়। এই খানে গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার ও লোক জন আছে, তাহারাই দেখে শুনে। তবে যাহাদের আত্মীয় কেহ সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করে সে থাকিতে পারে; কিন্তু রোগীর ন্যায় সেও সে কয় দিন ছাউনিতে আসিতে পারে না।

বেলা দুই প্রহর। সেই রোগনিবাসে অনেক গুলি রোগী শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। কেহ নীরবে কাঁদিতেছে, কেহ মরণাধিক যাতনায় চীৎকার ছাড়িতেছে, কেহ বা অজ্ঞানে প্রলাপ বকিতেছে। মৃত্যু যেন সবারই পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মধ্যে যে একটু সৌভাগ্যশালী তাহার কোন আত্মীয় মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বীজন করিতেছে, আর রোগী অপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্টে এক একবার মর্ম্মস্থল হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। যাহারা বিদেশী, কর্ম্মোপলক্ষে এখানে প্রবাসী মাত্র, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য আর নাই। এক একবার ঘর বাড়ি, স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা মনে পড়িতেছে, এক একবার পার্শ্বস্থ শূন্য শয্যার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে, কাল যে ঐ বিছানায় শুইয়া তাহারই সহিত একত্রে এমনি ছট্‌ফট্ করিয়াছে আজ সে নাই, সে খালি বিছানা দেখিয়া আপনার অবস্থা স্মরণ হইতেছে, আর অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুর পর অশ্রু নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িতেছে। সে দৃশ্য বড় মর্ম্মস্পর্শী; তাহা লিখিয়া ঠিক্ বুঝান যায় না।

সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটী শয্যায় পড়িয়া এক বাঙ্গালী যুবক। সে একজন কমিসারিয়াটের কেরাণী; ছয় মাস হইল, কলিকাতা হইতে এখানে বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছে। আপনার জন এখানে তাহার কেহই নাই। কয়েকজন বাঙ্গালী মিলিয়া একত্রে এক বাসা করিয়া ছিল। তাহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, অতি ধীর শান্ত

মিষ্টভাষী। কাহারও কোনও কথায় থাকিত না, আমোদ আহ্লাদে বড় একটা মিশিত না, সদাই আপন মনে কি চিন্তা করিত, এবং আপিষের কাজ সারিয়া নির্জ্জনে আপনার সেই চিন্তা লইয়াই থাকিতে ভাল বাসিত। সবাই তাহাকে স্নেহ করিত, এবং তাহার ভিতর ভিতর কি একটা দুঃখ আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া অনেকে তাহার জন্য সহানুভূতি করিত। হঠাৎ একদিন আপিষ হইতে আসিয়া গা ব্যথা করিতেছে বলিয়া সে শুইয়া পড়িল। রাত্রে আর উঠিল না। প্রভাতে সবাই উঠিয়া দেখিল, তাহার বসন্ত হইয়াছে। দেখিয়া সকলে শিহরিল। হুকুম ছিল, বসন্ত হইবামাত্রই থানায় সংবাদ দিবে। কিন্তু যদি অল্পে অল্পে সারিয়া যায় এই ভাবিয়া "চুপ চুপ" করিয়া সে দিন সবাই কথাটা চাপিয়া রাখিল। আপিষ কামাই করিয়া কেহ কেহ তাহার সুশ্রূষা করিতে লাগিল। ঘরে অনেকের অনেক দোষ থাকে, কিন্তু বিদেশে নিরাশ্রয়ের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করাই মহৎ গুণ। বাঙ্গালীর আর কোন গুণ থাক না থাক, এ গুণটী তাহার আছে।

কিন্তু, বিধাতা যাহার উপর নারাজ, মানুষে তাহার কি করিবে? পরদিন সভয়ে সকলে দেখিল, রোগ একদিনেই বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবুও তাহারা থানায় খবর দিতে সম্মত হইল না। কিন্তু যে ডাক্তার প্রথম দিন অনেক অনুনয়ের পর গোপনে দেখিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, সে আজ আর গোপনে দেখিতে চাহে না। ডাক্তার না দেখিলেই বা কি হইবে? কাজেই অনেক চিন্তার পর, থানায় জানাইল। তৎক্ষণাৎ লোক আসিয়া ধীরে ধীরে উঠাইয়া তাহাকে সেই প্রান্তরস্থিত রোগ-নিবাসে লইয়া চলিল। যাইবার পূর্ব্বে একবার সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সুশ্রূষার জন্য বাড়ী হইতে কাহাকেও আসিতে তাহারা টেলিগ্রাফ করিবে কি না। কিন্তু সে তাহার উত্তরে কিছুই বলিল না, একবার ঈষৎ হাসিল, আবার তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষের কোণ দিয়া দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। দেখিয়া সকলে তাহার মনের ভাব বুঝিল। সে বড়ই দুর্ভাগা, এমন সময়েও তাহাকে দেখিবার আপনার জন কেহই নাই, ভাবিয়া সবাই যার পর নাই ব্যথিত হইল।

এ অভাগা আর কেহই নহে, মন্মথ। আমরা দুই বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর পরের কথা! এক দিনে—এক ঘণ্টায়—এক মুহূর্ত্তে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তা দুই বৎসর!—কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তা কে বলিবে? আজ যেন মন্মথের পীড়া, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে মন্মথ সেই মন্মথ কি ছিল? সেই হাসি-হাসি সদাপ্রফুল্ল সুন্দরকান্তি মন্মথ কি হইয়া গিয়াছে! আর তাহার সে হাসি নাই, সে প্রফুল্লতা নাই, সে কান্তি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে মন্মথ বৃদ্ধের ভাব, বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। মুখ বসিয়া গিয়াছে, কপাল কোঁকড়াইয়া আসিয়াছে, দেহে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এ তো সব বাহ্যিক পরিবর্ত্তন; তাহার মনের পরিবর্ত্তন আরও ভয়ানক। সেখানে সুখ নাই,

শান্তি নাই। সদাই হা হুতাশ, সদাই তীব্র বিষের জালা। বুকের ভিতর কি যেন ফুটিয়া রহিয়াছে; তাহা উঠে না, নামে না—বড় ব্যথা, বড় যাতনা—নিশ্বাস ফেলিতেও বাজিয়া উঠে। এ অবস্থায় চাকুরি করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। তবে, সে একা নহে, বুড়া মা বর্ত্ত-মান। আহা! সে মার কত কষ্ট তাহা কে বলিবে? বুড়ী "বৌ বৌ' করিয়া এক রকম পাগল হইয়া গিয়াছে। এখনও ঘাটে ঘাটে পথে পথে লক্ষ্মীর সন্ধান করিয়া বেড়ায়। পথ দিয়া কোন স্ত্রীলোক যাইতে দেখিলে হা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। সে চলিয়া যায়, আর বুড়া আপন মনে কাঁদিতে থাকে। গ্রামে কাহারও বাড়ী যায় না, কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহে না। মন্মথ মার জন্য বড়ই কাতর। সদাই মার কাছে আপনার দুঃখ গোপন করিত। দুই বৎসর ধরিয়া মন্মথও অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু লক্ষ্মীর কোনও সন্ধান মিলিল না। এ দিকে অম্বালায় বদলির হুকুম হইল। একে চাকুরিতে আর প্রবৃত্তি নাই, তায় বিদেশে—যাই কি না যাই, মন্মথ অনেক ভাবিল। এক পয়সা সঙ্গতি নাই, দুদিন বসিয়া খাইলে চলে না। কিন্তু, মন্মথ নিজের জন্য ভাবে না। বুড়া মা—কোথায় যাইবে? পেটের জন্য এ বয়সে কার দোরে ভিক্ষা করিবে—কে কি বলিবে? মা ভিন্ন মন্মথের এ সংসারে আর কেহ নাই—সে মার কষ্ট সন্তান হইয়া কেমন করিয়া দেখিবে? মন্মথ অম্বালায় যাইতে স্বীকৃত হইল। মাকে সব বলিল। মা সঙ্গে যাইতে চাহিল। মন্মথ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার অধিক দূর কখন যায় নাই। বিদেশ-বিজাতীয়ের মুলুক সে তাহার কিছুই জানে না, সে না কি বড় কষ্টের জায়গা, সেখানে মন্মথ মাকে লইয়া যাইবে কেমন করিয়া? মাকে অনেক বুঝাইল। বৃদ্ধা দেবতার নিকট পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাথা কুটিতে লাগিল। তার পর, মার আশীর্ব্বাদ লইয়া মন্মথ বিদেশ যাত্রা করিল।

আজ দুই দিন হইয়া গেল মন্মথ এই রোগনিবাসে আসিয়াছে। দুই দিনে পীড়া ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। মুখ চোখ কোথাও আর স্থান নাই, সর্ব্বাঙ্গ বসন্তে ভরিয়া গিয়াছে, অসীম যাতনায় বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া কত কথা মনে পড়িতেছে। 'সেই মা! না জানি তিনি কষ্টই পাইতে-ছেন। আর মন্মথ যদি সত্য সত্যই না বাঁচে, তাঁহাকে কে দেখিবে? এ শেষ বয়সে কে মুখ চাহিবে? দুটো সান্ত্বনার কথা বলিবার যে কেহই নাই! হয় ত এ সংবাদে আত্মঘাতিনী হইবে—উঃ সে কি ভয়ানক!' মন্মথ আর ভাবিতে পারিল না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। আবার কতক্ষণে সেই বালিকার কথা মনে আসিল। 'লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী কি এ পৃথিবীতে আর নাই? দুই বৎসর এত চেষ্টার পরও কেন সন্ধান মিলিল না! আ মরি মরি, কি রূপ! রূপের অপেক্ষা কি গুণ! প্রাণ থাকিতে তাহা কি ভোলা যায়?' সেই রাত্রির সব কথা গুলি একে একে মনে জাগিয়া উঠিল। দুই বৎসরে মন্মথ তাহার এক বর্ণও বিস্মৃত হয় নাই। তখন রোগের যাতনা বাড়িয়া উঠিল। হতভাগ্য বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

রোদন করিতে করিতে একটু তন্দ্রা আসিল। মন্মথ ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সে ঘুম শীঘ্র ভাঙ্গিল না। তাহা ঘুম নহে, অচৈতন্য। প্রাতঃকালে মন্মথ কাঁদিতেছিল, দুই প্রহরের সময় সকলে দেখিল, সে অঘোর অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ সময়ে নিকটে আপনার জন থাকা বড় দরকার। সদাই মুখের প্রতি চাহিয়া শুশ্রূষার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু হতভাগ্যের কেহই নাই। তখন যে সময় কেহ যে আপিষে গিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিবে তাহাও পারে না। ভয়ানক লু—কার সাধ্য ঘরের বাহির হয়? ব্যথিতহৃদয়ে সবাই তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

সূর্য্য যেন আজ তাহার সকল কিরণ ঢালিয়া দিবে সংকল্প করিয়াছে। বিষম রৌদ্র। লু অবিরাম চলিতেছে, সে বায়ুর সঙ্গে তপ্ত বালুকণা উড়িতেছে, বায়ু যেন আগুন খেলাইতেছে। গাছগুলা শুখাইয়া আপনা আপনি ফাটিতেছে। ঘাট মাঠ সর্ব্বত্র জনহীন। এ সময়ে ঐ তপ্ত বালুর উপর দিয়া কে ঐ রমণী ছুটিয়া আসিতেছে? সন্ন্যাসিনী বেশ; পরিধানে গৈরিক বাস; হাতে ত্রিশূল; কেশপাশ আলুথালু, তাহা ভস্মমাখা। এখনও সব চুলে জটা পড়ে নাই, দুই এক গাছায় ধরিয়াছে মাত্র। দেখিলে বোধ হয় এ অতি অল্প দিন এ বেশ ধারণ করিয়াছে। সূচশলার ন্যায় বালুকণা সকল পায়ে বিদ্ধ হইতেছে, লু লাগিয়া অঙ্গ ঝলসিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই; সন্ন্যাসিনী দ্রুতপদে সেই রোগ-নিবাসের দিকে ছুটিয়াছে। ঘরে প্রহরী বসিয়াছিল, সন্ন্যাসিনী আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাকে কি বলিল। প্রহরী দর্শনমাত্রেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। ভাবিতেছিল, "ভগবতীজি কৈলাস ছোড়্‌কে আয়া হোগা।" প্রহরী সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসিনী তাহা দেখিয়া পুনরায় আপনার কথা বলিল। তখন সে "আইসে মায়ি" বলিয়া পথ দেখাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া চলিল।

সন্ন্যাসিনী গৃহের মধ্যে আসিয়া যেখানে মন্মথ অচেতনে পড়িয়াছিল, তাহার শিওরের কাছে বসিল। ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। প্রহরী বৃথায় অনুমান করে নাই। ঘরের সবাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসিনীর বয়স ষোলর উপর হইবে না। কাঁচা সোণার রঙ্, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপ, তবু যেন সে রঙ্ কাটিয়া পড়িতেছে। রূপ দেহে ধরে না। ভগবতী নহিলে এ বয়সে এতরূপ লইয়া কে সন্ন্যাসিনী সাজিবে? তিনি দয়াময়ী, অনাথের গতি, তাই দয়া করিয়া এই অনাথের ভার আপনিই লইতে আসিয়াছেন। মানুষের সাধ্য কি, এই লু'র ভিতর দিয়া এই বালির উপর দিয়া চলিয়া আসে? সম্ভ্রমে সকলে সরিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসিনী কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে মন্মথের মাথাটী লইয়া আপনার কোলের উপর রাখিল। ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

তিন দিন মন্মথ এইরূপ অঘোর অচেতন হইয়া রহিল। তিন দিন সন্ন্যাসিনী সেই একই স্থানে এক ভাবে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিল। এ তিন দিনে কেহ তাহাকে

একটীও কথা কহিতে শুনে নাই, কেহ তাহাকে একবার চক্ষু বুজাইতে কি নড়িয়া বসিতে দেখে নাই; তিন দিন বিন্দু মাত্র জল পর্য্যন্ত সে গ্রহণ করে নাই। অনেকের তাহাকে কিছু খাওয়াইবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না।

তিন দিন কাটিয়া গেল। ঈশ্বরের কৃপায় হউক, সুশ্রূষার গুণে হউক, এই তিন দিনের অচেতন অবস্থায়ই মন্মথ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। চারি দিনের দিন মন্মথের চেতনা হইল। প্রভাতে সবাই দেখিল, মন্মথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার রোগ প্রায় সারিয়া আসিয়াছে, অধিকাংশ বসন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ে সকলে দেখিল, সে সন্ন্যাসিনী আর নাই। মন্মথকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই বলিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তখন সকলে সেই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

পর দিন মন্মথ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মন্মথ সুস্থ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার মনের সুস্থতা হইল না। সে আরোগ্য লাভ করিয়া বাসায় আসিলে বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বেই এ কথা শুনিয়াছিল। এ সব কথা বড় একটা গোপন থাকে না। সবাই কৌতূহলী হইয়া সে কথা মন্মথকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্মথ কাহারও কথায় কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে কেবল তাহাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। নির্জ্জনে একদিন ভাবিল, 'সবাই তো সে একই কথা বলিতেছে, তবে কি সত্য? সত্যই কি সন্ন্যাসিনী আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছে। তিন দিন অনাহার অনিদ্রা—নড়িয়া বসে নাই, জলবিন্দু গ্রহণ করে নাই—এ কি মানুষে পারে? মানুষের কথাই বা ভাবি কেন, আমি অভাগা, আমার প্রতি এত দয়া কে করিবে? তবে কি সত্য সত্যই এ কোনও দেবীর কাজ? দীনপালিনী ভগবতীর কৃপা?" তাহা ভাবিতে মন্মথ শিহরিয়া উঠিল। আবার ভাবিতে লাগিল, কিন্তু—কিন্তু যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ে কার একখানি মুখ তাহার মুখের উপর সদাই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, সেই স্বপ্নের মত সে চোখে সে যেন দুই এক বিন্দু জলও দেখিয়াছিল। সে কি? সে মুখ ঠিক্ মনে পড়ে না, যেন আব্ছা আব্ছা মত। লোকে যাঁহার কথা বলে, সে কি তাঁহারই মুখ! মন্মথ ভাবিতে লাগিল। অন্ধকার ঘরে কে যেন একটু আলোর রেখা পাতিত করিল। মন্মথের মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়া গেল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল। সে মুখ—সে মুখ যেন লক্ষ্মীর!

লক্ষ্মীর।—নহিলে এত দয়া এত গুণ কার? তবে কি লক্ষ্মী আজও এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে? লক্ষ্মী সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে? তাহার সেই লক্ষ্মীর আজ এই বেশ হইয়াছে?—না না, এ নিতান্ত অসম্ভব। লক্ষ্মী জীবিত নাই, তাহা হইলে দুই বৎসর ধরিয়া এত চেষ্টায়ও কি তার কোনও সন্ধান মিলিত না! আর তাই যদি হয় এরূপ অভাবনীয় ঘটনাই বা হইবে কি প্রকারে?

মন্মথ অম্বালায় মাঠের মধ্যে হাঁসপাতালে রোগে পড়িয়া—সে সংবাদই বা লক্ষ্মী পাইল কোথা হইতে, এবং এতদিনের পর এখানে আসিলই বা কি রকমে? না না, এ নিশ্চয় কোন্ দেবীর ছলনা! মন্মথ বিকারে লক্ষ্মীর কথা ভাবিতে ভাবিতে কি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। 'কিন্তু—কিন্তু'—মন্মথ আবার ভাবিল, "কিন্তু, যে একবার সে মুখ দেখিয়াছে সে কি আর ভুলিতে পারে? সে তো লক্ষ্মী। যথার্থই লক্ষ্মী! আমারই লক্ষ্মী! হায় হায়! কেন তখন তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। স্বপ্নে দেখিলাম তো কেন তাহাকে স্বপ্নেই জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলাম না? কোথায়—কোথায় গেলে তুমি! লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—" মন্মথ চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। নির্জ্জন গৃহে সে শব্দের প্রতিধ্বনি হইল মাত্র। কে তাহার ডাকে উত্তর দিবে? মন্মথ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

সেই দিন মন্মথের মাতার একখানি পত্র আসিয়াছিল। বৃদ্ধা কয়েক দিন পুত্রের সংবাদ না পাইয়া ভাবিত হইয়া পত্র দিয়াছেন। মন্মথ উঠিয়া মাকে একখানি পত্র লিখিল। তাহাতে আপনার অসুখের কোন কথা লিখিল না। কাজের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল, এই জন্যই পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আসল কথা ভাঁড়াইল। আরও লিখিল "আবার আজই কাজের জন্য আবার স্থানান্তরে যাইতে হইবে, দুই এক মাস ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, হঠাৎ ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি ভয় করিও না। আমি যেখানে থাকি সর্ব্বদাই পত্র লিখিব। কিন্তু তুমি আর এখন চিঠি দিও না। কখন কোথায় থাকি তাহার ঠিক্ নাই, তোমার চিঠি না পাইবার কথা। আশীর্ব্বাদ করিও যেন যে কাজে যাইতেছি তাহা সিদ্ধ হয়।" পত্র ডাকে চলিয়া গেল। মন্মথ আজ মার কাছে এই প্রথম মিথ্যা কথা কহিল। সে পত্রে যাহা লিখিল তাহা ঠিক্ নহে।

পত্রের সবটা ঠিক্ না হইলেও কতকটা ঠিক হইল বটে। মন্মথ সে স্থানে আর রহিল না। সেই দিন শেষ রাত্রে যখন সবাই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, একাকী মন্মথ শয্যা হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে বাটীর বাহির হইল। রেলপথে গেল না, হাঁটা পথে চলিল। তাও কোথায় যাইবে তাহার নিরূপণ নাই, দুই পা যে দিকে লইয়া চলিল সেই দিকেই যাইতে লাগিল। একটু গিয়াই বসিয়া পড়িল। আবার উঠিল, ধীরে ধীরে আবার চলিল। এইরূপ বসিতে বসিতে যাইতে লাগিল। তখনও তাহার শরীর বড় দুর্ব্বল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ"—একি সেই কুরুক্ষেত্র? কৃষ্ণার্জ্জুনের লীলাভূমি, ভীমের ক্রীড়াস্থল, ভীষ্মদ্রোণ-কৃপকর্ণের রণপ্রাঙ্গণ, একি সেই কুরুক্ষেত্র? কুরুপাণ্ডবের চির-কলহের শান্তি হইয়াছিল সে কি এইখানে? এই কি অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশভূমি? মহাভারতের সে কুরুক্ষেত্র কি এই কুরুক্ষেত্র? কে বলিবে? কে চিনাইয়া দিবে? পাণ্ডারা দ্বৈপায়ন হ্রদ দেখায়, ভীষ্মের শরশয্যাস্থল দেখায়, দ্রোণাচার্য্য যেখানে তাঁহার বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, অমানুষকীর্ত্তি ভীমসেন যেখানে দুঃশাসনের হৃৎপিণ্ড

বিদারিত করিয়া তাহার রক্তে আপনার অনন্ত প্রতিহিংসার সন্তর্পণ করিয়াছিলেন, বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলিয়া যেখানে ঘিরিয়া বীরনামে চিরকলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, অর্জ্জুনের সম্মুখে যে স্থলে কর্ণের রথচক্রে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল,—আরও কত বিষয়, একে একে বলিতে বলিতে পাণ্ডারা সেই সব স্থানের ভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন সকল দেখাইতে থাকে। কিন্তু তাহা শুনি ও দেখি মাত্র, স্পষ্ট চিনিতে তো পারি না। আমি কোন্ মূঢ়, আজ যদি ভীষ্মদেবের প্রেতাত্মা গভীর সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া এই স্থানে একবার বিচরণ করেন, তাঁহারাও ইহাকে তাঁহাদের সেই কুরুক্ষেত্র বলিয়া চিনিতে পারিবেন কি না জানি না। কালের হস্তে যত হউক না হউক, বিজাতীয়ের হস্তে আমাদের সকল তীর্থস্থানেরই প্রায় এই দশা ঘটিয়াছে!

এখনও যাহা আছে তাহা দেখিলে বাস্তবিক রোমাঞ্চ হয়, হৃদয়ে সত্রাস ভক্তির উদয় হয়। কেবল মাঠ—ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাঠ; আর সেই মাঠে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল পলাশ গাছ। ডালে ডালে পাতায় পাতায় সমাকীর্ণ হইয়া ছাইয়া রহিয়াছে। আর যখন সেই সব গাছে ফুল ফুটে, কি অপূর্ব্ব শোভা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ পুষ্পে সে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আলো হইয়া যায়। দূরস্থ পথিক সেই অনন্ত রক্তক্ষেত্র দেখিয়া শীহরিয়া উঠে, আজও কি সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর শোণিত-সাগর শুকায় নাই—তাহা ভাবিয়া ভয় পায়। কুরুক্ষেত্রে বিস্তর যাত্রী আসে। গয়াধামের ন্যায় হিন্দুরা এখানেও তাহাদিগের ঊর্দ্ধপুরুষের পিণ্ডদান করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহা মহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত।

এই কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরস্থ এক পলাশ-মূলে বসিয়া এক সন্ন্যাসী ও এক সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসীর বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে, গাত্রলোম পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে তার উপর ভস্মলেপ, কুঞ্চিত কপালে রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্রস্তবক, গলায় রুদ্রাক্ষ, পরণে গেরুয়া বাস। সে বয়সেও এ বেশে কান্তি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখিলে ভক্তি হয়, আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা যায়। তা, সন্ন্যাসীর বয়স এ আশ্রমের উপযোগী বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী এ আশ্রমের নিতান্তই অনুপযোগিনী। তাহার বয়স আজও ষোলর সীমা অতিক্রম করে নাই। অপূর্ব্ব শ্রী। সে সন্ন্যাসিনী আর কেহই নহে, তাহারই সুশ্রূষায় মন্মথ সে প্রাণান্তকর ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, সূর্য্য পশ্চিমের পলাশ-শ্রেণীর অন্তরালে ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ উভয়ে সেইখানে বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আমরা তাহার মাঝখান হইতে দুই একটা কথা শুনাইতেছি।

সন্ন্যাসী বলিলেন 'মা, তখনও বলিয়াছিলাম এখনও বলি, এ বড় কঠোর ব্রত, তুমি বালিকা, তোমার ইহা কাজ নয়।"

সন্ন্যাসিনী। আজও কি পিতা, আমার উপর সন্দেহ আপনার গেল না!

"সন্দেহ করি না, এ বয়সে তোমার অসাধারণ ধৃতি দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু—"

'তবে আবার কিন্তু কেন?"

"কিন্তু, মনে কর, আমি আর কত দিন? জীবন তো ফুরাইয়া আসিল। বড় পাপী বলিয়াই বিশ্বেশ্বর আজও চরণে স্থান দিতেছেন না, নহিলে আর বয়সের বাকি কি? কিন্তু বড় বেশি আর দেরি নাই। তারপর আমি ম'লে তোমার উপায় কি হবে? তোমার এই বয়স, আর এই কুটিল সংসার, একেলা এ ব্রত, কেমন করিয়া বজায় রাখিবে, মা?

সন্ন্যাসিনী শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সত্যই ত! এ সকল কথা সে এতদিন ভাবে নাই। আজ হঠাৎ শুনিবামাত্র আকুল হইয়া পড়িল। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তাই ত! কি বলিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। নির্ব্বাকে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

সন্ন্যাসীর চক্ষে এক বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল। বলিল "কথা শুন, এ আশ্রম পরিত্যাগ কর।"

"ইহা ত্যাগ করিয়া কি করিব?"

"আবার গৃহী হও।"

"সে আশ্রম যে আমার বন্ধ।"

"তা তো সব জানি. জগন্নাথের পথে যে দিন তোমার সহিত প্রথম দেখা সেই দিনই তো সব শুনিয়াছি; মনে করিয়াছিলাম, ভগবান্ তোমার একটা ব্যবস্থা করিলেন, নিশ্চিন্ত হইলাম, তুমি সুখে আছ ইহা ভাবিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সচ্ছন্দে মরিতে পারিব। বিধাতা সবই করিয়াছিলেন, আমার মন্দভাগ্য দোষে শেষ বিপরীত হইয়া উঠিল।"

এইখানে বলা উচিত, এ সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসী অপর কেহই নহে সেই লক্ষ্মী ও তাহার পালক পিতা। লক্ষ্মী সেই রাত্রে যখন মন্মথ ঘুমাইয়া পড়িল, তখন বিছানায় উঠিয়া বসিল। চাঁদের আলোয় একবার তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিল, অতি সাবধানে পা দুটী ধরিয়া কতই কাঁদিল, তার পর নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাটীর বাহির হইয়া একাকিনী নির্জ্জন পথ বাহিয়া চলিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পড়িল। তখনও প্রভাত হয় নাই। দেখিল, অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্র দল বাঁধিয়া চলিয়াছে, তাহারা শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিল। বালিকার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, একেলা কোথায় যাইবে তাহাই ভয়ে ভয়ে ভাবিতেছিল। সে তাহাদের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে চলিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার বড় অসুখ হইল। সঙ্গীরা ফেলিয়া পলাইল। মাঠের মাঝখানে বালিকা একেলা পড়িয়া রহিল। কাছ দিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছিল, কেহ ফিরিয়া চাহিল না। অনেক কষ্টের পর একটু ঘুম আসিল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল যে, এক মহাপুরুষ কোলে লইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই দিনেই অসুখ সারিয়া গেল। অসুখ সামান্যই হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে যত লোক অসুখে মরে তার অপেক্ষা ভয়ে চতুর্গুণ লোক মরিয়া থাকে। লক্ষ্মী চিনিল, সে মহাপুরুষ তাহারই পিতা। তখন পিতায় কন্যায় সব কথা হইল। পিতা কলিকাতার কোলাহল হইতে বাহির হইয়াই সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। রথযাত্রার তখন অল্প দিন বাকি ছিল; আগে শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া তাহা দর্শন করিয়া পরে কাশী যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কন্যার কথা শুনিয়া মনটায় বড়ই ক্ষোভ হইল। পরদিন লক্ষ্মী সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিল। পিতায় কন্যায় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিল। যে দিন তাহারা কুরুক্ষেত্র তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দুই দিন পরে এক দল বাঙ্গালী যাত্রী অম্বালা হইতে সেই খানে আসে। তাহাদের মুখে কথায় কথায় লক্ষ্মী শুনিল, মন্মথ নামে একজন বাঙ্গালী কলিকাতা হইতে অল্প দিন বদ্‌লি হইয়া অম্বালায় আসিয়াছে, তাহার বড় বসন্ত হইয়াছে, বোধ হয় রক্ষা পাইবে না, আহা! তাহার নাকি কেহই নাই! লক্ষ্মী শুনিয়া শিহরিল। এ কি তাহারি মন্মথ! পিতাকে আসিয়া বলিল। পিতাও চিন্তিত হইলেন। অম্বালা কুরুক্ষেত্রের খুব কাছে। যাত্রীরা রাত্রেই ফিরিল। সন্ন্যাসিনী পিতার অনুমতি লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনে চলিল। আজ চারি দিন হইল অম্বালা হইতে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধের পর সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—"আর একবার সংসারের কাজে রত হইতে হইল দেখিতেছি। চল, মা, তোমায় লইয়া অম্বালায় যাই। মন্মথকে আর একবার সব বুঝাইয়া বলিয়া আসি।"

"তিনি তো এ পর্য্যন্ত কিছুই ভুল বুঝেন নাই।"

"তা নহিলে, আজ তোমার এ দশা কেন, মা?

"এ দশা তিনি করেন নাই, আমিই নিজে করিয়াছি। বলিয়াছি তো, তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নাই, আমিই তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

"চল, আবার তাঁহার হাতে তোমাকে দিয়া আসি। মন্মথ তোমায় গ্রহণ করুন, দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"না পিতা! তিনি ত আমাকে আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার কপাল মন্দ, তা তাঁর দোষ কি? আমি তাঁহার অযোগ্য স্ত্রী!"

"তবে কি করিবি, মা? তোর চিন্তা মনে হলে ঈশ্বর-চিন্তাও যে আর আমার ভাল লাগে না।"

সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ হইলেন, দুই বিন্দু অশ্রু কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাহা দেখিল। আপনার উচ্ছসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল—"চল, সেই বাঙ্গালী যাত্রীটীকে দেখিয়া আসি। আহা কি কষ্ট! বৃদ্ধ শরীর, তায় বিদেশ, তার উপর এই দুর্দ্দান্ত রোগ।"

তাহা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসীর যেন চমক ভাঙ্গিল। কি মনে হইল। বলিলেন—"চল।"

উভয়ে ধীরে ধীরে সে গাছতলা হইতে উঠিল। তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল! এখনও রৌদ্র উঠে নাই। প্রভাত বায়ু রহিয়া রহিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। ঘনপত্রবিন্যস্ত এক পলাশমূলে বসিয়া লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া এক বৃদ্ধ। দূরে বসিয়া লক্ষ্মীর পিতা ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছেন।

এই বৃদ্ধের কথাই পূর্ব্ব দিন লক্ষ্মী পিতাকে বলিয়াছিল। ইহার বিসূচিকা হইয়াছে। পাণ্ডারা আপনাদিগের ঘরে স্থান দিতে আর রাজি নহে। সঙ্গীরা বিস্তর জেদ করিয়াছিল, কিছুতেই স্বীকার পায় না। সঙ্গীরাও ছাড়িবে না; শেষ পাণ্ডারা ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া

রাখিল। সেখানে তাহাদেরই রাজত্ব, কে তাহাদের সঙ্গে হাঙ্গামা করিবে? বিশেষ সঙ্গীরা দেখিল, অবস্থা বড়ই খারাপ, তাহারা আর বড় উচ্চবাচ্য করিল না। তাহাদের মধ্যে তাহার আপনার জন কেহই ছিল না। সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মী ও তাহার পিতা গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ একাকী বাহিরে পড়িয়া, কাছে কেহই নাই। তখন উভয়ে ধরাধরি করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে লইয়া আসিল। সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে ইহা দেখিল। কিন্তু কেহ টুঁ শব্দটী করিল না। কেবল সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া পরস্পরে একবার মুখচাওয়া-চাওয়ি করিয়া তাহার রূপের কথা আন্দোলন করিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি বেজায় ভেদ বমি হইল। বালিকা তাহা দুই হাতে কাটিতে লাগিল। মনে কিছুমাত্র বিকার নাই। সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই। সন্ন্যাসীও অনিদ্র থাকিয়া অনেক শুশ্রূষা করিতে লাগিল। রাত্রি এক রকমে কাটিয়া গেল। ভোর বেলা রোগীর একটু তন্দ্রা আসিল। প্রভাত-সমীর ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল, তাহার স্পর্শে শরীর যেন অনেক সুস্থ হইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই আবার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আর একবার ভেদ হইল। বালিকা তাহা পরিষ্কার করিয়া আবার মাথাটী কোলে লইয়া বসিল। বৃদ্ধের তখন জ্ঞান হইয়াছিল, একবার মুখপানে চাহিয়া বলিল "তুমি কে, মা?"

"আপনার কন্যা।"

"আমার কন্যা!"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজাইল। সে চক্ষে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিল। লক্ষ্মী আর কিছু বলিল না। ধীরে ধীরে পলাশ-পত্র লইয়া বীজন করিতে লাগিল।

দূর হইতে সন্ন্যাসী ইহা দেখিল। বৃদ্ধের চক্ষে জলবিন্দু পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করিল। আজ কয়দিন ধরিয়া সে লোকটাকে চেন চেন করিতেছে অথচ চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী সব দেখিল। মনের ভিতরে অনেক কথা তোলাপাড়া হইতে লাগিল।

তিন দিন সেই গাছতলায় কাটিয়া গেল। তিন দিনের পর বৃদ্ধ আরোগ্য হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী পথ্য রাঁধিয়া দিল। বৃদ্ধ আহার করিল। তখন বালিকা তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিতে গেল।

বালিকা চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী বৃদ্ধের কাছে আসিয়া বসিল। বুড়া জিজ্ঞাসিল "আপনি কে বাবা? এ মেয়েটী আপনার কে?"

স। আমি সন্ন্যাসী, এটী আমার কন্যা।

বৃ। সার্থক পিতা আপনি, অনেক পুণ্য-ফলে সাক্ষাৎ ভগবতী আপনার ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।

স। কন্যাটী আমার ঔরসজাতা নহে, পালিতা।

বৃ। পালিতা!

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক হইল। বলিল—"কতদিন ইহাকে পালন করিতেছেন?"

স। দুই বৎসরের সময় ইহাকে পাইয়াছিলাম।

বৃ। দুই বৎসরের সময়!

আবার বৃদ্ধ মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। বলিল "কে ইহাকে আপনার হাতে দিয়াছিল?"

স। ভগবান্ দিয়াছিলেন। কাশীতে ইহাকে আমি পাইয়াছিলাম।

বৃ। কাশী! কি বলিলেন,—কাশীতে?

স। আজ্ঞে হাঁ। তা, আপনি অমন করিতেছেন কেন?

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস মর্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। সন্ন্যাসীর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। মনে মনে বলিল—"আহা, ভগবন্ তাই হউক।" প্রকাশ্যে বলিল—"আপনি কখন কি কাশী গিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ সে প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ক্ষণেক কিছু উত্তর দিতে পারিল না। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিল। তার পর দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"কাঁদিতেছেন কেন?'

এইবার বৃদ্ধ উত্তর করিল। বলিল—"কাঁদিতেছি কেন! তাহা কি বলিব? আজ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কাঁদিতেছি, তবু তো এ কান্না ফুরাইল না। যখনি সে কথা মনে হয়, তখনি বুক যেন ফাটিয়া যায়। তুমি সন্ন্যাসী, তোমায় তাহা বলিয়া কি বুঝাইব? বিশ্বেশ্বর দয়াময়, যে বলে, সে তাহা বলুক, কিন্তু তাঁহার মত নির্দ্দয় আমি আর কোন দেবতাকে জানি না। কাশীর নাম আর—"

বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"অমন কথা মুখে আনিতে নাই। আমরা পাপী তাই তাঁহার দয়া সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

বৃদ্ধ রাগিয়া উঠিল। সে অচির-রোগমুক্ত ভগ্ন দেহ কোপে কাঁপিতে লাগিল। বলিল "মাঝ-গঙ্গায় স্ত্রীপুত্র লইয়া অসহায় অবস্থায় নৌকা ডুবিয়া মরাও কি তাঁহার দয়ার কাজ!"

সন্ন্যাসী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে হর্ষের উদয় হইল। তাহা চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"তিনি দয়াময়, আমাদের পাপের দণ্ড করিয়াও তিনি তাঁহার দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজও যে এ পৃথিবীতে পুণ্যের কিছু মাত্র আদর আছে সে কেবল পাপের দণ্ডের ভয়ে।"

বৃদ্ধ আরও রাগিল। বলিল—"কিন্তু দুই বৎসরের শিশু কি পাপ করিয়াছিল, যে তাহারও সেই দণ্ড ব্যবস্থা হইল।"

স। শিশুর নিষ্পাপ শরীর, তিনি তাহাকে অমন দণ্ড দেন না।

বৃ। দেন না! তবে আর বলিতেছি কি?

স। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ইহাতেও তাঁহার অসীম দয়ার প্রকাশ। শিশু পাছে পাপীর সংস্পর্শে থাকিয়া বিগ্ড়াইয়া যায়, এই জন্য কৌশলে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন মাত্র; শিশু মরে নাই।"

বৃদ্ধ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল। যেন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। চাহিয়া চাহিয়া বলিল —"আপনি কিসে জানিলেন, শিশু মরে নাই!"

স। তাহার প্রমাণ, এই কন্যা।

"এই কন্যা!—এ কি আমার সেই হারাধন।" বৃদ্ধ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। চক্ষে জলধারা ছুটিল। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া স্বর্গারূঢ়া ব্রাহ্মণীর জন্য বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে ডাকিল—"ব্রাহ্মণি

ব্রাহ্মণি! কোথায় তুমি, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার হারান রতন পাওয়া গিয়াছে!" ব্রাহ্মণের আর কথা ফুটিল না। বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

সুখ দুঃখের যুগপৎ প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে সন্ন্যাসী তখন ধীরে ধীরে পূর্ব্বকাহিনী সমস্ত বলিতে লাগিলেন।

স্থির হইয়া বসিয়া ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা শুনিল। সন্ন্যাসীর কথা সমাপ্ত হইলে, তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তখন ভয়ানক। চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার অগ্রভাগে দুই বিন্দু অশ্রু ঝুলিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসে নাসিকা অবিরত স্ফীত হইতেছে, অধরপ্রান্ত দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছে; নীরব, নিঃস্পন্দ, নিশ্চল। জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায়, বিদারণোন্মুখ আগ্নেয় ভূধরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে স্তব্ধতা অতি ভীষণ। দেখিয়া সন্ন্যাসী শীহরিল। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ আপনার কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"আমি বড় পাপী—বড় পাপী! বিশ্বেশ্বর আজও আমার পাপের উচিত দণ্ড দেন নাই। হায় হায়, আমার জননীকে আমি নিজেই এত কষ্ট দিয়াছি! বিশ্বেশ্বর! ভালই করিয়াছিলে, ইহাকে এ পাপীর সংস্পর্শ হইতে পৃথক্ করিয়াছিলে; শেষ আবার তাহার পাপনিশ্বাসের নিকট ইহাকে কেন আনিলে ঠাকুর! মা আমার যথার্থই লক্ষ্মী। এমন মেয়েও কি হয়! ছি ছি! আমিই তাহার যত দুঃখের মূল! তুষানলেও যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। আর, ব্রাহ্মণ বিলাপ করিতে করিতে কখন কপাল কখন বক্ষঃস্থল দুই হাত দিয়া চাপড়াইতে লাগিল।

এ ব্রাহ্মণ আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সেই ন্যায়সিদ্ধান্ত। ন্যায়সিদ্ধান্তই লক্ষ্মীর প্রকৃত পিতা।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিবিড় পলাশশ্রেণীর মধ্যে একখানি জীর্ণ কুটীর। সেই কুটীরের ভিতর পত্রশয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী। আর পাশে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধে বসিয়া সন্ন্যাসী ও ন্যায়সিদ্ধান্ত। লক্ষ্মীর বিসূচিকা হইয়াছে। একদিনেই সে স্বর্ণলতা শুকাইয়া গিয়াছে। সে ফুল্ল কমল বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তবুও সে আনন্দময়ীর মুখে হাসিখানি যেন এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী কাঁদিতেছেন, ন্যায়সিদ্ধান্ত কাঁদিতেছেন, বালিকা সে অবস্থায়ও সেই স্বভাবমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে তাহাদিগকে বুঝাইতেছেন। সন্ন্যাসী নীরবে রোদন করিতেছেন; আর ন্যায়সিদ্ধান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় কখন হায় হায় করিতেছে, কখন দেবতার নিকট মাথা কুটিতেছে, কখন কপালে করাঘাত করিতেছে। ন্যায়সিদ্ধান্তের সঙ্গীরা সকলই শুনিয়াছে, তাহারাও দেখিতে আসিয়াছে। লক্ষ্মীর আগাগোড়া অপূর্ব্ব কাহিনী স্মরণ করিয়া তাহারাও কাঁদিতেছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যতই যাইতেছে, লক্ষ্মীর অবস্থা ততই খারাপ হইতেছে। চোখ বসিয়া গিয়াছে, মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সোণার অঙ্গে নীল মাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু সে ঠোঁটের হাসি মিলায় নাই। অপরাহ্নে লক্ষ্মী সন্ন্যাসীকে ডাকিল

"পিতা!" সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া বলিলেন "কেন, মা?"

ল। পায়ের ধুলা দাও, আর আমার বেশি দেরি নেই।

সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী বলিল, "কাঁদিও না, বাবা কোথায়?

সি। এই যে মা, আমি তোমার কাছে।

সিদ্ধান্ত বালিকার মুখের কাছে মুখ আনিল। লক্ষ্মী কি বলিতে গেল, পারিল না। এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া সিদ্ধান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'ভয় কি মা, এখনি সারিয়া উঠিবে!"

ল। বাবা, এত দিনের পর তোমার দেখা পাইলাম; কিন্তু বড় আক্ষেপ রহিল, ভাল করিয়া একদিনও তোমার সেবা করিতে পারিলাম না।

সি। আমারই সেবা করিয়াই তো মা তোমার আজ এই দশা হইল। হায়, হায়, পাণ্ডারা যখন আমায় ফেলিয়া দিয়াছিল তখনই কেন আমি মরিলাম না? কেন মা, কুড়াইয়া আনিয়া এ হতভাগাকে বাঁচাইলে। আমায় বাঁচাইতেই যে আজ তোমার আপনার প্রাণ গেল। নহিলে তোমার এ রোগ কেন হইবে? আমা হ'তে যতদূর কষ্ট হবার তা ত সব হইয়াছে, শেষ প্রাণেও মারিলাম!

সিদ্ধান্ত উন্মত্তের ন্যায় আপনার বুক চাপড়াইতে লাগিল। তাহার মনের ভাব তখন অতি ভয়ানক। মর্ম্মে মর্ম্মে পরতে পরতে শত-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা জ্বলিতেছে, মাথার উপর কে যেন তীব্র অঙ্কুশ আঘাত করিতেছে,—বড় জ্বালা,—বড় জ্বালা! সেই মৃত্যুমুখপতিতা বালিকার প্রতি যতই দেখিতেছে, ততই যেন সে জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। একে একে সব কথা মনে পড়িতেছে। সেই রামহরির আটচালায় সেই ভীষণ দলাদলির কথা। সে চক্রান্তের সেই যে একমাত্র মূল! তাহারা তো কেহ কিছু বলে নাই, বরং তাহার কথায় আরো অনেক বাধা দিয়াছিল। চন্দ্রনাথ কটু বলিতেও বাকি রাখে নাই। হায় হায়! দলাদলির কি মোহ, কি নেশা, কি সর্ব্বনেশে উত্তেজনা, কাহারও কথা যে তখন মনে লাগে নাই। তাহারই জন্যইতো আর আর সকলে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে তো বেশি দিনের কথা নয়। সিদ্ধান্ত সে দৃশ্য এখনও যেন চোখের উপর দেখিতেছে। সিদ্ধান্ত কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—'হায় হায় কি করিয়াছি, দলাদলির মোহে অন্ধ হইয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি। হিংস্র পশুরাও আপনার শাবকদিগকে যত্নে রক্ষা করে, আমি নরাধম, পিতা হইয়া কন্যাহত্যা করিয়াছি! ভগবন, এ তোমারই খেলা, তোমারই দণ্ড!" সিদ্ধান্ত হায় হায় করিতে করিতে আবার আপনার বুক চাপড়াইতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল—"বাবা, কেন দুঃখ কর। সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টের কাজ। আমার অদৃষ্টে সুখ নাই তুমি কি করিবে?"

"আ মরি মরি—এমন মেয়েও কি আর জন্মায়!" সিদ্ধান্ত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। একজন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া সরাইয়া বসাইল।

তখন সূর্য্য ডুবিয়া আসিতেছিল, কিরণ-

গুলা ছুটাছুটি করিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। দিগ্‌ভ্রান্ত একটা কিরণ লক্ষ্মীর মুখের উপর পড়িয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। যেন এ লক্ষ্মী তাহার সে লক্ষ্মী নয় মনে করিয়া কিরণ ত্রস্তে সে গৃহের বাহির হইবার পথ খুঁজিতেছিল। সহসা দরজায় কিসের শব্দ হইল। গৃহস্থিত সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, মন্মথ। শীর্ণকায় শুষ্কমুখ হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল, মন্মথ।

মন্মথকে দেখিবামাত্র সিদ্ধান্ত উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"আর কি দেখিতে আসিয়াছ, মন্মথ! মা আমার ছাড়িয়া যায়।"

মন্মথ! কথাটা লক্ষ্মীর কানে বাজিল। তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছিল; তবু সে সময়েও জোর করিয়া লক্ষ্মী একবার চোখ খুলিয়া চাহিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ হতবুদ্ধি মন্মথ মূর্ত্তি। স্থির হইয়া বালিকা সে মূর্ত্তি দেখিল। একবিন্দু অশ্রু চোখের কোণে গড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আবার অধর-প্রান্তে হাসির বিদ্যুৎলতা দেখা দিল। ধীরে ধীরে ধীরে সে হাসি মিলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

উন্মাদের ন্যায় বিকৃত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল —"লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—লক্ষ্মি।"

আর কোনও লক্ষ্মী সে ডাকের উত্তর দিল না।

সমাপ্ত।

ছোট ছোট কবিতা।

অনন্ত রোদন।

চির দিন—চির সেই হাহাকার ধ্বনি,
গভীর নিশীথে জাগে করুণ ক্রন্দন,
জীবনে জীবিত সদা জীবের রোদন,
শতঘাযে প্রতিদিন মূর্চ্ছিত ধরণী,
কেন রে কিসের তরে আকাশ, অবনী
বহে এই চিরন্তন দুখের কল্লোল?
মরুময় শুষ্ক কণ্ঠে আধ উতরোল,
আশা-হীন, ভাষা-হীন অশ্রুর কাহিনী!

দেখিয়া এ জীবনের অনন্ত রোদন,
ব্যথিত কাতর ক্লিষ্ট পীড়িত সবারে
সাধ যায় কেড়ে আনি—বিপুল জীবন
দাঁড়াই হিমাদ্রি সম দুঃখের সংসারে!
কেড়ে নেই মানবের অসীম বেদন,
একা বুঝি, একা যুঝি দুরন্ত পাথারে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

রূপের সাগরে।

বল অপার অনিত্য রূপের সাগরে,
প্রাণ, কেন তুমি ডুবিতে চাও?
কেন বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
আপনা আপনি হারায়ে যাও!
এ যে অনন্ত দুর্লভ জীবন তোমার,
হৃদয় তোমার সাধের ভাণ্ডার,
তবে কি সুখের তরে—কোন্ প্রয়োজনে
সাধের সর্ব্বস্ব বিষাদে ছাও!

কেন বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
আপনা আপনি হারায়ে যাও!

হেথা ল'য়ে অশ্রুজল হৃদয়ের সাথী,
করুণার গান গেয়ে দিবারাতি,
পাবে না সুফল—হবে না যে কিছু,
কেন বিফলে জীবন কাটায়ে দাও।
বল অসার অনিত্য রূপের সাগরে
প্রাণ, কেন তুমি ডুবিতে চাও।

হেথা কে বুঝে কাহার প্রাণের মমতা,
কে করে কাহার দুখের শমতা,
কে যে কাঁদে ব'সে কার তরে হেথা
কে জানে,কে বুঝে,মিছে কেন তবে
ভেবে এ ঘোর ভাবনা যাতনা পাও!
কেন বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
আপনা আপনি হারায়ে যাও!

এ যে স্বপনের খেলা, স্বপনের হাসি,
কানে বাজে শুধু স্বপনের বাঁশী,
কেন উদাস পরাণ শুনিতে ও গান
আকুল হইয়ে কেবল ধাও।
বল অসার অনিত্য রূপের সাগরে
প্রাণ, কেন তুমি ডুবিতে চাও।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

আধ-খানা।

কি এক স্বপন-ঘোর মরম-মাঝারে গো,
অজানা বিরহ-তাপে আকুল নিশ্বাস!
প্রফুল্ল যৌবন-বনে সুখদ বসন্ত-দিনে
কার স্মৃতি ব'হে আনে কুসুম-সুবাস!
তটিনী তটের কূলে ব'হে যায় দুলে দুলে
ঘুমন্ত পরাণ চাহে মেলিতে নয়ান!
কোন্ দেশে কোথাকার মনে পড়ে বার বার
চেন চেন, আধ মৃদু, সোহাগের গান!
জোছনার রাশি রাশি উছলি এসেছে হাসি,
পিছায়ে র'য়েছে কোথা তার প্রেম-মুখ!
এই দেখি এই দেখি, আঁখিতে না মিলে আঁখি
আকুল উচ্ছ্বাস ভরে কেঁপে ওঠে বুক!

সুনীল দিগন্ত হ'তে আরেক দিগন্তে পাখী
উড়ে যায়—গেয়ে যায় গান;
বুঝিতে পারি না, হায়, কি সম্বাদ দিয়ে যায়,
উদাস হইয়া যায় প্রাণ।
মরমরি লতা পাতা, মৃদু মৃদু কার কথা
কহে যেন বাতাসেতে দুলে;
কে যেন আমারে চায় তারে ভুলে গিয়ে হায়
ঢেউ গণি সমুদ্রের কূলে।
আকাশের পানে চাই, তারা-গুলি আছে চাই,
জেগে কারে দিতেছে পাহারা।
প্রকৃতি চলেছে গাই, পাছে পাছে যেতে চাই
আগে সিন্ধু—না পাই কিনারা।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সুশ্রুত-সংহিতা।*

এই পুস্তকখানি প্রচারিত হইয়াছে দেখিয়া, যারপর নাই আনন্দিত হইলাম এবং সুশ্রুত-সংহিতার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। তদনুসারে আমরা এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। সেই অনুসন্ধানের ফল নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

* শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ও শ্রীচন্দ্রকুমার কবিভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(ক) কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক প্রাতঃস্মরণীয় মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় ১৭৫৭ শকে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) দেবনাগর অক্ষরে অতি সুন্দররূপে সুশ্রুত-সংহিতার মূল মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত পুস্তক খানি যেরূপ বিশুদ্ধ; তদনুরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। ক্কচিৎ দুই একটী বর্ণাশুদ্ধি ভিন্ন তাহার অন্য কোনই দোষ পরিদৃষ্ট হয় না।

(খ) ইহার উনচল্লিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৬ শকে (১২৮০ সালে) শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র বসাক বড় বড় অক্ষরে নিকৃষ্ট কাগজে অশুদ্ধি-পরিপূর্ণ এক খানি সুশ্রুত প্রকটিত করেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ, মধুসূদন গুপ্তের প্রচারিত গ্রন্থ অপেক্ষা উত্তম হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত জঘন্যই হইয়াছে। ইহাতে যথাস্থানে ছেদ নাই, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্নেরও শৃঙ্খলা নাই।

(গ) অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণাধ্যাপক পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাসাগর) বি, এ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে (১২৮০ সালে) ভাল কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে উহার তৃতীয় বার মুদ্রাঙ্কণ করেন। ইহা ভুবনচন্দ্র বসাকের পুস্তক অপেক্ষা অশুদ্ধি প্রভৃতি নানা-অংশে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। কেন না, ইহাতে মূলের অনেক স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। শীর্ষক (হেডিং), ছেদ (প্যারাগ্রাফ), দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্নগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থল-বিশেষে যে দৈবাৎ চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাও আবার নিতান্ত অযথা স্থলেই বিরাজ করিতেছে।

(ঘ) ১৭৯৫ শকে (১২৮০ সালে) অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সুশ্রুত সংহিতার বাঙ্গালায় প্রথম বার অনুবাদ মাত্র প্রকটিত হয়। স্থলে স্থলে উহার অনুবাদ প্রকৃত হয় নাই। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য পারিভাষিক, সাংকেতিক ও সংক্ষিপ্ত পদগুলির ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ঐ সালের মুদ্রিত পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধিও ছিল। সম্প্রতি উহার যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে অধিক অশুদ্ধি নাই বটে, কিন্তু মধুসূদন গুপ্ত প্রভৃতির গ্রন্থাদি-রূপ উপকরণ-সামগ্রী প্রাপ্ত হইবার পরে যেরূপ গ্রন্থ লোকে প্রত্যাশা করিয়া থাকে, ইহা তদ্রূপ হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিতান্ত নিন্দা করা যায় না।

(ঙ) ১২৮৭ সালে কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন গুপ্তের যত্নে বাঙ্গলা অক্ষরে মূল, ডল্লনাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত টীকা ও অনুবাদ প্রকটিত হইতে থাকে। জীবানন্দের ন্যায় ইহার মূল ভাগে কোন কোন শব্দ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে অশুদ্ধ পদও বিরাজিত রহিয়াছে। পদ-যোজনা-বিষয়ে বিলক্ষণ দোষ রহিয়া গিয়াছে। বর্ণাশুদ্ধির তো কথাই নাই। এই পুস্তকে ডল্লনাচার্য্যের টীকার বৃত্তান্ত আমরা সবিশেষ অবগত আছি। পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের আন্তরিক চেষ্টায় ও বহুশ্রমে সংগৃহীত পুস্তকের সাহায্যেই উহা মুদ্রাঙ্কিত হইতে থাকে। দীনবন্ধু বাবু কাশ্মীররাজের পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আনাইয়া এক বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম ও অশেষ যত্ন সহকারে নিজ হস্তে তাহার প্রতিলিপি সমাপ্ত করেন। আমরা দীনবন্ধু বাবুর সঙ্কলিত

সেই মূল প্রতিলিপি দেখিয়াছি। সেই টীকায় যে যে অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, হরিমোহন সেন গুপ্তের মুদ্রিত টীকায় তদপেক্ষা অধিক অশুদ্ধি আছে। পদ-যোজনা, পরিচ্ছেদ-বিভাগ, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার নাই, বলিলেই হয়। মূল সংস্কৃত ও ভাষান্তর পরস্পর বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গুণের মধ্যে বড় বড় অক্ষরে অনুবাদটী মুদ্রিত। এইরূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াও, প্রকাশক মহাশয়, পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

(চ) সার্জন উদয়চাঁদ দত্ত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিব্লোথিকা ইণ্ডিকার (Bibliotheca Indica) সাহায্যে ইংরেজী ভাষায় উহার দুই তিন খণ্ড প্রচার করেন। তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাঁহাকে পরের সাহায্যাপেক্ষী হইতে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, যে লোকের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া ভাষান্তর-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল, তিনিও আবার স্বয়ংসিদ্ধ নহেন,—তিনিও পরমুখাপেক্ষী লোক ছিলেন বলিয়া, ঐ মুদ্রাঙ্কণ আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয় নাই।

প্রথমতঃ। — সুশ্রুত-সংহিতা-সম্বন্ধে এই সকল উপাদানাবলী বিদ্যমান আছে। ইহাদের পরবর্ত্তী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কবিভূষণ কর্ত্তৃক প্রচারিত সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থ এই উপাদানসাহায্যে কেমন অপূর্ব্ব ও উপাদেয় দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাই এ স্থলে একবার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই পুস্তক-সম্বন্ধে অন্যান্য কয়েকটী পত্রিকায় ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, * কিন্তু তাহা'তে সমস্ত গুণাগুণ উল্লিখিত না হওয়ায় এই সমালোচনা লিখিত হইল।

১। "ঔপধেনব বৈতরণ ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর রক্ষিত ও সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ ধন্বন্তরির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! মানবগণ শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক ও স্বাভাবিক নানাবিধ রোগে অভিভূত হইয়া অনাথ দীন হীনের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে।"

(১ পৃষ্ঠা)

এই ৪ চারি প্রকার রোগ-বিভাগ-বিষয়ে ডল্লনাচার্য্যের টীকায় দেখা যায় যে, এস্থলে মূলের মধ্যে "স্বাভাবিক রোগের" উল্লেখ থাকিবার আবশ্যকতা নাই। † কারণ, তাহা অপর বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে।

---

* সারস্বত পত্র, ১২৯১ সাল, ৯চৈত্র। সোমপ্রকাশ, ১২৯১, ২৫চৈত্র। আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী ১খণ্ড, ৫সংখ্যা। প্রভাতী, ১২৯১, ২৯ ফাল্গুন, ৪ চৈত্র ও ১৫চৈত্র। সঞ্জীবনী, ১২৯২ ১৬চৈত্র।

† "স্বাভাবিকানামত্রাগ্রহণমস্মিন্ শাস্ত্রে তৎপ্রতিকারস্যাপ্রাধান্য-সূচনার্থং। অথবাস্মাকঞ্চ প্রাণযাত্রার্থমিত্যত্রৈবাবরোধাচ্চ। ঋষীণাঞ্চ শারীর মানসাগন্তু-ব্যাধ্যসম্ভবাৎ কেবলং স্বভাব-ব্যাধি নিষেধেনৈব প্রাণযাত্রাভিপ্রেতা॥"

[ডল্লনাচার্য্যের টীকা।]

এই শাস্ত্রে স্বাভাবিক রোগ প্রতীকারের অপ্রাধান্য সূচনার জন্য এ স্থলে স্বাভাবিক রোগ গৃহীত হয় নাই, অথবা "আমাদের (ঋষিদের) প্রাণযাত্রার নিমিত্ত" এই অংশেই স্বাভাবিক রোগ পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। ঋষিদের শারীরিক, মানসিক ও আগন্তুক ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল স্বাভাবিক রোগের প্রতীকার হইলেই তাঁহাদের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

এইরূপ লিপি থাকিতেও মূলের মধ্যে স্বাভাবিক যোগের উল্লেখ দেখিয়া, মুদ্রাঙ্কণকারী মহাশয়গণ যে, এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, তাহা প্রতীত হয় না। "বঙ্গে ও বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে পর্য্যটন" পূর্ব্বক "টীকার অনেকাংশ সংগৃহীত" করিয়া, বুঝি এই দুর্দশা হইল।

২। "শল্যতন্ত্র শব্দের অর্থ অস্ত্র-চিকিৎসা শাস্ত্র। কারণ, শল্য শব্দের অর্থ—অস্ত্র, এবং তন্ত্রশব্দের অর্থ—শাস্ত্র। সুতরাং অস্ত্র-বিষয়ক শাস্ত্রের নাম শল্যতন্ত্র।" (২ পৃষ্ঠা।)

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে শরীরের মধ্যে যে সকল শর প্রভৃতি বিদ্ধ হয়, তাহাই এই শাস্ত্রের মতে শল্য। এবং তাহাই উহার প্রকৃত অর্থ। চিকিৎসা করিবার অস্ত্রকে শল্য বলে না।*

৩। "তাঁহাদের প্রার্থনামতে অশ্বিনী-দ্বয়ও ছিন্ন-মস্তক দেহে যোজন করিয়া দিলেন।

"ইহার উপায় ও যোগ সমস্ত আশুফল-প্রদ বলিয়া, এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপায় আছে বলিয়া অষ্টাঙ্গ মধ্যে শল্যাঙ্গই অধিকতর আদরণীয়।" (৬পৃঃ)

এ স্থলে মূলের মধ্যে প্রণিধান শব্দ দেখা যায়। উহার অর্থ—প্রযোগ। "প্রস্তুত" কখনই হইতে পারে না। কারণ, অগ্নি প্রণিধান-স্থলে চকমকি ঝাড়িয়া বা দেসালাই ঘসিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিবার বৃত্তান্ত আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন, এ কথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বলিবেন না।

৪। "পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও আত্মা এই সমবেত ছয়টী ধাতুকে পুরুষ কহে।"

পুরুষ শব্দের নানা অর্থ। সাহিত্যে যে অর্থ, ব্যাকরণে তাহার বিপরীত; সাংখ্য-দর্শনে একরূপ অর্থ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে অন্য রূপ। একরূপ স্থলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া সতর্কতা সহকারে বলিতে হইলে, এই প্রকার নির্দ্দেশ করাই বিধেয় ছিল যে, 'এই সমবেত ছয়টীকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পুরুষ কহে।' এই নিমিত্তই মূলে "অস্মিন্ শাস্ত্রে" (এই শাস্ত্রে) এইরূপ পদের প্রযোগ আছে।

৫। তৎপরে অনুবাদকগণ বলিতেছেন,—

"উক্ত পুরুষ স্থাবর ও জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার।" (৭ পৃষ্ঠা)

এ স্থলে এই অনুবাদ নিতান্তই ভ্রমাত্মক। পুরুষ দুই প্রকার লিখিত নাই, সমস্ত জগৎ দুই অংশে বিভক্ত, তাহাই লিখিত আছে।*

৬। "সেই স্থাবর ও জঙ্গমে অগ্নি ও সোমগুণ অধিক আছে বলিয়া, স্থাবর আগ্নেয় এবং জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।" (৮ পৃঃ)

এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী ‡ বলিয়াছেন,—"জগতের যাবতীয় পদার্থ আগ্নেয়, এবং যাবতীয় জঙ্গম পদার্থ সৌম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা, আয়ুর্ব্বেদ-পাঠীর কথা দূরে থাকুক, এক জন সাধারণ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পদার্থ-সমূহকে সোম-

---

* "শল খল আশুগমনে ধাতুঃ, তস্য শল্যমিতি রূপং।" * * * "অধিকারো হি লোহ-বেণু-বৃক্ষ-তৃণ-শৃঙ্গাস্থিময়েষু * *।"

* "কস্মাৎ লোকস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। লোকো হি দ্বিবিধঃ, স্থাবরো জঙ্গমশ্চ"—[সুশ্রুত-সংহিতা।

‡ আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

গুণের আধিক্য বশতঃ সৌম্য এবং অগ্নি গুণের আধিক্য বশতঃ আগ্নেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা এস্থলে আচার্য্যের অভিপ্রেত। স্থাবর আগ্নেয়, জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত করা সংহিতার তাৎপর্য্য নহে।"

৭। "উক্ত আহার দ্রব্যও ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ঐ আহার দ্রব্য স্থাবর ও জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার। স্থাবর আবার চতুর্ব্বিধ, যথা—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি।

"বনস্পতি—যাহাদের কেবল ফল হয়, পুষ্প হয় না, তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যেমন, বট, অশ্বত্থ, উডুম্বর (যজ্ঞডুম্বুর) প্রভৃতি।

"বৃক্ষ—যাহাদের পুষ্প হইতে ফল হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। যেমন আম্র, জম্বু (জাম,) তিন্তিড়ী (তেঁতুল) ইত্যাদি।

"বীরুধ,—যাহারা একত্রীকৃত তৃণগুচ্ছের ন্যায় শাখা পল্লব-বিশিষ্ট এবং খর্ব্বাকার,তাহাদিগকে বীরুধ বা গুল্ম বলে।

"ওষধি,—ফল পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে, ওষধি কহে। যথা—কদলী, ধান্য, ইত্যাদি।

"জঙ্গম প্রাণী ও উৎপত্তি ভেদে চতুর্ব্বিধ। যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি অণ্ডজ, এবং বস্ত্র পচিলে, তাহা হইতে যে কীট জন্মে, তাহাদিগকে স্বেদজ কহে। যথা—মশা, মাছি, কীট ইত্যাদি। আর যে সমস্ত প্রাণী মৃত্তিকা মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ প্রাণী বলে। যেমন—মহীলতা (কেচুয়া), ইন্দ্রগোপকীট প্রভৃতি।" (১০ ও ১১ পৃঃ)

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী * এ বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—"এতদ্দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে? সুশ্রুতাচার্য্য বট, অশ্বত্থ হইতে মশা, মাছি, চর্ম্মকীট প্রভৃতি পর্য্যন্ত সমুদায়ই আহারীয় দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত করিয়া উহার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহা একান্ত অসম্ভব এবং আচার্য্যের অভিপ্রায়ের একান্ত বিরুদ্ধ। এই স্থানের চক্রপাণির ব্যাখ্যা † দেখিলেই, সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে।

চক্রপাণি বলেন,—

* * "পূর্ব্বে যে সংশোধন ও সংশমনের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত সংশোধনাদি ঔষধ স্থাবরাদি-ভেদে নির্দ্দেশ করিয়া আহারের প্রাধান্য খ্যাপনের অভিপ্রায় এই যে, প্রাণিনামিত্যাদি পাঠের অবতারণা হইয়াছে, সুতরাং চক্রপাণির ব্যাখ্যা ও আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভৃতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বট, অশ্বত্থ মশা, মাছি প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ আহারীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা আচার্য্যের অভিপ্রায় নহে।"

৮। অনুবাদিত ভাগের ৭পৃষ্ঠার টীকায় বলা হইয়াছে,—"এ স্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, জীবিত শরীরেই চিকিৎসা হইয়া থাকে, মৃত শরীরে চিকিৎসা চলিতে

* আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা।

† "ইদানীমুক্ত-সংশোধনাদৌ স্থাবরাদি-ভেদেন ঔষধ-দ্রব্যং নির্দ্দিষ্টং আহারস্যৈব প্রাধান্যখ্যাপনার্থমাহ প্রাণিনামিত্যাদি।"—[চক্রপাণি দত্ত-কৃত ভানুমতী।]

পারে না কেন?" এই যে একটী অতি-গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার অভূতপূর্ব্ব সমাধানটী পাঠক মহাশয়গণ একবার পড়িয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কেমন মনোরম পদার্থ। ছোট ছোট অক্ষরে দুই পৃষ্ঠায় তাহা লিখিত আছে। তদ্দ্বারা কল্পনার অধিকতর স্থান অধিকৃত হওয়া কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়।

৯। "সংশোধন ও সংশমন রূপ আহার ও আচার সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে, রোগের শান্তি হইয়া থাকে।" (৯ পৃষ্ঠা)

"সংশোধন ও সংশমন"-রূপ আহার ও আচার" পদার্থটী কি, পাঠক মহাশয়দিগকে আমরা ভাষান্তরকারকগণের লেখা হইতেই অগ্রে প্রদর্শন করিতেছি, তৎপরে তৎসম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

"যদ্দ্বারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থ বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন শস্ত্র, ক্ষার, বমন ও বিরেচন। যদ্দ্বারা দোষ (বিকৃত বায়ু পিত্ত ও কফ এবং আমাশয় প্রভৃতি) বিরেচিত না হইয়া প্রশমিত হয়, তাহাকে সংশমন বলে। যেমন মালিশ, প্রলেপ রসায়ন, বাজীকরণ, পাচন দ্রব্য প্রভৃতি।" (৯ পৃঃ টীকা)

অনুবাদকগণের মত এই হইতেছে,—বমন, বিরেচন, মালিশ প্রলেপ ইত্যাদি রূপ আহার ও আচার! প্রথম উদ্ধৃত অংশ যে রূপ হওয়া কর্ত্তব্য ছিল, তাহা এই—

সংশোধন ও সংশমন, আহার ও আচার দ্বারা রোগের শান্তি হয়।

১০। এই স্থলে টীকা করিয়া বলা হইতেছে, "ঔষধ শব্দের শক্তি কোন্ কোন্ পদার্থকে আশ্রয় করিতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ করা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।" (৯ পৃঃ টীকা)

উহার পরেই "ঔষধের একটী সহজ-বোধ্য লক্ষণ ও তাহার বিবৃতি" দেওয়া হইয়াছে। যথা,—'রোগ প্রতীকারের যে যে দ্রব্য প্রযোগ এবং যে যে উপায় অবলম্বন করা যায়, ত সমস্তকেই ঔষধ বলা যাইতে পারে।" (৯ পৃষ্ঠার টীকা)

অহো মনোহারিণী বিবৃতি! বঙ্গ-দেশীয়গণ! তোমরা তো চিরকালই স্থূল-বুদ্ধি বলিয়া বিদেশীয়ের নিকট তিরস্কৃত হও, তোমরা এত দিন ঔষধ শব্দের ঐ অর্থ জানিতে না। সুতরাং স্বদেশীয়ের নিকটও স্থূলবুদ্ধি জন্য আরও লাঞ্ছিত হইলে। সূক্ষ্মবুদ্ধি অনুবাদকদ্বয় সৌভাগ্য ক্রমে ব্যখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাই দেশটা বাঁচিয়া রহিয়াছে, এবং এইরূপ টীকা টিপ্পনী, ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের তেজেই বঙ্গদেশের দুঃখ-নিশার অবসান হইবে।

১১। 'কায় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্বর ও অতিসার রোগের চিকিৎসা॥"

(৩ পৃষ্ঠার টীকা)

কায় চিকিৎসা শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ জ্বর ও অতিসার রোগের চিকিৎসা কোন্ অভিধানে লেখা আছে?

১২। "স্বভাবতই হউক বা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ জন্যই হউক, অল্প শুক্র ও পরিশুষ্ক শুক্রের বর্দ্ধন, দূষিত শুক্রের সংশোধন ও স্ত্রী-সংসর্গে শক্তি বর্দ্ধনের উপায় যাহাতে উক্ত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের সেই অংশের নাম বাজীকরণ তন্ত্র।" (৪পৃঃ)

ইহার অর্থ ওরূপ নহে। প্রকৃত অর্থ এই,—আয়ুর্ব্বেদের যে ভাগে অল্প শুক্রের আপ্যায়ন, দুষ্ট শুক্রের প্রসাদ, বিশুষ্ক শুক্রের

জনন, ও ক্ষীণ শুক্রের উপচয় জন্য ঔষধ, শুক্রদোষ সংশোধন এবং রতি শক্তি বর্দ্ধনের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম বাজীকরণ তন্ত্র।*

দ্বিতীয়তঃ।—অনুবাদকর্ত্তারা শাস্ত্রজ্ঞতার কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

১৩। সুন্দর কাগজে বিস্তর ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতে থাকে, তাহার অশুদ্ধি দেখিলে, কি যে এক বিজাতীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই ধারণা করিতে পারেন। এক্ষণে উৎসর্গ পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের বক্তব্য বিষয় প্রকটিত করিতেছি। উৎসর্গ পত্রের প্রথমেই এই শ্লোকটী আছে,—

"একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদিতং।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা সোঽঋণী
ভবেৎ॥"

ইহার অর্থ এই যে, "যে গুরু শিষ্যকে একটী অক্ষরও দেন, পৃথিবীতে এমন কোনই দ্রব্য নাই, যদ্দ্বারা তিনি (সেই গুরু) অঋণী হন।"

এ স্থলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে (তিনি) "সঃ" শব্দে গুরুকে বুঝাইতেছে। শিক্ষা দিয়াও গুরু যে শিষ্যের নিকটেই ঋণী থাকেন, এই নূতন তত্ত্বটী যাঁহারা আজ শিক্ষা না করিবেন, তাঁহারা নরকগামী হইবেন। অনুবাদকেরা এইরূপ গুরুবৎসল বিদ্যার্থীই বটেন! পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে উক্তরূপ রসামোদে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন। অতএব তাঁহাদের জন্য ঐ উদ্ভট্ শ্লোকের অধিকাংশ পদ বজায় রাখিয়া উহাকে অর্থযুক্ত ও বিশুদ্ধ করিয়া দিলাম,—

"একমপ্যক্ষরং যস্মৈ গুরুঃ শিষ্যায় যচ্ছতি।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা সোঽনৃণী
ভবেৎ।"

এখন অর্থ করিলে, প্রকৃত অর্থই লব্ধ হইবে। অর্থাৎ শিষ্যই গুরুর সন্নিধানে ঋণী থাকেন, এইরূপ অর্থ হইল।†

তৃতীয়তঃ।—আজ কাল বাঙ্গালা দেশের সকল লেখকই নূতন ভাব-প্রচারক বলিয়া পরিচিত হইতে ব্যগ্র। তাঁহারা সংগ্রহকার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। মৌলিকতার ভাণ করিয়া পাঁচ স্থান হইতে পাঁচটী বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক সকলকে নূতন তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দূরদর্শী লোকের নিকটে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তাঁহাদের মানসিক শক্তির বল অত্যন্ত অধিক, সন্দেহ নাই। অধিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই,—উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ দেখুন,—পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানবিষয়ে অন্যান্য অনেক কথার সঙ্গে যাহা যাহা কহিয়াছেন, তাহার একাংশ এই,—

১৪। "সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর উত্থিত নানাবিধ জ্ঞান প্রবাহের মধ্য হইতে কোন্‌টী যথার্থ (ঠিক্) জ্ঞান, তাহা চিনিয়া লইতে হইবে। এ কারণ যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ উপদেশ করা আবশ্যক।"—(সাংখ্য-

* "বাজীকরণতন্ত্রং নাম অল্প-দুষ্ট-বিশুষ্ক-ক্ষীণ-রেতসামাপ্যায়ন-প্রসাদোপচয়-জনন-নিমিত্তং প্রহর্ষজননার্থঞ্চ।"

† বড়ই দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্নের "শিক্ষা" পুস্তকেও ঐ ভ্রম আছে।

দর্শন, প্রথম ভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৭ পৃ) ইহার নকল পাঠক দেখুন,—

১৫। "জলতরঙ্গের ন্যায় অবিরত সমুত্থিত জ্ঞান-প্রবাহ হইতে কোন্‌টী 'প্রকৃত জ্ঞান' তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। সেই জন্য প্রকৃত জ্ঞানের একটী সংক্ষিপ্ত সূত্র বা লক্ষণ বলা যাইতেছে।"—[সুশ্রুত-সংহিতা, ৫ পৃ, ১২৯১ সাল।]

১৬। বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন,—

"যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত প্রমা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। এই প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধি হয়। * * এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে যে, প্রমাণ কত প্রকার? কপিল মতানুযায়ীরা উত্তর দিবেন—

"প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মতভেদ আছে। কেহ ১, কেহ ২, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬ প্রমাণ স্বীকার করেন। কপিল ৩ প্রমাণবাদী। ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক, আর ঔপদেশিক। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক, অনুমান বা যুক্তিমূলক জ্ঞান যৌক্তিক, আর উপদেশ জন্য জ্ঞান ঔপদেশিক নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার নামান্তর যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব্দ।"

—[সাংখ্যদর্শন, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ।]

১৭। আয়ুর্ব্বেদ-অনুবাদক কি বলিতেছেন,—

"যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমা বা প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রমাণ কহে। এই প্রমাণ দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয়।

"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্রমাণ কত প্রকার? তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে সূক্ষ্মদর্শী কপিল বলেন,—প্রমাণ তিন প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অনুমিতি ও শব্দ।"—[সুশ্রুত সংহিতা, ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা।]

বাঙ্গালা ভূমিকার এক স্থানে "বীর্য্যহীন ও ক্রিয়াহীন ও মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদে যত্নবান্‌" হইতে "দেশহিতৈষী বিদ্যানুরাগী" মহাত্মাগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভাল, অনুবাদকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আয়ুর্ব্বেদ যদি "বীর্য্যহীনই" হয়, তবে তাহার পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন কি?

চতুর্থতঃ।—টীকা টিপ্পনী সুখ-বোধের জন্যই বিজ্ঞ লোকে রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই গ্রন্থে কেহ তাহার প্রত্যাশা করিলে, তাঁহাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ের টীকা শুনুন,—

১৮। "চন্দ্রবংশীয় সুনহোত্রের পুত্র গৃৎসমদ হইতে চাতুর্ব্বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা মহাত্মা শৌনক ও কাশ্যপ বংশে কাশিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন।"

লেখকদের মতে গৃৎসমদের পুত্র শৌনক ও কাশ্যপ। এই শৌনক ও কাশ্যপবংশে কাশিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন! সর্ব্বৈব গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ স্থলে বংশ-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বিশদরূপে বলা উদ্দেশ্য হইলে, এইরূপ বলাই উচিত ছিল যে,—চন্দ্রবংশীয় শৌনহোত্রী কাশ্যপ হইতে কাশিরাজের জন্ম হয়। আমাদের বাক্যের যথার্থ্য সাব্যস্ত করিতে যাঁহারা প্রয়াসী হইবেন, তাঁহারা অনুবাদকদের অবলম্বিত বিষ্ণুপুরাণ দেখিলেই আমাদের মধ্যে কাহার কথা প্রামাণিক, উপলব্ধি করিবেন।

এই পুস্তকে অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র অভাব দেখিলাম না। ভমুনাচার্য্যের টীকা আছে,

পৃষ্ঠপোষক এক জন প্রসিদ্ধ জমিদারের সাহায্য আছে, উৎসর্গ পত্র আছে। দুই জন অনুবাদকের যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যম আছে। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে ভূমিকা আছে। এই সমস্তই আছে, কেবল সার পদার্থই নাই।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

গ্রন্থকার-রহস্য নাটক।

A COMEDY IN FIVE ACTS.

প্রথম অঙ্ক।

মুরলীধর ও লোকনাথ আসীন।

লোক। তোমার 'উড়ে যাই,—প'ড়ে যাই,—ম'রে যাই'-এ সবে আর কিছু হচ্ছে না। এত কষ্ট! বাচ্ছা কাচ্ছাগুলো যে মারা পড়ে। পেট চালাবার যোগাড় দেখ। মুনের দালালীটে ছেড়ে দিয়ে কি ভাল কাজ ক'রেছ?

মুর। ভাই, কল্পনার বালিশ যখন বুকে দিয়ে প'ড়ে থাকি, তখন কি আর পার্থিব ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে থাকে? সংসার, পুত্র, পরিবার কি মনে থাকে? আগে বুক, পরে পেট, পেটের উপর বুক, একি তুমি জান না? আর কষ্ট?—কষ্টইত বিদ্বানকে যশস্বী করে; দেখ নেপোলিয়ান, সেক্ষপীয়ার, হরুঠাকুর—

গৃহিণীর প্রবেশ।

গৃহি। (লোকনাথের প্রতি) ভাই, তুমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল। আমি ত আর পারিনে। হাতের কুলি সার হ'য়েচে। রাবণের পুরী। ছেলেগুলো দিন রাত্রি খাই খাই ক'চ্ছে, কি দিয়ে তাদের থামাই? মাথা মুণ্ডু, উনি ত চাদ্দিকে বই সাজিয়ে একবার এটা ওল্টান আর একবার ওটা ওল্টান—

নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ। মা বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ও মা—

গৃহি। এই নাও তোমার ছেলে পিলে, এই রৈল তোমার ঘরকন্না। আমি বাপের বাড়ী পালিয়ে হাড় জুড়ুই—

[গৃহিণীর দ্রুত প্রস্থান।

নন্দ। ও মা—(প্রস্থানোদ্যগ)

মু। নন্দ, ক্ষিদে পেয়েছে?

ন। বাবা, বড্ড, থাকৃতে পাচ্ছিনে।

মু। আয়, খা। (এক খণ্ড পাণ্ডুলিপি প্রদান এবং লোকনাথের প্রতি গম্ভীর ভাবে) শ্যালক-কুল-তিলক, নব্য কাব্য-রস সজল গব্যরসাপেক্ষা বহুতর গুণে উপাদেয়, স্বাস্থ্যকর।

লো। দেখা যাক্। (হাস্য)

ন। (লেহন পূর্ব্বক) থু থু! অ্যাঁ অ্যাঁ, থু থু! মা—ওঁ!

মু। আর আমার এ সংসারে থেকে কাজ নেই,—কেহ বশ নয়। পুত্রও হ'লো সমালোচক! ও!—ভাই, তোমার হাতে আমার পুত্র-পরিবারকে সমর্পণ ক'রে আমি বিবাগী হয়ে চল্লেম। শেষ কথা, সুখে থেক, সুখে রেখ।

লো। দোহাই—দোহাই—

[ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

মুরলীধর আসীন।

মু। (স্বগত) এই যে নূতন—চিরনূতন এত গুলি উপন্যাস, নবন্যাস, রহোন্যাস লিখেছি, এই যে কোন আটক না মেনে এতগুলি সুন্দর অতিসুন্দর নাটক, চটক লিখেছি, এই যে নিরবদ্য অচ্ছেদ্য উচ্ছাসে এতগুলি পদ্য, গদ্য লিখেছি. এই যে একমন হ'য়ে এতগুলি প্রাণধন প্রহসন লিখেছি, এ কি জগতে ররিষণ কর্ত্তে পার্‌বো না! Full many a gem—(পরিক্রমণান্তর) বেশ বেশ! সদুপায় ঠাউরেছি। গনিমিয়া কে, সি, এস, আই হ'য়েছে, তাঁর নামে একটা গান লিখে পাঠান যাক; কিছু টাকা পাওয়া যাবে। আর, Thacker, Newmanদের নামে গোটা কত গান বাঁধা যাক, তারা খুসি হ'য়ে আমার বই ছাপাবে—(গুণ গুণ স্বরে) আঁ্যা তানা নানা নানা দারে দারে নানা তানা উম্।

(বাহিরে "ওগো মশাই বাড়ীতে আছ?")

কে ও? উট্‌নোদার না? উঃ! আর পারিনে। বাধা—বাধা—চাবি দিকে বাধা। এ সংসারে থাকৃতে চাইনে।

[অর্গল প্রদান।

তৃতীয় অঙ্ক।

গৃহিণী ও মুরলীধর আসীন।

মু। গৃহিণি. আর একটু ব'সো। তোমার বদন-সুধা পান ক'রে সারা দিনের উদর-ক্ষুধা নির্ব্বাণ করি।

গৃ। আ। 'জ্বালাতোন ক'রো না, কিছু ধার-ধারের যোগাড় দেখ। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলেচো। ছুনের লাটে—

মু। প্রিয়ে, রসনামৃত কেন লবণাক্ত কচ্চো, অমৃত দেব-ভোগ্য।

(বাহিরে—"মহাশয় মহাশয়।")

কেও? নতুন গলা! গিন্নি, তুমি পাকশালায় যাও, বড় ক্ষিদে—

[গৃহিণীর প্রস্থান।

আগন্তুকের প্রবেশ।

(পরস্পরের অপ্যায়িত করণান্তর—)

আগ। মশাই, আমি এক খানা কাগজ বার কচ্চি. আপনায় লিখ্‌তে হবে।

মু। উত্তম, অতি উত্তম। আরো লেখক আছে?

আ। আছে।

মু। উত্তম। গ্রাহক?

আ। আছে।

মু। উত্তম, অতি উত্তম। টাকা?

আ। না।

মু। (বিমর্ষ)

আ। মশাই!

মু। (চিন্তা)

আ। মশাই, লিখ্‌বেন না?

মু। (চিন্তান্তে) কথা দিয়েছি, লিখ্‌বো। কিন্তু আপ্‌নাদের একটা কাজ কত্তে হবে। আমার লেখায় কতকগুলো এডিটোরিয়েল নোট দিতে হবে প্রশংসা ক'রে—

আ। দেবো। তার আর কি মশাই!

মু। একটা টাইটেল—

আ। এখনি—এখনি!

মু। আচ্ছা, নাটক নভেল পদ্য গদ্য যখন যা দরকার তাই দেবো।

আ। মশায়ের কাছে তাই আশা। আপনি সহায় না হ'লে—

মু। (উৎসাহে) আর এক কর্ম্ম করুন না, আমার বই গুলো ছাপান্ না, মলাটখানায় শুধু কাগজের নাম থাকবে—

আ। (অস্পষ্ট স্বরে) বেশ কথা। (ধীরে) পরে আপ্নার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির ক'রবো। আজ লেখাটা—

মু। দিচ্চি। (কাপি প্রদান।)

আ। (স্বগত) আর এ মুখে যে হয় সে—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

মুরলীধর আসীন।

মু। (কাগজ হস্তে) তাইত! সবটাই যে বেরিয়েছে। সেবার তারা কাপি নিয়ে গেল, তা খানিকটা ছাপিয়ে আর ছাপালে না। বলে, ভাল নয়, কেউ পছন্দ করে না। শেষ কি না কাপি গুলো ফেরত দিলে! তা দিক্। আগুন কখন চাপা থাকে না। এখন লেখাত বেরুলো, নামও জাহির হ'লো। মনে ক'রেছিলুম,বইগুলো হয়ত বটতলায় ছাপাতে হবে—আর দিচ্চিনে। এক লেখায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, মহামহিমার্ণব, বিখ্যাত প্রবন্ধকার, ও নটচূড়ামণি, হ'য়েছি।

চারিদিকে সবাই ব'লচে এমন কেউ লেখেনি, লিখ্‌বে না, লিখ্‌তে পারবে না। আর একটা লেখা ছাপালে—!! আমিত জাস্তেমই—(উল্লাসে) গৃহিণি গৃহিণি!

গৃহিণীর প্রবেশ।

দেখ্‌লি পাগ্‌লি! ভাব্‌না কি তোর? দেখ আমায় কি ব'লেছে! পণ্ডিতাগ্রগণ্য—

গৃ। সে কি?

মু। প-ণ্ডি-তা-গ্র-গণ্য,

গৃ। কি! পিণ্ডি অগণ্য?

মু। দূর বুঝলি নে। (হাস্য) মহামহিমার্ণব।

গৃ। ওমা মর মর ব'লে গাল দিয়েছে! সে কোন্ লক্ষ্মীছাড়া, পাঝাড়া, মুখপোড়া, পথেপড়া!

মু। দূর! আচ্ছা, বিখ্যাত প্রবন্ধকার—

গৃ। কি! বিকৃত অন্ধকার সে আবার কি?—তা, তোমার চেহারাটা শুদ্ধ ছাপিয়েছে! আ ম'লো আস্পর্দ্ধা দেখো, একটু কাল ব'লে অন্ধকার বলা হ'য়েছে, কি ব'লবো—

মু। দূর মুখ্‌খু! নটচূড়ামণি—

গৃ। এইবার বুঝেছি, নোটো! তা এটা কিন্তু ঠিক্ বলেছে।

মু। তোমার মাথা! আমি বলি এক, ও বলে আর!

গৃ। আমি বল্লেই যত দোষ! আর তারা বলেছে মধু বর্ষেছে।

মু। (সক্রোধে) দূর হ, হতভাগা মাগি।

গৃ। তা, বল্‌বে না, বেশ করেছে, বলেছে। উঃ আবার ঝাল!

বলে—"ন'টোরে বলোনা ন'টো।
উল্টে ধরবে চুলের মুটো!"

মু। (কাতর স্বরে) না, মুখ্‌খুর পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল। তুই এ সব কিছুই বুঝিস্‌নে, তাই মুনের দালালী চুনের দালালী ক'রে ঝগড়া করিস্। (পিঠ চাপড়ান) আজও তোর অর্থবোধ হলো না। অর্থই ত অনর্থের মূল।

পঞ্চম অঙ্ক।

মুরলীধর ও ধনেশ্বর বাবু আসীন।

মু। তা, আপ্‌নাদের ষ্টেজ্ বাঁধা হ'য়েছে—বেশ বেশ—বসুন; লিখে দিচ্চি, এখনি লিখে দিচ্চি। যা বলুন, নবরসের ন খানাই লিখে দিচ্চি। নিজ মুখে ব'লতে চাইনে, আমার প্রশংসা টাইটেল সব ত দেখেছেন। আত্মপ্রশংসা করা (ঈষদ্ধাস্য)—

ধনে। শুনেই এসেছি। পাঁচশো দিতে পারবো না, দুশো টাকা নিন্। আর দুঃখের একখানা নাটক লিখে দিন।

মু। দুঃখের—করুণ রসাত্মক! করুণ রস কি দুশো টাকায় হয়, মশাই? আপনিই দেখুন, কত পড়্‌তে হয়, কত কাঁদ্‌তে হয়, শরীরের রক্ত জল কর্ত্তে হয়।

ধ। আচ্ছা আড়াইশো নিন; আর একপয়সাও বেশী দিতে পার্‌বো না। ফণ্ডের টাকা, আমার নিজের হ'লে কথা ছিল না।

মু। আপনি শপথ ক'রে বল্‌ছেন আমার আড়াইশো টাকা দেবেন?

ধ। হ্যাঁ, শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি।

মু। আচ্ছা, পৌরাণিক ঐতিহাসিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক কি নাটক চান?

ধ। সবাই যা বুঝতে পারে, মহাভারত টারত থেকে।

মু। বেশ. আপ্‌নি লিখুন আমি বলি। নিজে ব'লতে লিখ্‌তে গেলে কিছুই হয় না, ভাব বন্ধ হ'য়ে যায়।

ধ। (লিখনের সারঞ্জম লইয়া) বলুন।

মু। লিখুন—দেবযানী কূপে পতিত হইয়া (চিন্তা) হইয়া—হইয়া—(সহসা ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা ঢোলকের মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া, ক্রন্দন স্বরে) রক্ষা কর, রক্ষা কর—দেবদৈত্যনরত্রাস! যে যেখানে আছ রক্ষা কর, প্রাণ যায়! আমি সোম মঙ্গল বুধ—দূর ছাই একটা—বারের মেয়ে, যে আমাকে উদ্ধার ক'রবে, বাবা তার সঙ্গেই আমার বিবাহ দেবেন, না দেন ত মজা দেখিয়ে দেবো—

ধনে। মশাই এ কি? (প্রস্থানোদ্যোগ)

মু। চুপ করুন—আরো আছে। পতন, মুর্চ্ছা, ঘন ঘন বজ্রাঘাত, দীর্ঘ দীর্ঘ স্বগত, উঃ, আঃ, অহো, প্রাণনাথ, হৃদয়-বল্লভ, হা সখি প্রাণ যায়—অনেক আছে, ক্রমে বল্‌ছি, লিখে যান। সবুরে মেওয়া ফলে। উতলায়—

ধনে। আর কাজ নাই, থাক মশাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

(মুরলীধরের ঢোল শুদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে ধনেশ্বরের চাদর ধরিয়া) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, মহাশয় ধনী মানী গুণী জ্ঞানী; আপনি ধন্য, গণ্য, বদান্য, আমাকে দৈন্য হইতে উদ্ধার করুন! ছাড়বো না। কত দিকে কত ব্যয়, শপথ মনে করুন, বলা বাহুল্য, অলমতিবিস্তরেণ, কিমধিকমিতি—

ধ। কি করি! আমার নিজের লোকসান!

[মুদ্রা প্রদান ও প্রস্থান।

মু। (হর্ষে উচ্চৈস্বরে) গৃহিণি, গৃহিণি, —মহিষি মহিষি! পুত্রকে—যুবরাজকে কোলে লইয়া আমার বামে বসিয়া সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন কর। আজ কি আনন্দ!—

উদিল সুখ-শশী!—

প্রেমদাস।

মানবের উদ্দেশ্য ও কার্য্য।

'মানবতত্ত্বে' এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ উহার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াও সহজ নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ মানব বুদ্ধির বিষয়ই নহে। কি জন্য মানবের সৃষ্টি অর্থাৎ বিশ্বের বা ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য মানব না হইলে চলে না, তাহা মানব কি প্রকারে বুঝিবে? কেন না সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আবার অভাব কি যে তাঁহার প্রয়োজন হইবে? সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন জন্য মানবের সৃষ্টি ইহা কিছুতেই বিবেচনা করিতে পারা যায় না। যদি বিশ্বের প্রয়োজন জন্য মানবের সৃষ্টি বিবেচনা করিতে যাওয়া যায়, তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠে। কেন না মানবের ন্যায় বিশ্বের প্রয়োজন কি তাহাও কিছুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই। বিশ্ব যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট হয় তবে উহা না হইলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকিত না। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সুতরাং বিশ্বের সৃষ্টি না হইলে তদভাবে ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও ক্ষতি হইবার সম্ভব ছিল না; উহার সৃষ্টিতেও ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উপকারের সম্ভব নহে। আবার উহা ঈশ্বরের প্রয়োজনে পৌঁছিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত—থাকিলেও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিয়া লইতেছেন মনে করিতে হইবে; আমাদের কার্য্য দোষে তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় বলিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। এই জন্য বলি মানব বা সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি ও স্থিতির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা মানব বুদ্ধির বিষয় নহে।

এই স্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, মানবের সহিত বিশ্বের কোন পদার্থেরই নিত্য সৌহার্দ্দ্য নাই—সজাতীয় মানবই মানবের প্রকৃত সুহৃদ্ নহে। জড়াজড় সকল পদার্থই পরস্পর পরস্পরের অহিত চেষ্টা করিতেছে।

আমরা দেখিতেছি মানবগণ আপন হিতোদ্দেশে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, উকুন, মৎকুন প্রভৃতি কষ্টদায়ক প্রাণী এবং মেষ ছাগ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণী সকলেরই বধ সাধন করিতেছে; গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতিকে কষ্ট দিয়া হলশকটচালন, পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছে; এবং বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা, বায়ু, জল, তাড়িত, আলোক প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের ধ্বংস বা বিকৃতি সম্পাদন করিয়া আপন ইষ্ট সাধন করিতেছে। অধিক কি মানব বিশ্বের পদার্থ সকলকে এমন চক্ষে দর্শন করে যে, যদি তাহার উপকার করিতে বিশ্বের সমস্ত পদার্থের ধ্বংস আবশ্যক বোধ হয় তাহাও করিতে প্রস্তুত। এই জন্য মানব অরণ্যকে মরুভূমি, মরুভূমিকে অরণ্য, পর্ব্বতকে সাগর ও সাগরকে পর্ব্বত করিতেছে। গিরিরাজ হিমবান কি জলরাজ মহাসাগরের প্রাণের প্রতিও মানবের কিছুমাত্র মমতা নাই। সুতরাং কি প্রকারে বলিব মানব বিশ্বের হিতানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন বা সৃষ্ট।

আবার মানবের প্রয়োজন জন্য বিশ্বের অন্যান্য পদার্থ সৃষ্ট তাহাও বলিতে পারা

যায় না। কেন না সকল পদার্থই নিয়ত মানবের শত্রুতা সাধন করিতে সচেষ্ট। সিংহ ব্যাঘ্র, সর্প, প্রভৃতির ত কথাই নাই, যে অন্ন, পানীয় ও বায়ু মানবের জীবন বলিয়া প্রথিত তাহারাও নিয়ত মানবের অনিষ্ট সাধনে নিযুক্ত। মানব একটু অসাবধান হইয়া উহাদের সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ অপরিমিত ভোজন, পান ও বায়ু সেবনাদি করিলে মানবের প্রাণ হানি হয়।

অতএব কে কাহার জন্য সৃষ্ট ও কাহার কি প্রয়োজন তাহা স্থির করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্য আমরা আর এই গাঢ় তমসাবৃত স্থানে ভ্রমণ করিব না। যাহা যুক্তির বিষয় নহে তাহার বিষয় চিন্তা করিলে কি হইবে? অন্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া একাকী মানবের লক্ষ্য স্থির হয় কি না দেখা যাউক। অর্থাৎ মানব যে শক্তি ও প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদনুসারে তাহার লক্ষ্য কি হইতে পারে তাহাই দেখা যাউক। আমাদের তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না লক্ষ্য স্থির না হইলে আমাদের কর্তব্য স্থির হয় না। কর্তব্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি বা জাতি যাহাকে কর্তব্য বলেন অন্য ব্যক্তি বা জাতি তাহাকে যে অন্যায় কার্য্য বলেন, লক্ষ্য স্থির না থাকাই তাহার প্রকৃত কারণ। লক্ষ্য স্থির থাকিলে কখনই এত ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিরোধী মত সত্য বা লক্ষ্যসাধক বলিয়া আদৃত হইত না। তাহা হইলে যে মত অবলম্বনে চলিলে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না জানা যায়, তাহা কেহই অবলম্বন করিত না।

মানব যে আদৌ লক্ষ্য অনুসন্ধান করিতে যত্ন করে নাই এমত নহে। প্রত্যুত বহুতর লোক ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল একরূপ হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং কাহার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণীয় তাহা স্থির করা সুকঠিন। যাহা একরূপ নহে, বরং পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন তাহার সকলগুলিই সত্য হইতে পারে না। সুতরাং যাহা স্থির হইয়াছে তাহার কোন্‌টী সত্য অথবা তাহার মধ্যে কোনওটীতে সত্য আছে কি না স্থির করা আবশ্যক। তাহারও অনেক চর্চ্চা এ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা অদ্য সেই গুলির পুনরালোচনা করিব।

মানবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানাবিধ মত। প্রধানতঃ ঐ সকল পরকালগত ও ইহকালগত ভেদে দুই প্রকার। যাঁহারা মানবের ক্ষণজীবন ও সামান্য শক্তির সহিত বিশ্বের অনন্তত্ব ও অসীম শক্তির তুলনা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা পরকালেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে মানব ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যাহা কিছু করিবে তাহা চিরস্থায়ী পরকালের হিতের জন্য করিবে। যাঁহারা অনন্ত বিশ্বের সহিত ক্ষণভঙ্গুর জীবনের চির ও পরস্পর সম্বন্ধ দর্শন করেন না তাঁহারা ইহকালেরই মুখ্যত্ব স্বীকার করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে মানব যাহা কিছু করিবে তাহা ইহকালের হিতের জন্যই করিবে। ঐ মতদ্বয় আবার বহুতর অবান্তরভাগে বিভক্ত। পরকালবাদীদিগের মধ্যে একদল বলেন, স্বর্গ ও নরক নামে দুইটী চিরসুখ ও চিরদুঃখময় স্থান আছে, মানব ইহকালের

প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে তথায় যাইয়া চিরসুখে বা চিরদুঃখে নিমগ্ন হয়। নরক দুঃখময় ও স্বর্গ সুখময় স্থান। এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে মানব চিরকাল স্বর্গে বাস করিতে পারে তাহাই মানবের কার্য্য এবং স্বর্গবাসই লক্ষ্য। কেহ কেহ বলেন বিশ্ব অনাদি অনন্ত, ইহাতে জন্ম মৃত্যু নাই; যে জন্ম মৃত্যু দেখা যায় সে কেবল অবস্থান্তর মাত্র। মানব যেমন কার্য্য করিবে তাহার ফলানুসারে পরজন্মে উত্তম বা অধম জীবন লাভ করিবে। যে উত্তম কার্য্য করে সে পরজন্মে উত্তম জীবন প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যশালী ও সুখী হয় এবং যে মন্দ কার্য্য করে সে দুর্ভাগ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পায়। এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে পরকালে সৌভাগ্যশালী হইতে পারা যায় তাহাই মানবের কার্য্য এবং সৌভাগ্য-জীবন লাভই মানবের লক্ষ্য। কেহ কেহ বলেন, জগতে যত কেন সৌভাগ্যশালী মনুষ্য হউক না, সম্পূর্ণ দুঃখহীন মনুষ্য হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচিত হয়েন তাঁহারও দুঃখের সীমা নাই। দুঃখবিহীন জীবন পৃথিবীতে আদৌ নাই—যত দিন জন্মলাভ করিতে হইবে তত দিনই দুঃখ রহিবে। জন্ম লাভ না হওয়াই সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তির হেতু। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে আর জন্মলাভ না হয় তাহাই মানবের কার্য্য এবং জন্ম না হওয়া অর্থাৎ মোক্ষই মানবের লক্ষ্য। মোক্ষ আবার চতুর্ব্বিধ—সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ। ঈশ্বরের সহিত এক লোকে অর্থাৎ এক স্থানে বাস করাকে সালোক্য, ঈশ্বরের ন্যায় রূপপরিগ্রহ করাকে সারূপ্য, ও ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক হওয়ার নাম সাযুজ্য। অস্তিত্ব-শূন্যতার নাম নির্ব্বাণ। সুতরাং নির্ব্বাণবাদীদিগের মতে বিশ্বের ধ্বংসই প্রার্থনীয় এবং সাযুজ্যবাদীদিগের মতে ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি ঈশ্বরে লীন হওয়া প্রার্থনীয়। এই উভয় মতেই পাকতঃ বিশ্বের বিনাশই প্রার্থনীয় হইতেছে। সালোক্য ও সারূপ্যবাদীদিগের মতে বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থার ধ্বংস হইবে বটে কিন্তু সমস্ত পদার্থ ঈশ্বর-লোকে বা ঈশ্বর-স্বরূপে মিলিয়া থাকিবে। কাহারও কাহারও মত এই যে, মৃত্যুর পর মানবের আত্মা সকল আকাশমার্গে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত থাকে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে (কত কালে যে সে দিন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই) ঈশ্বর ঐ সকল আত্মার বিচার করিবেন। যে ব্যক্তি ইহকালে অসৎ কার্য্য করিয়াছে সে দণ্ড পাইবে এবং যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়াছে সে পুরস্কার পাইবে। এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে পরমেশ্বর দণ্ড দিতে না পারেন তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বিশ্বাস, খৃষ্টের শরণাপন্ন হইলে ঈশ্বর কাহাকেও দণ্ড দিতে পারেন না। সহস্র দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তি যদি খৃষ্টের শরণ লয় তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার কিছুই করিতে পারেন না। এইজন্য এই সম্প্রদায়ীগণ খৃষ্ট-উপাসনাকেই মুখ্য কর্ত্তব্য বলেন।

পরকালবাদ এইরূপ নানা অবান্তর ভাগে বিভক্ত হইলেও সকলের মূলগত ঐক্য আছে। অর্থাৎ সকলেই ইহকালের সুখ দুঃখের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া পরকালের সুখের প্রতি লক্ষ্য করিতে যত্নশীল। যে কার্য্য পরকালে মঙ্গলকর তাহা নিতান্ত

কষ্ট-সাধ্য হইলেও তৎসাধনে পরকাল-বাদীরা নিতান্ত যত্নবান হয়েন, এবং যে কার্য্য পরকালে দুঃখকর তাহা ইহকালের পরম সুখকর হইলেও তাহা করিতে তাঁহারা একান্ত বিরত থাকেন।

ইহকালবাদীরা পরকালের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পান না, এই জন্য তাঁহারা পরকালের সত্ত্বা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পরকাল সম্পূর্ণ মিথ্যা, সমস্ত ভোগাভোগ ইহকালেই মিটিয়া যায়। সুতরাং ইহকালের সুখই তাঁহাদের মতে পরম লক্ষ্য—তৎসাধক কার্য্য করাই এক মাত্র কর্ত্তব্য। পরকালের মিথ্যা সুখের আশায় ইহকালে দুঃখ করা তাঁহাদের মতে নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। পরকালবাদীর ন্যায় ইহকালবাদীও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কেহ কেবল আপাতত সুখ লাভ জন্য সচেষ্ট; কেহ ভবিষ্যৎ সুখের জন্য দুঃখ করিতে প্রস্তুত, কেহ কেবল আপন সুখের প্রতি দৃষ্টি করেন, কেহ অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বিবেচনা করেন, কেহ আপন সুখের জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির প্রাণ নাশ, চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, কেহ বলেন যখন দেখা যাইতেছে পরের অনিষ্ট করিলে পরের অত্যাচার জনিত দুঃখ সহ্য করিতে হয় তখন যেমন তেমন করিয়া পরের অনিষ্ট কর্ত্তব্য নহে, এমন ভাবে পরের অনিষ্ট করিতে হইবে যেন লোকে জানিতে না পারে, সেই জন্য তাঁহাদের মতে কৌশলপূর্ব্বক পরদ্রোহ (Policy) কর্ত্তব্য; কেহ কেহ বলেন যখন দেখা যাইতেছে স্বজাতি বা স্বদেশের অহিত সাধন করিলে পরস্পরে বিবাদ করিয়া সকলে দুর্ব্বল হয় ও তজ্জন্য সময় পাইয়া বহিঃশত্রু আসিয়া সকলের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাহাতে আপনারও কষ্ট হয়, তখন স্বজাতির অনিষ্ট করা অনুচিত, যে কার্য্য করিলে আত্মকলহ না হয় বরং একযোগে মিলিত হইয়া সবলে ভিন্ন দেশে অত্যাচার করিয়া তাহাদের সুখ হরণ করিয়া তদ্বারা আপনারা সুখী হইতে পারা যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে এই স্বার্থপরতার নাম—patriotism। ফলতঃ সকল ইহকালবাদীরই উদ্দেশ্য ইহকালের সুখ লাভ করা। কিন্তু ইহাঁদেরও একরূপ পরকাল ও স্বর্গ নরক আছে। কেন না, ইহারা মৃত্যুর পরবর্ত্তী পরকালের সুখের জন্য সমগ্র জীবনে দুঃখকর কার্য্য করিতে যত্নশীল না হইলেও ভবিষ্যৎকালের সুখের জন্য বর্ত্তমান সময়ে সমূহ দুঃখ করিতে প্রস্তুত, এবং পরকালবাদীর ন্যায় তাঁহাদের বহিঃস্বর্গ নরকে বিশ্বাস না থাকিলেও এই পৃথিবীকে তাঁহারা স্বর্গতুল্য করিতে পারেন এই বিশ্বাস তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত। এই সুখের আশয়ে তাঁহারা না করেন এমন কষ্টকর কার্য্য নাই বলিলেই হয়। নিয়ত পরিশ্রম করিয়া চেষ্টা করিলেই ভবিষ্যতে আপনারা সুখী হইব, অথবা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ সুখী হইতে পারিবেন এই আশায় তাহারা জলে, স্থলে, রৌদ্রে, বাতে, সাগরে, পর্ব্বতে সর্ব্বত্রে দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া থাকেন। কোন প্রকার মানাপমান বা সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করেন না। পরকালবাদীরা যেরূপ আশার বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করেন তাঁহারাও ঠিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন।

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিত সুখং
ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ।
সোঢ়া দুঃসহ শীত বাত
তপন ক্লেশান্ তপ্তং তপঃ॥
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং
নচ পুনর্ব্বিষ্ণোঃপদং শাশ্বতং।
যদ্যৎ কর্ম্মকৃতং তদেব
মুনিভিস্তৈস্তৈঃ ফলৈর্ব্বঞ্চিতং॥

শান্তিশতক। ৮

অর্থাৎ, ক্ষমাগুণে না হইলেও মুনিগণের ন্যায় আমরাও গৃহসুখ ত্যাগ করিয়া থাকি, সন্তোষের সহিত না হইলেও আমরাও তাঁহাদের ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকি. তপস্যার জন্য না হইয়া বিষয়ার্জ্জন জন্য হইলেও আমরা তাঁহাদের ন্যায় শীত বাত তপন ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি, এবং তাঁহাদের ন্যায় পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান না করিলেও আমরা নিয়ত অর্থের ধ্যান করিয়া থাকি; সুতরাং মুনিগণ যে সকল কার্য্য করেন আমরাও তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি কিন্তু তাঁহারা যে ফল প্রাপ্ত হন আমরা তাহা পাই না।

পরকালবাদীরা যেরূপ ঈশ্বর-সেবা করেন ইহকালবাদীরা সেইরূপ প্রকৃতির সেবা করিয়া থাকেন, কি করিলে প্রকৃতি তাঁহাদের প্রতি সদয় হইবে, অর্থাৎ কি করিলে প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি সকল দূরীভূত হইয়া ঈপ্সিত উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইবে নিয়ত তাঁহারা তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরকালবাদীরা যেরূপ সংপ্রবৃত্তিগণের অধীন হইয়া দান ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ইহকালবাদীরা সেইরূপ প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশায় দানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন; এবং পরকালবাদীরা যেরূপ পরকালীন সুখলাভের জন্য ইহজীবনে দুঃখ করিয়া থাকেন, ইহকালবাদীরা সেইরূপ ঈপ্সিত উন্নতিরূপ সুখলাভ বাসনায় চিরজীবন দুঃখ করিয়া থাকেন। কার্য্য উভয় সম্প্রদায়ই একরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না পরকালবাদীরা নৈরাশ্যজনিত মহৎ দুঃখ ভোগ করেন না। কারণ, তাঁহাদের কার্য্যফল মৃত্যু অন্তে পাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদের কৃত কার্য্যের ফল ফলিল কি না তাহা তাঁহাদের জানিবার উপায় নাই। কাজেই তাঁহাদের অকৃতকার্য্যতা জন্য নৈরাশ্য হয় না। প্রত্যুত আশাসুখ যথেষ্ট আছে কেননা তাঁহাদের মনে বিশ্বাস, তাঁহাদের কার্য্যের ফল অবশ্যই ফলিবে। কিন্তু ইহকালবাদীগণের ফলাকাঙ্ক্ষা ইহজন্মেই হইবার কথা। সুতরাং কার্য্যের সুফল না হওয়ায় অথবা ঈপ্সিত বিষয় লাভ করিয়াও কাঙ্ক্ষিত সুখ না পাইয়া নিয়ত নৈরাশ্যজনিত দুঃখে অভিভূত হয়েন এবং যে উন্নতির আশয়ে তাঁহারা এবম্বিধ বহুতর কষ্ট করিতেছেন তাহার অপ্রাপ্তিতে নিয়ত তাঁহারা দুঃখিত হইয়া থাকেন। পরকালবাদীগণ মৃত্যুকেও ভয় করেন না, তাঁহারা আহ্লাদের সহিত ইহকালের কষ্টকর জীবন পরিত্যাগ করিয়া পরকালের চিরন্তন সুখলাভ লালসায় করাল কালের সহিত আলিঙ্গন করেন। কিন্তু ইহকালবাদীগণের মৃত্যু যন্ত্রণার অবধি নাই। তাঁহাদের অস্তিত্বের শেষ হইতে চলিল, যে উন্নতির জন্য আজীবন কষ্ট করিলেন তাহা তাঁহারা পাইলেন না, আর চেষ্টা করিবারও অবসর নাই, অথবা অহরহ নিয়ত কষ্ট করিয়া যে সকল ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা ভোগ

করিতে পাইলেন না, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইল, এই মহাদুঃখে তাঁহাদের হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় পরকালের স্বর্গ নরকাদির প্রতি নিতান্ত আস্থাশূন্য। কিন্তু তাঁহারা উন্নতিবাদের একান্ত পক্ষপাতী। কি আস্তিক, কি নাস্তিক, কি পরকালবাদী, কি ইহকালবাদী আধুনিক শিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই বিশ্বাস যে, ঐহিক উন্নতিকর কার্য্য মানবের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য, ব্যক্তি বা জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেরই ঐ নির্দ্দিষ্ট রূপ উন্নতিকর কার্য্যে সচেষ্ট হওয়া উচিত। উন্নতিবাদের তাঁহারা এরূপ পক্ষপাতী যে, যে সকল সাধুপুরুষ ঐহিক ভোগ তুচ্ছ করিয়া ইন্দ্রিয়াদি সংযমনে দৃঢ় প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ ও উন্নতিবিঘাতক মানবের পরম শত্রু বোধ করেন। অধিক কি তাঁহাদের মতে উন্নতি করিবার জন্যই মানবের সৃষ্টি ও আবশ্যক।

আশ্চর্য্য এই যে, এই উন্নতি ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই এক রূপ। অর্থাৎ সকল ব্যক্তির চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তিনি জ্ঞানী, ধনী, বুদ্ধিমান, যশস্বী, দাতা, পরোপকারী, বিলাসী ও অট্টালিকা-বাসী প্রভৃতি হইবেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, চেষ্টা করিলেই সকলেই ঐরূপ হইতে পারেন, অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই। চেষ্টা করিলে ভদ্র অভদ্র, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান্, সবল দুর্ব্বল, সুস্বভাব কুস্বভাব, সকলেই নিউটন বা আর্য্যভট্ট, কালিদাস বা সেক্সপীয়ার, জগৎশেঠ বা রথচাইল্ড, এবং বুদ্ধ, খৃষ্ট বা চৈতন্য হইতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি সকলেই যশস্বী হইবে, তবে যশ করিবে কে? যদি সকলেই পরোপকার করিবে তবে উপকার লইবে কে? সকলেই যদি অট্টালিকাবাসী হইবে, তবে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবে কে? সকলেই যদি সুভোগ্য দ্রব্য ভোজন করিবে, তবে ঐ সকল প্রস্তুত করিবে কে? সকলেই যদি যানারোহণ করিবে, তবে বহন করিবে কে? সকলেই যদি পণ্ডিত হইবে তবে শিক্ষা করিবে কে? যদি বল, মানবের বিনা পরিশ্রমে পশু ও যন্ত্রবলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে ও সকলেই সমান সুখী হইবে, তাহা হইলে পরকালের স্বর্গে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? বাস্তবিক উহাও যেরূপ সুখ-কল্পনা-সম্ভূত, এই ইহস্বর্গেও সেইরূপ কল্পনা-সম্ভূত বলিতে হইবে। কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞান ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। পরকালের স্বর্গ অপেক্ষাও এই উন্নতিরূপ স্বর্গ অসম্ভব। কেন না পরকালের স্বর্গবাদীর মতে যাঁহার কার্য্যের ফল সেই ভোগ করিতে পায়; কিন্তু উক্ত প্রকার ইহকালের স্বর্গের ফল যদি কেহ পায় তবে কেবল চরম উন্নতি অবস্থা-প্রাপ্ত মানবেরা মাত্র প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কেহ তাহা পাইতে পারে না। কেন না চরম উন্নতি না হইলে পৃথিবী প্রকৃত সুখের স্থান হইবে না। সুতরাং সেই চরম উন্নতির সমকালবর্ত্তী লোকেরা ঐ সুখ বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় প্রাপ্ত হইবেন। অথচ আদিমকাল হইতে সেই সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অনন্তকোটী মানব যে উন্নতি চেষ্টায় শরীর মন পাত করিল তাহারা কিছুই ফল প্রাপ্ত হইল না। কি বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা! যদিও তর্কের অনুরোধে উহাকে সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়

তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই, যখন মানবের ঐরূপ চরম উন্নতির সময় আসিবে তখন তাহার কার্য্য থাকিবে কি? তখন ত আর উন্নতির প্রয়োজন থাকিবে না। কল্পনাতেও কি এরূপ উন্নতি অনুভব করিতে পারা যায়? কখনই নয়।

বাস্তবিক এইরূপ উন্নতি কার্য্য মানবের এক মাত্র বা আদৌ উদ্দেশ্য নহে, এবং ঐহিক উন্নতি সুখের এক মাত্র বা আদৌ কারণ নহে। উন্নতি ব্যতিরেকে কি সুখ হয় না? যদি মানব স্বভাবতঃ বা স্বতঃ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে তাহার উন্নতির প্রয়োজন কি? সুখের বর্দ্ধন জন্য উন্নতির আবশ্যক, নয়, দুঃখ বা অভাব নাশের জন্যই উন্নতির আবশ্যক হইয়াছিল? যে আদিম অবস্থায় মানব কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করে নাই সে সময়ে মানবের কিছুমাত্র উন্নতির আবশ্যকই হয় নাই। প্রাকৃতিক অবস্থা তাহার যথেষ্ট তৃপ্তিকর ছিল। যদি মানবের কোনরূপ অভাব না হইত তাহা হইলে আদৌ উন্নতির আবশ্যক হইত না। তাহা হইলে পর্ব্বত গুহার পরিবর্ত্তে অট্টালিকার সৃষ্টি হইত না, নির্ঝরিণীর পরিবর্ত্তে পুষ্করিণী খণিত হইত না, সুপক্ক ফলের পরিবর্ত্তে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত না, অধিক কি স্বয়মাগত সেচ্ছোপরত রমণীমণ্ডলী উপভোগের পরিবর্ত্তে একরমণী বিবাহ প্রথারও সৃষ্টি হইত না। কিন্তু কালে মানববংশ যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল তত নৈসর্গিক পদার্থের অভাব ঘটিতে লাগিল, তাই মানব চেষ্টা করিয়া দুঃখ নিবারণের উপযোগী পদার্থের সদ্ভাব বৃদ্ধি করিতে লাগিল। নচেৎ বিলাসিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য বা নির্দ্দিষ্ট অসভ্যকালে অপ্রাপ্য, নিতান্ত আবশ্যক, সুখকর কোনও অবস্থা বা পদার্থ আবিষ্কার করণাভিপ্রায়ে উন্নতির চেষ্টা হয় নাই। অতএব যাঁহারা পৃথিবীর উন্নতিসাধন করা মানবের মুখ্য কার্য্য মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত।

ফল কথা, কি পরকালবাদী কি ইহকালবাদী সকলেরই মূল উদ্দেশ্য সুখ লাভ বা দুঃখ নিবৃত্তি। বাস্তবিক ঐ উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন মানবের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিবার কোন অভিপ্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোন সম্প্রদায়ী ব্যক্তিই মুখ্য সুখের উদ্দেশে কার্য্য করেন না। সকলেই বিষয় লাভ উদ্দেশে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বর্গলিপ্সুরা স্বর্গরূপ বিষয়াভিলাষী, মোক্ষ-লিপ্সুরা মোক্ষরূপ প্রার্থনীয় বিষয়ের অভিলাষী। উন্নতি বা ঐহিক বিষয়-লিপ্সুরা কল্পিত সুখকর পদার্থ বা অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তির অভিলাষী। কিন্তু এতৎ সমস্ত বিষয়ই কিছু মানবের অভিলষনীয় নহে, সুখই প্রকৃত অভিলষনীয়। ঐ সকল বিষয় পাইলেই সুখ পাইব বিবেচনা করিয়াই মানবগণ ঐ সকল বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ সকল বিষয় উদ্দেশ্যসুখ দানে সমর্থ কি না তাহা কেহ বিবেচনা করে না। সুতরাং তাঁহারা সুখের অভিলাষী হইলেও প্রকৃত সুখের অনুসরণ না করিয়া বিষয় বিশেষেরই অনুসরণ করেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিষয় বিশেষের সহিত কখনও সুখ সম্বন্ধ নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে কখনই এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তিবিশিষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীব ও মানবের সৃষ্টি হইত না এবং তাহা হইলে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও পরস্পর

বিপরীত ভাবাপন্ন কার্য্যও ভাবাবলী দৃষ্টি-গোচর হইত না। যখন দেখা যাইতেছে এক-জনের যে শক্তি প্রবল অন্যের সে শক্তি দুর্ব্বল,তখন অবশ্যই বলিতে হইবে সকলেই নির্দ্দিষ্ট একরূপ বস্তুর প্রার্থী নহে। এবং যখন দেখা যাইতেছে রিপু চরিতার্থে যেমন সুখ হয়, রিপু দমন করিলেও সেইরূপ সুখ হয় তখন অবশ্যই বলিতে হইবে এক রূপ কার্য্য সকল সময়ে সুখকর নহে। এই সকল দেখিয়াই ঋষিগণ বর্ণধর্ম্ম, যুগ-ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, সকাম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম, প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবস্থা, কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। তদনুসারে যাঁহার যেরূপ সুখের প্রকৃত আবশ্যক তিনি সেইরূপ সুখের উপ-যোগী কার্য্য করিবেন। সুখই মানব-কার্য্যের উদ্দেশ্য সুতরাং বিষয় কামনা শূন্য হইয়া সুখ মাত্র লাভের চেষ্টা করাই মান-বের কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষির আবিষ্কৃত নিষ্কাম ও বর্ণ ধর্ম্ম চর্চ্চাই ইহার এক মাত্র উপায়। অর্থাৎ শক্তি, অবস্থা, প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া উপযোগী বিষয় অবলম্বনে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার ফলাফল তুল্য সুখকর জ্ঞানে মনের শান্তি স্থাপন করিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্কাম ধর্ম্ম ও বর্ণ ধর্ম্ম প্রকরণ পাঠে জানা যাইবে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

প্রেমতীর্থ।

আঁধার ঘনায়ে আসে,
যে যাহার যায় বাসে,
খেলা ছাড়ি শিশু ছোটে ঘরে;
সারি অন্য গৃহস্থালি,
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালি
কুলবধু দ্বার রুদ্ধ করে।
দুয়ার ভেজায়ে দিয়ে,
শিশুটীরে কোলে নিয়ে
বসে আসি প্রদীপের ধারে,
স্তন দিয়ে পুত্র-মুখে
কতই কতই সুখে
ধীরে তার বদন নেহারে!
এক স্তন চোষে ঠোঁটে,
অন্যটিরে হাতে খোঁটে,
হেসে শিশু মার পানে চায়;
কি আনন্দ জননীর,
নয়নে উথলে নীর,
বুকে চেপে মুখে চুমো খায়।

গেছে স্বামী, নাহি আসে,
একা নারী শূন্য বাসে —
অবলম্ব শিশুটি তাহার;
সেই সে সাথের সাথী,
সেই সে ব্যথার ব্যথী,
সেই সে সকল জুড়াবার।
মাতা যত খায় চুমো,
বলে 'চাঁদ ঘুমো ঘুমো,'
শিশু তত হেসে কুটোকুটি!
কি বলে না বোঝা যায়,
কত আধ কথা কয়,
কভু তোলে কচি হাত দুটি।
দীপালোক ছায়া পড়ে,
দেয়ালে সে হাত নড়ে,
বড় খুসী শিশু তাহা দেখে;
হাসে আর ফিরে চায়,
ছায়া ধ'রে ধরিতে যায়,
কোল হ'তে ওঠে বেঁকে বেঁকে।

আনন্দে অধীরা মাতা,
লইয়া কাজল-লাতা
ধরে দীপ-শিখার আগায় ;
মৃদু নড়ে দীপ-শিখা,
ভাঁজে ভাঁজে পড়ে রেখা,
শিশু শুয়ে মার মাই খায়।
খাওয়া হলে দুধ-টুক,
অঞ্চলে মুছায়ে মুখ
ভালে টীপ কাটে ধীরে ধীরে ;
কাজল পরায়ে চোখে
মুখানি তুলিয়া দেখে,
সাধে চুমো খায় ফিরে ফিরে।
নীরব নির্জ্জন গেহ,
সে দৃশ্য না হেরে কেহ,
একা দীপ দেখে আর হাসে ;
দুয়ারের ফাঁক বেয়ে
দূর বায়ু আসে ধেয়ে
প্রেমতীর্থ দরশন আশে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কর্ণধার। ১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি ক্ষুদ্রকায় ডিমাই তিন ফর্ম্মার মাসিক পত্র। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। লেখকগণের নামের তালিকায় অনেক গুলি সুলেখকের নাম দেখিলাম। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

দীপিকা। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। ১ম ও ২য় সংখ্যা। 'সুলভ সাহিত্য প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।' আকার ডিমাই দুই ফর্ম্মা মাত্র। কোন আড়ম্বর নাই। 'অবতরণিকাটী' বেশ হইয়াছে। কিন্তু ২য় সংখ্যায় কতকটা 'হাম্‌বড়াই' দেখা গেল।

গান ও গল্প। পাক্ষিক পত্র। শ্রীমতিলাল বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা। যে দেশে বঙ্গদর্শন, বান্ধব চলিল না, সে দেশের লোকের মতি গতি বুঝিয়া মতি বাবু এ মন্দ ফন্দি বাহির করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহার লেখা ও খোরাক দুই জুটিবে। ছাপা বেশ, মূল্য ও সুলভ। আমরা সম্পাদককে অনুরোধ করি—প্রতি সংখ্যায় ৩।৪টী গল্প টুকরা টুকরা প্রকাশ না করিয়া, প্রতি সংখ্যায় একটী বড় গল্প ক্রমশঃরূপে, আর একটী গল্প সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়। প্রতি সংখ্যাই আসর জমাইতে পারে। আর, গানগুলির প্রতি একটু নজর রাখা উচিত। গান সুরে জমে, অনেক ভাল গান পড়িতে তেমন ভাল লাগে না। গান সুরে মিলিল কি না, সে দিকে ধরাকাট না করিয়া, গানে কবিত্ব আছে কি না দেখা উচিত।

মহাপ্রস্থান। বা পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ। শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অংশ। মূলে বা কাশীদাসে ইহা অতি সুন্দর ও উপাদেয়, বিবিধ কবিত্ব ও প্রকৃতিবর্ণনায় পূর্ণ। এ অংশটুকু নাটকে ফলান যায় কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বোধ হয় ইহা কাব্যের বা মহাকাব্যেরই বিষয়। স্থানে স্থানে মন্দ হয় নাই।

শতদল। শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। শতদল ফুটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ছায়ায়। উপহারও দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে। "গ্রামস্থ শ্মশান ঘাটে" প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা বেশ হইয়াছে। ছায়া নাই। একটু রহিয়া ফুটিলে, ইহাতে কবিত্বের সৌরভ আরও যে অধিকতর পরিমাণে দেখিতে পাইতাম, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

মায়াবিনী। (পদ্য) শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত। দর্শন বিজ্ঞান চাই. কবিতায় দেশ ভরিয়া গেল, কবিতায় কি হইতেছে, ইত্যাদি কয়েকটা পচা বুলিতে সমালোচক-গণ নবীন কবিদিগকে হাড়ে মাটি করিবার চেষ্টা করেন। যেখানে সেখানে, যাহাকে তাহাকে এ কথাগুলা বলা ভাল নহে।

নৃত্যকৃষ্ণ বাবুর ভাষা বেশ, স্থানে২ ভাবের বেশ স্ফূর্ত্তি আছে; উৎসাহ পাওয়া উচিত।

মনোমোহন-গীতাবলী। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত সমস্ত গীতগুলির একত্র সঙ্কলন। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক।

মনোমোহন বাবুর "দিনের দিন" প্রভৃতি অনেকগুলি গান দেশ-বিখ্যাত। তাঁহার সাহিত্য-সংসারে আর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সকলেই জানেন মনোমোহন বাবুর প্রকৃত ক্ষমতা আছে। সঙ্গীত-রসজ্ঞ পাঠক-গণ ইহা পাঠে যথেষ্ট আমোদ পাইবেন। হাপ আখড়াই, কবি, দাঁড়া কবি, রঙের গান ইত্যাদি হইতে তাঁহার প্রণীত নাটক-গুলির সমস্ত গান ইহাতে সন্নিবেশিত হই-য়াছে। গ্রন্থারম্ভে মনোমোহন বাবু হাপ-আখড়াইয়ের একটী অনতি বিস্তৃত সুন্দর ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহা সকলেরই জানা উচিত।

বসন্ত নির্ণয়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গঙ্গো-পাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকখানির নাম দেখিয়া আমরা প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম কোন নবীন লেখকের লিখিত বসন্ত ঋতু বর্ণন— সেই পিকরাজের মর্ম্মস্থল-স্পর্শী পঞ্চম স্বরে কুহু ডাক, সেই মলয় মারুত-হিল্লোল, সেই বিরহী বিরহিণীদিগের আক্ষেপ প্রভৃ-তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু পাঠ করিয়া দেখি-লাম তাহার বিপরীত। ইহা এক খানি আধ্যাত্মিক কাব্য। ইহার উদ্দেশ্য অন্য-বিধ, লক্ষ্য—দেহ রাজ্য, দৃষ্টি—আধ্যাত্মিক জগতে। পুস্তক খানি ভাবুক পাঠকদিগের নিকট বড় সুন্দর জিনিষ। এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জগতের ক্ষণস্থায়ী—"বসন্ত" বর্ণনা নহে। ইহা দেহ রাজ্যের বিষয় লইয়া আধ্যাত্মিক ভাবে বসন্তের বর্ণনা করা হই-য়াছে। কবি পরিভাষায় লিখিয়াছেন, 'যাহাতে সাধারণ লোকদিগের চিত্ত হইতে মনসিজ ও রতির অবিশুদ্ধ ভাব তিরোহিত হয় ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা কাম ও রতির যথার্থ অর্থ অবগত না হইয়া পুরাণকল্পিত সাকার রূপে দৃঢ় বিশ্বাস করত চিত্তে এক প্রকার বিকৃত ভাবের আবি-র্ভাব করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে তাঁহা-দের সেই ভাব বিনষ্ট হয় এবং তদ্বিপরীতে কাম ও রতিকে প্রকৃতি মাতার চির সহচর ও জীবের মুক্তির প্রধান কারণ বলিয়া জানিতে পারেন তদ্বিষয়ে সাহায্য করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।" পাঠকগণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। কবি অতীব নিপুণতার সহিত আপনার আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া-ছেন। তাঁহার রচনায় বহুল গবেষণা শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ বিন্যা-সের পারিপাট্য অত্যন্ত সুন্দর। আমরা এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবময় কাব্য অতি অল্পই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি যদিও পৃষ্ঠা-সংখ্যায় অধিক, তথাপি পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। যদি যথার্থই শব্দার্থ অবগত হওয়া যায় তাহা হইলে কাব্য খানি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করা যায় তাঁহার রচনা ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবি-দিগের ন্যায় নানার্থ-পূর্ণ। কল্পনায় বেশি স্থান নাই বলিয়া আজ তাহার কোনও উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। কাব্য-প্রিয় সহৃদয় পাঠকদিগের এক একবার এখানি পাঠ করা উচিত।

রাজর্ষি।*

পাতে ভাল দেখিয়া যদি কোন গ্রন্থকে লিতে হয়, তবে এ গ্রন্থখানি নি-াল। যেরূপ উপকরণে ইহার প্র-গ রচিত, তদ্রূপ উপকরণে যদি দ্বিতীয় ভাগ গঠিত হইত, তাহা গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় সামগ্রী কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা সে উপাদেয় সামগ্রী লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। যাহা হউক, গ্রন্থের প্রথম ভাগ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আয়তনে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ হয়, তাহা প্রায় নাটকীয় গুণে অলঙ্কৃত হইয়া পড়ে। র প্রথম ভাগে তাহাই ঘটিয়াছে। কি -যোজনা, কি ঘটনা-সংস্থান, কি হৃদয়-না, সর্ব্বাংশেই এ ভাগকে নাটকীয় পরিপূর্ণ করিয়াছে। বালিকা 'হাসি' নাটকের প্রথম সূচনা করিয়া দিল। াকার তরল হৃদয় ভুবনেশ্বরীর নববলি-ক্ত স্রোতে সহসা সিহরিয়া উঠিল। সেই কুরিত যেন তাড়িৎ গুণে রাজার হৃদয়কে শাদি দিল। সেই সিহরণ বালিকার স মজ্জায় আঘাত করিল। বালিকা করাক্রান্ত হইয়া, অনন্ত শয্যায় বিশ-াই হইল। তদবধি রাজার মনে দ্রর বেদনা বোধ হইল। তাঁহার হৃদয়-ন একদা খুলিয়া গেল। একটি বসন্ত-জ তাঁহার হৃদয়ে প্রথম প্রস্ফুটিত হইল। সহসা যেন বসন্তানিল হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। হৃদয়-তরঙ্গ ফিরিয়া গেল। তাহার স্রোত বিপরীত দিকে বহিল। আজি তিনি যেন আর এক রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। এ চমক এত সহসা ঘটিল, যে তাহাতে নাটকীয় ভাবের বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এইরূপ হৃদয়পরিবর্ত্তনে তিনি যেন এক মধুময় প্রেমরাজ্য দেখিতে পাইলেন। সেই হৃদয়ে একদা রাজ্যমধ্যে বলিদান উঠাইয়া দিলেন।

একদিন রাজার হৃদয় যেরূপ হঠাৎ ফিরিয়া গিয়াছিল, সেরূপ কয় জন লোকের কয় দিন ঘটে? কিন্তু আমাদের রাজার একদিন একরূপ ঘটিয়া থামে নাই। প্রেম একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, তাহাকে ক্রমেই প্রসারিত করিতে থাকে। গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় তদ্রূপ ক্রমশই প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি যখন রাজ্যত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া লোকালয়ের বাহিরে পর্ব্বত-শিখরে বসিয়া নির্জ্জনের সুখ ও পবিত্রতা, এবং পার্ব্বত্য দেশের শোভা সম্ভোগ করেন, এমত সময় দেখিলেন "নির্জ্জনে ধ্যান-পরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহ-ধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে--যে তাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না, তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোন অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব, বলিয়া তাঁহার পর্ব্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।" এক্ষণে রাজার

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৯৩।

অন্তররাজ্য কিরূপ প্রসারিত হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার এইরূপ ছবি আঁকিলেন। 'পূর্ব্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত, সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখ শোক দারিদ্র, বিবাদ, বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমাদের সকলের জীবনেই কি কোন না কোন দিন এমন এক অভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাত উদিত হয় নাই, যে দিন সহসা এই হাস্যক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মত, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকসিত দেখিয়াছি। যে দিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোন প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যে দিন এক অপূর্ব্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চির যৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।"

এইরূপ একদিন গোবিন্দ মাণিক্যের হৃদয়ে যখন প্রথম বসন্ত উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি রাজাদেশ প্রচার করিলেন যে, যে রাজ্যমধ্যে বলি দিবে, তাহার নির্ব্বাসন হইবে। এ কথা শ্রবণমাত্র রাজ-পুরোহিত রঘুপতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজ্যের যে তিন বল থাকে,—ধর্ম্মবল, অর্থবল, ও লোকবল,—রাজ-পুরোহিত তাহার অন্যতম। তাহার হাতে ধর্ম্মবল। রাজার মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলে যখন তিনি নিষ্ফল হইলেন, তখন তিনি রাজারই বিপক্ষে নিজবল প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজ্যমধ্যে এখন দুইটি বলের দ্বন্দ্ব বাঁধিল। এক দিকে ধন ও জন বলে বলীয়ান রাজা, অন্য দিকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ রাজ-পুরোহিত। এ দ্বন্দ্ব বড় সাধারণ দ্বন্দ্ব নয়। পুরোহিত নিজ বলে সমগ্র প্রজামণ্ডল ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। রাজভ্রাতা, ভীতস্বভাব ও দুর্ব্বলমতি নক্ষত্ররায় এবং সেবক জয়সিংহকে নিজ অভিসন্ধি সাধনের উপায় স্বরূপ স্থির করিয়া কোন মতে রাজাকে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঘোর দ্বন্দ্ব বাঁধিলে রাজাও নিজ আদেশ রক্ষার জন্য স্থির ও অচঞ্চল রহিলেন। তিনি কিছুতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। যদিও অন্তরে অন্তরে মনুষ্য-প্রেমে তাঁহার হৃদয় গলিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে তিনি আগ্নেয়গিরির ন্যায় অটল রহিলেন। শুধু অটল নহে, তিনি শুদ্ধ ক্ষমা-অস্ত্র দিয়া যেরূপে রঘুপতির বাণ সকল ব্যর্থ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার বিনীত গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ করিল। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের সৎ সাহসে পুষ্ট হইয়া অতি তেজস্বী হইয়া উচ্চ নির্ভীক হৃদয়ে শত্রু সমক্ষে সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিতেন। নিভৃতালয়ে জয়সিংহ তাঁহাকে ক... আসিয়া, শিশুর সহিত তাঁহার প্রেমক্রীড়া পরাভূত এবং তাঁহার বিশ্বস্তচিত্তে প্রশান্তভাবে পরাস্ত হইয়া নিষ্কোষিত দূরে নিক্ষেপ করিল। যে ভ্রাতৃস্নেহে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, সেই স্নেহে ভ্রাতাকে

করিয়া তাঁহাকে প্রতিকূলাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। এ সকল দৃশ্যাভিনয়ে পাঠকের হৃদয় নিশ্চয় সমবেদনায় উদ্বোধিত হয়। পাঠক নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ হয়েন।

ওদিকে রঘুপতিও কম নন। তিনি কিছুতে দমিবার বা অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহেন। এক প্রকরণ বিফল হইলে, তাঁহার বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তি অমনি অন্য উপায় তৎক্ষণাৎ নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। কিরূপে নিজ বলকে প্রয়োগ করিতে হয়, কিরূপে লোককে গড়িতে ও বাঁধিতে হয়, তিনি সে কৌশল বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার এক একটি কৌশল-প্রয়োগের অভিনয় যেন নাটকীয় দৃশ্যে প্রতীত হয়। উপস্থিত বুদ্ধি প্রভাবে তিনি এরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতেন, যাহাতে হঠাৎ বিলক্ষণ ফল ফলিত। এই কৌশলে তিনি যাহা আযোজন করিয়া আনিতেন, রাজা নিজগুণে তাহা ব্যর্থ করিয়া দিতেন। রাজার ধীরতা বিপদকেও আশঙ্কিত করিত, তাঁহার স্থিরতা জগৎকে স্তব্ধ করিত, তাঁহার বিশ্বস্তচিত্ততা শত্রুকেও মুগ্ধ করিত, এবং তাঁহার প্রশান্তভাব চারিদিকে শান্তি বিস্তার করিত। তিনি ধর্ম্ম-সাহসে সাহসী হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে শত্রুকে দমন করিতেন। তাঁহাকে দেখাইত, তিনি একলাই এক মহাবল। সহ্য অদ্রির অঙ্গে সমুদ্রের কত উত্তাল তরঙ্গ লাগিতেছে, অদ্রি অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান। রঘুপতির যত তরঙ্গ সে অঙ্গে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, রঘুপতি তত নূতন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া সেই অঙ্গে আবার বিক্ষেপ করিতেছেন। ইহাতে রঘুপতির অন্তর্বলের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যেন অনুমান করিতে পারি না, রঘুপতি হৃদয়ের কি প্রচুর বল, কি প্রচুর ক্ষমতা! এ বল উপর্য্যুপরি গোলাবর্ষণ করিতে পারে। এ বল শীঘ্র ক্ষয় হইবার নয়। কতবার তুমি রঘুপতিকে পরাস্ত করিবে? কতবার তুমি রঘুপতিকে দমাইয়া দিবে? রঘুপতি নিজ হৃদয়প্রাচুর্য্য-ক্ষমতায় আবার তখনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছেন।

আর জয়সিংহ! তোমার প্রকৃতি কি মধুর! অল্পে অল্পে সেই মধুরতা কেমন প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল। তোমার হৃদয়কন্দর সরল ভক্তিতে [বুঝি] পরিপূর্ণ। শুধু ভক্তি নহে, প্রেমেও পরিপূর্ণ। সেই সরল ভক্তি যখন জয়সিংহকে অসৎ পথে লইয়া যায়, হৃদয়ের সাধুভাব ও প্রেম তখনি উদ্রিক্ত হইয়া তাহাকে মুক্তিপথে আকর্ষণ করে। রঘুপতি তাহাকে নিজ কৌশলে আবদ্ধ করিয়া যখন বধ-কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন, অমনি তাহার হৃদয়-উৎস উৎসারিত হইয়া তাহাকে সেই নৃশংস ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। তিনি একবার গুরুভক্তিতে সেই নৃশংস সংকল্পে অটল হইয়া উঠিয়াছেন, অমনি তাহার হৃদয় যেন দ্বিগুণ বলে জাগরিত হইয়া সে সংকল্প হইতে তাহাকে বিচলিত করিয়াছে। তিনি দেবতাকে প্রেমের প্রতিমা ভাবিয়া সরল ভাবে ভক্তি করিয়া আসিতেছিলেন, সেই প্রেমভূমি রঘুপতি যখন টলাইয়া দিল, তাহার ভক্তিরাজ্য একেবারে টলিয়া উঠিল।" প্রেমাস্পদ না পাইলে, ভক্তির যে দাঁড়াইবার স্থল নাই, জয়সিংহ তাহা বিলক্ষণ প্রতীত করিয়া দেয়। ভক্তি বড়, কি প্রেম বড়, জয়সিংহের চরিত্রে ইহারই দ্বন্দ্ব। তিনি এ দ্বন্দ্ব সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন— প্রেমপ্রাচুর্য্য তাঁহার যদ্ধ ভক্তিকে টলাইয়া

দিয়াছে। জয়সিংহ এই চরিত্র-গৌরবে আমাদিগের নিকট বড় মধুর বোধ হইয়াছিল। যেন এ পাপ সংসার তাঁহার প্রেম বিকাশের যোগ্যস্থল নয় বলিয়া তিনি সে সংসার সহসা পরিত্যাগ করিলেন। ইহ সংসার তাঁহার অন্তরে মহা দ্বন্দ্ব বাঁধাইয়া দিয়া তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে শান্তিকে একেবারে তাড়াইয়া দিয়াছিল। শান্তিবিরহিত হইয়া তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই শান্তি পাইবার জন্য তিনি যেন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

গ্রন্থের প্রথম ভাগ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এই মুখপাত ভাল দেখাইয়া গ্রন্থকার যেন আমাদের ক্ষুধা আরও উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সে ক্ষুধা নিবারণ হইল না, এই আমাদের দুঃখ।

গ্রন্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইলে আমরা এক ভিন্ন রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। এখানে আর এক নূতন দেশ—নূতন দেশে নূতন লোক। বলিতে গেলে দ্বিতীয়ভাগ হইতে আমাদের আর এক নূতন উপন্যাস আরম্ভ করিতে হইল। অনেক উপন্যাসেরই প্রারম্ভ-ভাগ তত সরস হয় না। তাহাতে রসের ঈষৎ সঞ্চার মাত্র হইতে থাকে। ক্রমে গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে সরস হইয়া পড়ে। এ গ্রন্থে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। ইহার প্রথমভাগ অত্যন্ত সরস, তার পর গ্রন্থ ক্রমশঃ নীরস হইয়া পড়িয়াছে। যে স্থলে রঘুপতির সহিত নক্ষত্র রায় নির্বাসিত হইল, বলিতে গেলে, সেই স্থলেই গ্রন্থ এক প্রকার শেষ হইয়াছে। তার পর, গ্রন্থ ক্রমশঃ নীরস হইয়া আসিয়াছে। তার পর, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় চক্ষু বুলাইয়া জানিলাম কি না, রঘুপতি মন্ত্রণা করিয়া নক্ষত্র রায়কে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিলে গোবিন্দমাণিক্য সে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। দুই কথায় এটুকু বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। তজ্জন্য গ্রন্থকে অনর্থক এত বিস্তৃত করিবার প্রয়োজন ছিল না। যদি দেখিতে পাইতাম, এই বিস্তারিত ক্ষেত্র মধ্যে ঔপন্যাসিক পাত্রগণের অধিকতর চরিত্রস্ফূর্ত্তি হইয়াছে, অথবা গ্রন্থ ক্রমশই সরস হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সফল হইত। রঘুপতির নির্বাসন হইতে গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসন ত্যাগ পর্য্যন্ত রাজর্ষি-চরিত্রে একটিমাত্রও রেখাপাত হয় নাই। আমরা যেখানে রাজাকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম সেই খানেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। রাজার হৃদয়ে যে প্রেমাঙ্কুর প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, কই, সে অঙ্কুর আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না! রাজকার্য্যের দুই বৎসরে তাঁহার প্রেমের বিস্তার কিছুই হয় নাই। তাঁহার সংসারের দিকে চাই, দেখি, তাঁহার পুত্র নাই, কলত্র নাই, দাস দাসী নাই, আত্মীয় নাই, রাজপরিবারের কেহই নাই। পরিবার ক্ষেত্রেই মানুষের প্রেমরাজ্য ক্রমশঃ প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। গোবিন্দমাণিক্যের সে ক্ষেত্র মরুভূমি প্রায় ছিল। ধার করা একটি পালিত শিশুমাত্রে কি আমাদের সমুদায় পারিবারিক স্নেহ ও বৃত্তি সম্পৃক্ত হইতে পারে? তিনি পারিবারিক ক্ষেত্র কিছুই কর্ষিত করেন নাই। আবার দেখুন, গোবিন্দমাণিক্য প্রথমভাগে যেরূপ চরিত্রদৃঢ়তা, সৎসাহস, দৃঢপ্রতিজ্ঞা, অপক্ষপাতিতা, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তার পর দুই বৎসর মুঙ্গ-

কার্য্য পরিচালনে কি তাহার কিছুরই স্ফূর্ত্তি হয় নাই? গ্রন্থকার ঘটনাবলিকে এরূপে সাজাইতে পারেন নাই, যাহাতে তিনি সে সকল গুণের অধিকতর পরিচয় দিবার স্থল পান। ঘটনা-যোজনায় তাঁহার সৃষ্টিশক্তি অতি দীন। শুদ্ধ রাজর্ষি সম্বন্ধে আমরা বলি না। রঘুপতির বুদ্ধিকৌশল, কুচক্রিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৃঢসংকল্প ও অধ্যবসায়, প্রভৃতি গুণ আমরা প্রথমভাগে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, দ্বিতীয়ভাগে তাহার অধিক দেখি নাই। দ্বিতীয়ভাগে রঘুপতি নিজ অভিসন্ধি সাধন জন্য যত কৌশল করিয়াছিল, সে সমস্ত কৌশলই বিফল হইয়াছিল। তিনি কেবল রাজ-প্রদত্ত অর্থবলে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৌশল যদি অকৃতকার্য্য হয়, তবে কি প্রয়োগকারীকে তত কৌশলী বলা যায়? যে কৌশল সফল না হয়, সে কৌশল-প্রয়োগে লোকে অনেক সময় হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। মোগল-শিবিরে রঘুপতিও কিয়দংশে হাস্যাস্পদ হইতেছিলেন, এমত সময় অর্থবল তাহাকে রক্ষা করিল। আর, দুর্ব্বলমতি, ভীতস্বভাব, অসারচিত্ত ও বিলাসী নক্ষত্ররায়কে পরিচালনে যে সামান্য কৌশলের পরিচয় হইয়াছিল, তাহাতে রঘুপতির বিশেষ বাহাদুরি হয় নাই, এবং তাহার চরিত্রও কিছু উন্নত হয় নাই।

দ্বিতীয় ভাগে কেবল নক্ষত্ররায়ের চরিত্র কিছু পরিস্ফুট হইয়াছে। নক্ষত্ররায় এবং গোবিন্দমাণিক্য উভয়ই রাজপুত্র, উভয়েরই হাতে রাজৈশ্বর্য্য। নক্ষত্র সেই ঐশ্বর্য্য আপনার ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যয় করিয়া একজন ঘোর বিলাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য সেই ঐশ্বর্য্যধামে ও সেই ভোগ এবং প্রলোভনপূর্ণ সংসারে কেমন প্রশমিতচিত্তে ঋষির ন্যায় ত্যাগী ও নির্লিপ্ত হইয়া এক উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় করিতেছিলেন তাহা গ্রন্থকার যদি পাশাপাশি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে পাপচিত্রের কলঙ্ক এবং পুণ্যচিত্রের পবিত্রতা শত াংশে বর্দ্ধিত হইত। অনেক উপন্যাসে পাপচিত্র থাকে বটে, কিন্তু সুলিখিত উপন্যাসের ধর্ম্ম এই, তাহাতে পাশাপাশি পুণ্যচিত্রও অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হয়। অন্ধকার ও আলোকের একত্রে এইরূপ সমাবেশ হইলে অন্ধকারকে দ্বিগুণ অন্ধ দেখায় এবং আলোককে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলে। সুলিখিত উপন্যাসের আর একটি ধর্ম্ম এই, তাহাতে পুণ্যচিত্রের এত ভাস্বর ছবি অঙ্কিত হয় যে, তাহাতে পাপচিত্রকে অনেকাংশে মলিন করিয়া ফেলে। পাপ, পুণ্যের প্রবলতায় ডুবিয়া থাকে। এ গ্রন্থে এ দৃশ্যের কিছুই হয় নাই। নক্ষত্ররায়ের বিলাসচিত্র দ্বিতীয় ভাগের নগ্নক্ষেত্রে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে ঋষিচরিত্র অঙ্কিত নাই। তাহার পাপচিত্রের মলিনতা পুণ্যচিত্রে বর্দ্ধিত হয় নাই। এরূপে এ পাপচিত্র দেখাইবার প্রয়োজন কি ছিল? এ চরিত্র এত উচ্চ নহে যে ইহার গরিমা প্রকাশ করিতে হইবে? ফলতঃ এ চিত্র অতি সামান্য। গ্রন্থকার এ চিত্র আঁকিতে গিয়া সহরের বড় মানুষের একটি বয়াটে ছেলের একখানি ফটোগ্রাফ দিয়াছেন। তাহা তো আমরা দুবেলা দেখিতেছি। সে ফটোগ্রাফ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আর বেশি কি ফল হইবে?

গ্রন্থের নাম রাজর্ষি। সুতরাং এ গ্রন্থে রাজর্ষি চরিত্রের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও সু-অঙ্কিত

চিত্রের সকলেই প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। আমরা রাজর্ষি জনকের কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তিনি কিরূপে ঋষির ন্যায় রাজকার্য্য চালাইতেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। সুতরাং আমাদের অনুমান করিতে হইয়াছে যে, যে রাজভোগ ভোগের চূড়ান্ত, জনকরাজ সেই রাজভোগ মধ্যে অবস্থিত হইয়া অনাসক্ত ও ত্যাগী ঋষিচরিত্র সংগঠন করিয়া থাকিবেন, এবং সেই ভোগের মধ্যে নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। যে অনুমান জনকের কল্পনা পূর্ণ করিয়াছে, সেই অনুমান রাম রাজত্বেরও কল্পনা পূর্ণ করিয়াছে। রামচন্দ্রকে ব্যাস মহাভারতে ব্রহ্মার মুখ দিয়া "রাজর্ষিধর্ম্মা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, শুনিয়াছি সেই রাজর্ষি-প্রতিম রামের রাজ্য বড় সুখের রাজ্য ছিল। রাজর্ষি রাম তাহা কিরূপে এত সুখময় করিয়াছিলেন, রামায়ণে যদিও তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ নাই, কিন্তু সেই কাব্যের ঘটনাবলি-অঙ্কিত সরস চিত্রে আমাদের কল্পনা এত পূর্ণ হয় যে, আমরা অনুমানে যেন রাম-রাজত্বের সুখানুভব করিতে পারি। এই সমালোচ্য গ্রন্থেও আমরা নীরস ঐতিহাসিক বিবরণ খুঁজি নাই, কিন্তু রাজর্ষির ঔপন্যাসিক চিত্র দেখিতে চাহিয়াছিলাম। গ্রন্থকার যাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রে প্রথমে তিনি যেরূপে আঁকিলেন, তাহাতে বড়ই আশা হইয়াছিল, বুঝি পরে রাজর্ষিচরিত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু হায়, সে আশা বৃথা। গ্রন্থকার এমত ক্ষেত্র বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, যে ক্ষেত্রে তিনি রাজর্ষির গুণাবলির ক্রীড়া দেখাইতে পারেন, কিরূপ গুণের সমাবেশ হইলে একজন রাজা রাজর্ষি হইতে পারেন, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেকে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজর্ষি কয়জন ছিলেন? ঋষির চরিত্র ব্রাহ্মণ অঙ্গে সাজিয়াছিল, রাজার চরিত্র ক্ষত্রিয় অঙ্গে শোভা পাইত। ব্রাহ্মণ ঋষির গুণাবলি ক্ষত্রিয় রাজ অঙ্গে সমাবিষ্ট হইলে, রাজা যদি প্রধান প্রধান রাজগুণ বিসর্জ্জন দিয়া সম্যক্‌ভাবে ব্রাহ্মণ ঋষি হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে রাজর্ষি বলিব? না, যে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যের মত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে শোভিত হইয়া নিজ ব্রাহ্মণের গুণাবলি বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাকে ঋষি বলিব? তবে যিনি ঋষির ধর্ম্ম ও রাজার ধর্ম্ম একত্রে ধারণ করিতে পারেন, যিনি এই দুঃসাধ্য ব্রতে সিদ্ধ হইতে পারেন, তিনি যে একজন অসাধারণ রাজা, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ রাজা কেবল ভারতেই জন্মিয়াছিল। এরূপ রাজা রাজগণের চূড়ামণি ও আদর্শ। এরূপ রাজা লাভ করা এই জন্য অত্যন্ত দুলভ। ঋষি, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ, রাজা, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ। রাজর্ষি এই দুই শ্রেষ্ঠতার মিলন। পূর্ব্বকালে রাজর্ষির অঙ্গে ঋষি ও রাজার গুণাবলি কেমন একত্রে মিশিয়াছিল, তাহা অনুমান করিতেও একটু আনন্দ আছে। ঐরূপ গঙ্গা যমুনার মিলন দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আজি রাজর্ষি গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, গ্রন্থকার বুঝি সেই সুন্দর মিলন-দৃশ্য দেখাইবেন— ঔপন্যাসিক ক্ষেত্রে একটি মনোমত রাজর্ষি-চিত্র গড়িয়া দিবেন। রাজর্ষি বলিলেই আমাদের মনে যে এক-প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হয়,

আজি বুঝি সেই ভক্তিরসের আস্পদ লাভ করিব। কিন্তু গ্রন্থকার যাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সে ভক্তির উদয় হয় নাই। রাজর্ষির কোন্ গুণ গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে পাওয়া যায়? তিনি কি জাপক ছিলেন, না যাজ্ঞিক ছিলেন না ব্রহ্মবিৎ ও জ্ঞানী ছিলেন? এইরূপ থাকিয়া তিনি কি ত্যাগী ঋষি চরিত্রে রাজ-গুণ মিশাইয়াছিলেন? তিনি কি বীরের অঙ্গে ঋষির শান্ত ভাব মিশাইয়াছিলেন? তিনি একজন সাধু ও সদাশয় লোক, বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। কিন্তু সাধু ও সদাশয় লোক হইলেই কি ভাল রাজা হইতে পারে? সাধু লোকেই যে ভাল রাজা হইতে পারে, এরূপ সচরাচর ঘটে না। গোবিন্দ মাণিক্যই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যে রাজ-অঙ্গে প্রধান প্রধান রাজগুণেরই সমাবেশ নাই, তিনি কিরূপে রাজ-আদর্শ রাজর্ষি নামে সম্মানিত হইতে পারেন? গোবিন্দমাণিক্য রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজগুণ তাঁহাতে কি ছিল? প্রজারঞ্জন করা রাজার যে প্রধান ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাঁহার ছিল না। তিনি কেমন প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন এই দেখুন গ্রন্থকার তাহা নিজ মুখেই পরিচয় দিতেছেন:—

"পূর্ব্বদ্বার দিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া নক্ষত্র মাণিক্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ অর্থ ও গুটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিমদ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া ঢাক ঢোলের শব্দ করিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটীরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল। ক্ষুধায় ও ক্ষুধিত সন্তানের ক্রন্দনে তাহাদের জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরশু গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল। দক্ষিণে বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্মুখে চাহিয়া রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।"

কেবল বাকি ছিল তবে কুলার বাতাস দিয়া তাঁহাকে বিদায় করা। এই তাঁহার প্রজারঞ্জনের চিহ্ন। গ্রন্থকার বলিতে পারেন যে গোবিন্দমাণিক্য নরবলি রহিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকৃতিবর্গের এত বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ ঘটাতে সেই বিরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রজাকুল তাঁহাকে সেই দুর্ভিক্ষের কারণ জানিয়া অভিশাপ ও গালি বর্ষণ করিয়াছিল। এ কথা ঠিক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার কি ইতিহাস লিখিতেছিলেন, না কাব্য গড়িতেছিলেন? রাজর্ষিচরিত্র গড়া যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে ত তিনি গ্রন্থভাগ্যকে অবশ্য অন্যরূপেও দেখাইতে পারিতেন। হিন্দু-কল্পনা রামের পুণ্য রাজত্বকালে রাজ্যমধ্যে কোন দৈব-দুর্ঘটনা অনুমান করিতে পারে নাই। জনকরাজের রাজ্যমধ্যেও কোন অশান্তি ঘটে নাই। আমাদের রাজ-

র্ষির রাজ্যে অশান্তি প্রবেশ লাভ করিল কেন? গ্রন্থকার এ কল্পনা না করিলেই ভাল হইত। আবার দেখুন, যে দেশে নরবলি হইত, সেই নরবলি নিবারণ হইলে কি সে দেশের সমস্ত লোক ক্ষেপিয়া উঠে, না ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে। আমাদের অনুমান হয়, সে দেশের অনেক লোকেই সন্তুষ্ট হইবে। তা যদি হয়, তবে প্রজা-কুলের যে ভাগ সন্তোষলাভ করিয়াছিল, তাহাদের সন্তোষের পরিচয় কই? আর যে ভাগ রুষ্ট হইয়াছিল, রাজর্ষির নিজগুণে এবং রাজত্বের সুখবিধানে, তাহারা সে রোষ ভুলিয়া যায় নাই কেন? গোবিন্দ যদি ভাল করিয়া প্রজারঞ্জন করিতে জানিতেন, যদি প্রজাকুলের কেবল সুখ ও শান্তি দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাহাদের অনুরাগভাজন হইতেন। তাহারা সকল ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিত। নরবলি নিবারণ হওয়াতে প্রকৃতি-বর্গ যদি এতই ক্ষেপিয়া থাকে, তবে তাহারা সেই বলি নক্ষত্রের সময়ে পুনঃ স্থাপিত করে নাই কেন? আবার ভুবনেশ্বরীর মন্দির* ধূমধামে পূর্ণ হয় নাই কেন? রঘুপতির আশা মিটে নাই কেন? সে যাহা হউক, যে রাজার রাজ্যে প্রজাকুল সুখে না থাকে, এবং রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী না হয়, সে রাজ্য কি রাজর্ষির রাজ্য। যে রাজার রাজ্যে প্রজার শান্তি নাই, তাহা কি রাজর্ষির রাজ্য হইতে পারে? হিন্দু-কল্পনা এমন অনুমান করিতে পারে না।

প্রজারঞ্জনে গোবিন্দমাণিক্য কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে আর একটি প্রধান রাজ-গুণের কথা বলিব। রাজ্য ও প্রজাকুলকে রক্ষা করা রাজার আর এক প্রধান ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে গোবিন্দমাণিক্য কেমন ভূষিত ছিলেন, তাহা নক্ষত্রমাণিক্য কর্তৃক রাজ্য আক্রমণ সময় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তখন আস্তে আস্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। যে রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়কে দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রবল দর্পে আট বৎসরের জন্য রাজ্য নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, আজি কি বলিয়া সেই কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে রাজ্য মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে দিলেন? কই, এখন তাঁহার সে তেজস্বিতা ও বলদর্প কই? সে দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা কই? রাজার কি এই ধর্ম্ম। গোবিন্দ যে প্রেম-অস্ত্রে পূর্ব্বে শাণিত অসিকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, এখনও তিনি প্রথমে সেই প্রেম-অস্ত্র—ভ্রাতৃ-স্নেহের সেই কোমল অস্ত্র—প্রয়োগ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সে অস্ত্র নিষ্ফল, তখন তিনি বিনা রক্তপাতে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেলেন। এরূপ কার্য্যে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু রাজার পক্ষে নহে। এ কার্য্যে সাধুর গৌরব আছে বটে, কিন্তু রাজার পৌরুষ নাই। সিংহাসনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। কেবল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শায়িত থাকিয়া রাজমুকুট ধারণ করা যায় না। এই রূপ শয্যায় শায়িত থাকিয়া এক

---

*গ্রন্থকার বলিয়াছেন "ভুবনেশ্বরী", কিন্তু আমরা জানি, সতীর—

"দক্ষিণ চরণ খানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব, 'ত্রিপুরা দেবী' তায়॥"

ভারত চন্দ্র।

দিন বঙ্গাধিপ এইরূপ সময়েই রাজবাটীর পশ্চাদ্‌দ্বার দিয়া পুরুষোত্তমে পলাইয়া গিয়াছিলেন। এই রূপ সময়ে আজি গোবিন্দমাণিক্য নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া আস্তে আস্তে বনবাসে গেলেন। বঙ্গাধিপ যবনের নৃশংস করলে দেশকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যও তদ্রূপ ত্রিপুরা রাজ্য একজন অসার বিলাসীর হস্তে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে বাহুবলে একদা তিনি দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, আজি সে বাহুবল কোথায়। তিনি কি বলিয়া রাক্ষসের হাতে ছেলেকে সমর্পণ করিয়া গেলেন! ইহাতে কি তাঁহার প্রেম পরিতৃপ্ত হইল! রাজা কি তখন এই অসিপূর্ণ রক্তময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসের প্রেমরাজ্যে যাইতেছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে কি তাঁহার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না, যে তাঁহার অবর্ত্তমানে ত্রিপুরার দশা কি হইবে? তিনি যাইলে যে ত্রিপুরা কেবল ক্রন্দনে পূর্ণ হইবে! সে ক্রন্দন যদি তিনি নিবারণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কি গৌরব ও মহত্ত্ব হইত না। সে ক্রন্দন নিবারণ করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল না? সে ক্রন্দন নিবারণ করিতে পারিলে কি তিনি সুখী হইতেন না, তাঁহার প্রেমের পরিতৃপ্তি সাধন হইত না? তিনি একদিকে দেশকে ক্রন্দনে ভাসাইয়া গেলেন, অন্য দিকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুই দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎ কার্য্য করিতে গেলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রন্দন-রোল কি একবারও তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করে নাই! যদি সে ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকে, তবে তিনি কি বলিয়া স্থির হইয়াছিলেন? কিরূপে তিনি হৃদয়-বেদনা শান্ত করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার প্রেমের ব্রত পালিত হইতেছিল? গ্রন্থমধ্যে এ সমস্যার মীমাংসা কোথায়? যে রাজা প্রজারঞ্জন করিতে অসমর্থ, রাজ্য ও প্রজাকুলকে রক্ষা করিতে অক্ষম, তিনি কিরূপ রাজা? যাঁহাতে প্রধান প্রধান রাজগুণ ও ঋষিধর্ম্ম নাই, তিনি কিরূপে আদর্শরাজ রাজর্ষি হইতে পারেন? রাজর্ষিরা কি গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায় একজন কাপুরুষের মত রাজ্য ও প্রজাকুলকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়? জনকরাজ কি রাজ্যত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন? না, তিনি রাজ্যে অবস্থান করিয়া, রাজদণ্ড বহন করিয়া এবং রাজছত্রে শোভিত হইয়া রাজর্ষি নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদি বল, রাজা হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিতে পারিলে রাজর্ষি হওয়া যায়, তবুও গোবিন্দমাণিক্য রাজর্ষি নহেন। তিনি রঘুপতির আশায় কিছুকালের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন মাত্র, সে ত্যাগ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে। তিনি পরে আবার সেই সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সন্ন্যাসক্ষেত্রে তাঁহার অনেক দূর জ্ঞান ও চরিত্রবিকাশ হইতেছিল বটে, কিন্তু তখন তিনি আর রাজা নাই। সন্ন্যাসক্ষেত্রে তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সন্ন্যাসীর কার্য্য, রাজার কার্য্য নহে; সুতরাং তাহা রাজর্ষির কার্য্য নহে। সে কার্য্যে তাঁহার হৃদয়-প্রেমের বিকাশ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে রাজগুণের কিছুমাত্র বিকাশ হয় নাই। যদি বিকাশ হইয়া থাকে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইলেন কই? সন্ন্যাসক্ষেত্র হইতে

ফিরিয়া গিয়া তিনি পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কিরূপে রাজর্ষির ন্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা ত গ্রন্থকার দেখাইলেন না। যেখানে তাহা দেখাইবার অবসর হইল, গ্রন্থকার সেখানে একেবারে পট প্রক্ষেপ করিয়া দিলেন। রাজর্ষির চরিত্র তিনি কোনখানে আঁকিতে পারিলেন না। না সিংহাসন ত্যাগের পূর্ব্বে, না তাহা পুনর্গ্রহণের পর। সুতরাং রাজর্ষির চিত্র সম্যকরূপে অসম্পূর্ণ রহিল। আমরা এ গ্রন্থে একজন সামান্য সাধু লোকের চরিত্র চাই না, রাজর্ষির চরিত্র চাই।

উপন্যাসের মন্ত্রণা-কল্পনার দোষে অপরাপর পাত্রগণেরও চরিত্র স্ফূর্ত্তি পায় নাই। সুলিখিত উপন্যাসের গুণ এই যে, তাহাতে ঘটনাস্ফূর্ত্তির সহিত উপন্যাস ক্রমে সরস হইতে থাকে। যিনি ঘটনাজাল এরূপে বিন্যস্ত করিতে পারেন, যাহাতে উপন্যাসের ক্রমে ব্যাপ্তি হইতে থাকে, তিনিই উপন্যাসকে সরস করিতে পারেন। যে উপন্যাসের প্রারম্ভে পাত্রগুলির কেবল বাহ্য রেখা পড়ে, সেই উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধির সহিত পাত্রগণের চিত্রফলক ক্রমশঃ বর্ণ-গৌরবে পূরিয়া উঠিতে পারে। অযোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত, বলিতে গেলে, রামায়ণের একভাগ শেষ হইয়াছে। সেখানে আমরা দশরথ কৈকেয়ী প্রভৃতির চরিত্র এক প্রকার শেষ করিয়াছি। কিন্তু ঐ চরিত্রগুলি যেমন শেষ হইল, অন্য কতিপয় চরিত্রের কেবল প্রারম্ভ মাত্র দেখিলাম। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত প্রভৃতি চরিত্রের অঙ্কপাত মাত্র দেখিলাম। ক্রমশঃ এই পাত্রগণের চরিত্র-গৌরব বাড়িতে লাগিল। শুদ্ধ ইহাদিগের নয়, উপন্যাস বিকাশের সহিত সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন নূতন পাত্রেরও উদয় হইল। শুদ্ধ উদয় নয়, তাহাদিগের সহিত পরিচয় হইল এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। এতদূর ঘনিষ্ঠতা জন্মিল যে, তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশদরূপে দেখিতে পাইলাম। রামায়ণে যাহা ঘটিয়াছে, মহাভারতেও তাই। পঞ্চভ্রাতার নির্ব্বাসন হইল, আমরাও হস্তিনাপুর পার হইলাম। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা যে সকল চরিত্রের রেখাপাত মাত্র দেখিয়াছিলাম, ক্রমশঃ ঘটনাজালে সেই সকল চরিত্রের গৌরব সাধন হইল। অনেক নূতন চরিত্রেরও ক্রমে সমাবেশ হইল। পরে সেই পাত্রগণের চরিত্র-বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ, কৌরবগণ, ভীষ্ম, কর্ণ, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, অভিমন্যু, রথীগণ, সামন্তগণ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু বড় কথা ছাড়িয়া দিন। ছোট ছোট উপন্যাস গ্রহণ করুন। দুর্গেশনন্দিনী, ও মৃণালিনীতে আমরা কি দেখিতে পাই? দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা ও বিমলাকে দেখুন, মৃণালিনীর পশুপতি, মনোরমা, গিরিজায়া এবং হেমচন্দ্রকে দেখুন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কি ছিল, আর শেষে কি দাঁড়াইল? কিন্তু এ গ্রন্থে কি তাহা ঘটিয়াছে? এ গ্রন্থের প্রথমে আমরা যে সকল চরিত্র লইয়া উপন্যাস আরম্ভ করি, সেই রঘুপতি, রাজর্ষি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়ের বিষয় লইয়া আমরা দেখাইয়াছি, গ্রন্থকার তাহাদিগের চরিত্র গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে কিরূপ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে অনেক নূতন লোকের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল।

সুলিখিত উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, এইরূপ নূতন দেশের নূতন লোক এতদূর চিত্তাধিকার করে যে তাহাতে উপন্যাস ক্রমশই সরস হইতে থাকে। নূতন পাত্র ও পাত্রীগণের চিত্র ক্রমে উজ্জ্বল ও উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। অবশেষে তাহারাই সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। কারণ, তাহারাই গ্রন্থের উপাখ্যান ক্রমে গড়িতে থাকে। তাহাদের ভাগ্য উপাখ্যানের সহিত এরূপ জড়িত হয় যে, তাহাদের পরিণামের উপরই গ্রন্থের পরিণাম-ফল প্রধানতঃ নির্ভর করে। সুতরাং তাহারা পাঠকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু এ গ্রন্থে সেরূপ ঘটে নাই। দ্বিতীয় খণ্ড খুলিয়া আমরা যে সকল নূতন লোক দেখিলাম, তাহাদিগের ভাগ্য উপন্যাসের সহিত অধিক সংশ্লিষ্ট হয় নাই। তাহাদের চরিত্রাঙ্কনও এত উচ্চ, উজ্জ্বল, ও ভাস্বর নহে যে তাহাতে পাঠকের চিত্ত অধিকার করিতে পারে। তাহারা ছায়ার মত আসিল, ছায়ার মত চলিয়া গেল। মনে তাহাদের চিত্র কিছুই অঙ্কিত হইল না!

এ গ্রন্থে পাত্রগণের যেরূপ চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা বলিলাম। এক্ষণে আর একটী প্রধান দোষের কথা বলিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। গ্রন্থে রসের খেলা খুব কম। যাহাতে হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে, আকর্ষণ করিয়া তাহাকে তরঙ্গ তুফানে নাচাইয়া তুলে, ঘাত প্রতিঘাতে তাহাকে উচ্ছলিত করিতে থাকে, এ গ্রন্থের উপাখ্যানে সে রসের খেলা নাই। এ গ্রন্থের এক মাত্র রস হিংসা। এই হিংসার খেলা একবার মাত্র বাড়িয়াছিল। গ্রন্থের প্রারম্ভে এই হিংসা জোর করিয়া উঠিয়াছিল। রঘুপতির বিদ্বেষভাব যত প্রতিরুদ্ধ হইতেছে, জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায় তাহা যতই বিফল করিতেছে, পাঠকের মনে তাহাদের ঘাত প্রতিঘাত ততই লাগিতেছে। ঘাত প্রতিঘাতেই রসের বৃদ্ধিসাধন হয়। যে উপাখ্যানে ঘটনার বিরোধ নাই, যাহাতে প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সংগ্রাম নাই, হৃদয়ের বিপক্ষে হৃদয়ের যুদ্ধ নাই, তরঙ্গ তুফান নাই, সে উপাখ্যান নিতান্ত রসহীন। রঘুপতি সংকল্প করিতেছে, কিন্তু তাহার সংকল্প প্রতি হাতে যেমন বিফল হইতেছে, অমনি তাহার হৃদয়ে প্রতিঘাত লাগাতে সেই হৃদয় আবার কেমন নিজ সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে,—এই উদ্যোগে এবং এই হৃদয়ের খেলাতে পাঠকেরও হৃদয় একটু নাচিয়াছিল। কিন্তু সে নৃত্য ও তরঙ্গ রঘুপতির নির্ব্বাসনে শেষ হইল। সেই যে শেষ হইল, আর দেখা দিল না। তাহার পর রঘুপতি বুদ্ধি ও অর্থবলে গোবিন্দের সহিত সংগ্রাম বাঁধাইবার চেষ্টা করিলেন মাত্র। সে সংগ্রাম বাঁধিল না। সুতরাং গ্রন্থ একেবারে নীরস হইয়া পড়িল। বিল্বন ঠাকুরকে গ্রন্থকার একটু তুলিতেছিলেন, কিন্তু বিল্বনের সমর-চেষ্টা বিফল হওয়াতে তিনিও মন হইতে ছায়ার মত অদৃশ্য হইলেন। গ্রন্থ যেমন একটু সরস হইতেছিল, অমনি তাহা শুকাইয়া গেল। নির্ব্বাসনের পর গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে রঘুপতির উদ্যোগে কিছুই রসের খেলা নাই। অথচ এই উদ্যোগই গ্রন্থের অধিক ভূমি অধিকার করিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের অধিকাংশই নীরস হইয়া পড়িয়াছে।

এ প্রস্তাবের কলেবর অনেক বাড়িয়াছে। এজন্য এই খানে আমরা প্রস্তাব

সমাপ্ত করিলাম। সন্ন্যাস ও গ্রন্থের পরিণাম সম্বন্ধেও আমাদের কিছু ব্যক্তব্য ছিল, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত বিরত হইলাম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দেশীয় অভিধান সমূহে উপনিষৎ শব্দটি অতি গূঢ়ার্থ। উপনিষৎ সমূহের ভাষ্যকারী মুখ্য বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্য বলেন, যে 'উপনিষৎ' এই কথাটি উপ এবং নি পূর্ব্বক 'সদ' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার নানা প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহার মধ্যে একটি অর্থ—ধ্বংসকারী। অতএব 'উপনিষৎ' শব্দের মুখ্য অর্থ এমন একটি বিদ্যা যাহা ভ্রম বা অজ্ঞানকে ধ্বংস করে। অন্যদিকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন 'উপনিষৎ' শব্দে প্রথমতঃ পাঠ শুনিবার নিমিত্ত বিনীতভাবে শিক্ষকের নিকট বসিবার কায়দা বোধ হইত। উপ'র অর্থ নিম্নে, নি'র অর্থ জানু পাতিয়া, সদ্'র অর্থ বসা। পণ্ডিত মোক্ষমূলরের এই মত।* আবার, আচার্য্য গোণ্ডষ্টুকার বলেন, † ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর যে উপনিষৎ গ্রন্থ সকলের সত্ত্বালাভ করিবার পূর্ব্বে যে সকল হিন্দু বৈয়াকরণ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা উহাকে গূঢ় বা অবোধ্য অর্থে ব্যবহৃত করিতেন। এবং ঐ অর্থটি ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়ের সহিত অসম্বন্ধও নয়, কারণ ইহার প্রকৃতি প্রত্যয় লব্ধ অর্থ, কোন গুপ্ত বস্তুর সমীপে যাওয়া বা জানা। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কোন সময়েই 'উপনিষৎ' শব্দ প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক শিষ্যদিগকে প্রদত্ত পাঠ রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু প্রায় সকল সময়েই ইহার অর্থ একরূপ গূঢ় বিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহা মনুষ্য হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করিয়া অনন্ত সুখলাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করে। সে বিদ্যা সাধারণের অবোধ্য। সমুদয় উপনিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া বিচার করিলে এইরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উপনিষৎ হইতে সংসারের কার্য্য ও স্বভাবের বিষয় জানা যায়, ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ ও ধর্ম্ম সকল জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং ইহাও জানা যায় যে আত্মা সকল ঈশ্বরের অংশমাত্র। উপনিষৎ সকলের সহিত বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য অভিন্ন, এবং পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাসম্বন্ধে উপনিষৎ সকল যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে, উহাদের সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনেরও ঠিক সেই মত। ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে উপনিষৎ এবং গোঁড়া হিন্দু দর্শন গুলির সহিত একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে উপনিষদ্ গুলিতে কোন রূপ দার্শনিক তর্ক বিতর্ক নাই, উক্ত

---

* মূলর সাহেবের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের ৩১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† Goldstucker, 'Panini' (P. 141. Note 161).

দর্শন গুলিতে তাহা আছে। বেদান্তদর্শনে তর্ক বিতর্ক করিয়া এই রূপ স্থির করা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির সময় এক অদ্বিতীয় আত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমাদের (য়ুরোপীয়দের) দার্শনিক তর্ক বা যুক্তির নিকট ঐ সকল তর্ক দাঁড়াইতে পারে না। তথাপি ইহাদের বাক্যগুলি অনেকাংশে সযুক্তিক অল্প কথায় ব্যক্ত এবং ঔপন্যাসিক রহস্যশূন্য। উপনিষৎ গ্রন্থ গুলিতে দর্শনের উপাদান সামগ্রী লক্ষিত হয় মাত্র। উপনিষদের বিষয়গুলি অতীব বিশৃঙ্খলভাবে উপন্যস্ত, এবং মধ্যে মধ্যে উপন্যস ও কল্পিত গল্প দ্বারা বিচ্ছিন্ন। উপনিষদের বিষয়গুলি প্রায় কথোপকথনচ্ছলে অবতারিত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিত। কিন্তু উপনিষদের এই দোষগুলি হিন্দুদিগের চিত্ত অনুসারে বিচার করিলে আমরা সহজে জানিতে পারি যে, কৃতবিদ্যগণ সাধারণতঃ যেরূপ বুঝিয়াছেন, এই উপনিষদ্‌গুলি সেই প্রকার জ্ঞানোন্নতির মূল। যে জ্ঞান সকল সময়ই পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদের নিমিত্ত এবং নীচান্তঃকরণ পুরোহিতশ্রেণী দ্বারা প্রচারিত শাস্ত্রের অযথা বোধ জন্য প্রচলিত অসৎ অনুষ্ঠান সকলের বিনাশার্থ স্বয়ং চেষ্টমান সকল উপনিষদই সে জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করে।

সকল উপনিষৎ যে এক সময় রচিত নয় ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের তাদৃশ শৃঙ্খলা না থাকায় কোন্ উপনিষৎ কোন্ সময় রচিত ইহা ঠিক্ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। উপনিষৎ সমূহের মধ্যে আরণ্যকগুলিই প্রথমে রচিত হয়। ইহাদের নামেই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ,পানিনি ব্যাকরণের আলোচনায় কোন একস্থানে কাত্যায়ন ঋষি আরণ্যক শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে এই শ্রেণীর উপনিষৎ অরণ্যের মধ্যে নির্জ্জনে অধীত হইত বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক হইয়াছে। অরণ্যে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিবার কতকটা কারণও বুঝা যায়। তখনকার লোকেরা বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে জীবনের রহস্য বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় মন হইতে জগতের যাবদীয় সম্বন্ধ অপসৃত করা উচিত। আরণ্যক গ্রন্থগুলির সহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থদিগের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় অন্য শ্রেণীর উপনিষদ্ গুলির সহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সেরূপ সংস্রব নাই। বৃহদারণ্যক নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অংশ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ যদিও কোনও স্থানে আরণ্যক নামে অভিহিত হয় নাই, তথাপি উহা সামবেদের অন্যতম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে যে ভাবে গল্পগুলি সাজান হইয়াছে ঐ প্রথম শ্রেণীর উপনিষৎগুলিতেও ঠিক সেই মতে মধ্যে মধ্যে গল্পের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। উপনিষদে ঐ সকল আখ্যায়িকার গূঢ় বা সাধারণের বুদ্ধির অবোধ্য ভাবে সন্নিবেশ থাকায় উহাদের বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপনিষৎ গুলিতে কাল্পনিক ইতিহাস বা আরোপিত কথার উল্লেখ নাই। ইহারা সংক্ষিপ্ত এবং দার্শনিক মতের অনুগত। অনেকগুলি অথবা অধিকাংশ উপনিষদই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এবং এই সকল উপনিষৎ গ্রন্থগুলি যে আরণ্যক গ্রন্থ হইতে অনেক পরিবর্ত্তিত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়

মান হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উপনিষৎগুলিতে বৈদিক দেবতত্ত্বের সহিত নব্য সাম্প্রদায়িক বিবিধ ধর্ম্মবিষয়ক মতগুলির সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপনিষৎ গুলিতে পরমব্রহ্মকে ত্রিদেবের (ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর) অন্যতর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপনিষদের অধিকাংশই অথর্ব্ব বেদের সহিত সম্বদ্ধ বা তাহার অনুগত। এই উপনিষৎ গুলির বিশদ পরিচয় দিবার জন্য আমরা ক্রমশঃ উহাদের বাক্যাদি উদ্ধৃত করিয়া এক একটি উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি। আগামী বারে আমরা তাহার সম্যক্ আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

সাহিত্য।

সাহিত্য কি?

সাহিত্য কি, বুঝাইতে একটা কিছু নূতন বলা শক্ত কথা। সাহিত্য কি, কেহ বলিতে বসিলে অনেকে নূতন-কিছু জানিবার জন্য আগ্রহসহকারে শুনিতে বসেন। হায়, তাহার কি কষ্ট, যে শুধু মাত্র জানে যে তাহার শ্রোতৃবর্গ কি শুনিতে চান!

এদিকে, সাহিত্য কি, এ বিষয়ে গণিত-বিদ্যার মত একটা কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। সাহিত্য অনেকটা রাজনীতির মত। রাজনীতিজ্ঞদিগের ন্যায় প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যবিদেরও লক্ষ্য, আদর্শ, প্রণালী এবং উপকরণ বিভিন্ন; অনেকটা আপনার রুচির উপর নির্ভর করে।

অথচ বিজ্ঞান-দর্শনাপেক্ষা মানুষের কাছে সাহিত্যের আদর অধিক। যে লেখে প্রায়ই সাহিত্য লিখিতে বসে। কেন? কেন বাল্মীকি কালিদাস এত আপনার-আপনার, আর্য্যভট্ট পতঞ্জলি এত পর-পর? সাহিত্যবিদ্ মানুষের হৃদয়-সখা।

অথচ যাঁহারা জীবনযাত্রার জন্য শিক্ষা চান, তাঁহাদিগকে সাহিত্যের আবশ্যকীয়তা-সম্বন্ধে কিছু বুঝান যায় না। সাহিত্য ভরণ পোষণের কোন একটা উপায় করিয়া দিতে পারে না। সাহিত্যকে শুদ্ধ সাহিত্যেরই জন্য শিখিতে হয়। সাহিত্য-চর্চ্চায় সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বা নির্দ্দিষ্ট কোন ফল লাভ নাই।

সাহিত্য-রসজ্ঞতা চর্চ্চা-সাপেক্ষ; সাহিত্য-রসবোধ সকলেরও নাই। সকলেরই যেমন সুরবোধ থাকে না, সাহিত্য-বোধশক্তি তেমনি অনেকেরই নাই। অনেকের প্রকৃতি সাহিত্যোপযোগী নহে। তাঁহারা যদি সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাহা ভাসা ভাসা—উপরে উপরে। সংবাদপত্রের সংবাদস্তম্ভ বা মাসিক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার পত্রগুলিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। সাহিত্য-চর্চ্চাকারীদিগের যতটুকু পঠনেচ্ছা, চিন্তা, ধৃতি, এবং স্মৃতিশক্তি আবশ্যক, সেটুকু নাই।

সাহিত্য চর্চ্চাকারীদিগের হাতেও পাসি-

কটা অবসর থাকা উচিত। হৃদয়ে এবং সংসারে কতকটা শান্তি থাকা প্রয়োজন। চলিতে চলিতে, গল্প করিতে করিতে, সংসারের কথা ভাবিতে ভাবিতে দুই চারিখানা পাতা উল্টান, সাহিত্য-চর্চ্চা—কিছুরি চর্চ্চা নহে।

আবার সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইলে আগে বা সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিদ্যাই একটু একটু আরম্ভ করিতে হয়। একটু একটু বলিবার অর্থ—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে যে অংশটুকু ছড়ান, সে সে টুকু না বুঝিলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকে।

এত শ্রম স্বীকার, অথচ কিছুই নাই, তবু কেন মানুষ সাহিত্য এত ভাল বাসে? কেন শিক্ষার মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চাই অবশ্য-কর্ত্তব্য?

সাহিত্যের ফলাফল।

জগতের এবং জীবনের কতকগুলি বিষয়ের 'কি' প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কিন্তু তাহাদের আবশ্যকানবশ্যকীয়তা বুঝি ফলাফল দেখিয়া। সাহিত্যও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ফলাফল পরোক্ষতঃ।

যদি আপনার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে কীটের মত বাস করা উচিত বোধ না হয়, যদি বাস করিতে না পারা যায়, তবে সাহিত্যের চর্চ্চা করা উচিত। দেখা যায়, সাহিত্য ক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ দেয়; গর্ব্ব, আত্মম্ভরিতা এবং স্বার্থপরতাকে দমন করে, দেখা যায়, সাহিত্য আশাকে উজ্জ্বল করে; ভবিষ্যৎকে নিকটে আনে, বর্ত্তমানকে মধুর করে। জগতকে, প্রকৃতিকে, স্বজাতিকে আরামস্থল করিয়া দেয়। নিদ্রিত ভাব-সমূহকে জাগরিত করে, নীতিজ্ঞান এবং কল্পনাকে প্রখর করে; জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ও চিরনূতন করিয়া রাখে।

যদি মানুষের উচিতই হয়—নিয়মিত সুসংযত, বিনীত ও ন্যায়বান হওয়া, দেখা যায়, সাহিত্যই সেই ঔচিত্যে প্রধান সাহায্য-কর্ত্তা। সাহিত্যই তাহার উদাহরণ-দাতা। দেখা যায়, সাহিত্যই মানুষের চিত্ত, বুদ্ধি, হৃদয়, কার্য্য এবং জীবনকে পূর্ণ করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা করে, মহদাদর্শসমূহ সর্ব্বদাই চক্ষের সম্মুখে রাখে। সাহিত্যই ইন্দ্রিয়ের সংযমকারী, মস্তিষ্কের সংযত চালনার সহায়, আমোদের পরিমাণ, পরিশ্রমে অধ্যবসায়। সাহিত্যই মানুষের হৃদয়, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি, এবং মানুষের অভাব, অদৃষ্ট, স্বভাব, ব্যবহার প্রভৃতি বুঝাইয়া দেয়, দুঃখী তাপীর উপর সহানুভূতি জন্মাইয়া দেয়।

একদিকে কথা উঠিয়াছে—বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চ্চা কর, নহিলে উন্নতি নাই; সাহিত্য চাই না। সাহিত্য-চর্চ্চায় মানুষের শ্রমশীলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না; দিন দিন মানুষকে নিস্তেজ জড়পিণ্ডবৎ করিয়া তুলে। সাহিত্য-চর্চ্চাকারীরা কেবল স্বপ্ন ও খেয়ালে ঘুরিতে পারে, হাতে-হেতুড়ে কোন কাজে লাগে না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু এ দোষ সাহিত্যের নহে, সাহিত্যের অপব্যবহারের ফল। কে বলিল, প্রকৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়? প্রকৃত সাহিত্য মানুষকে সৌন্দর্য্য বুঝায়, সরলতা শিখায়। মানুষ মানুষ হয়, মনুষ্যত্ব হারায় না! সাহিত্যের মর্ম্মে মর্ম্মে হিতবাদ, সংযমবাদ, জ্ঞানবাদের কল্প-লহরী খেলিতেছে। নিজের কিছু না জানিয়া, না

মানিয়া কেবল কলে ঘোরা ধুঁয়াষ উড়াও মনুষত্ব নহে। কে বলিল সাহিত্য-চর্চ্চায় মানুষ কেবল খেয়ালে ঘুরে? মিল্টন, গেটে প্রভৃতির কথা তুলিব না, প্রকৃত হাতে-হেতুড়ে বীকন্সফিল্ড, গ্লাডষ্টোন সাহিত্যবিদ্।

সাহিত্যের অপব্যবহার।

যখন সাহিত্যের অপব্যবহারের কথাটা উঠিল, তখন অপব্যবহারটা কি, আলোচনা করা যাক্।

সাহিত্য-শিক্ষা যে সে কতকগুলা পুস্তক পড়া নহে। সাহিত্য শিক্ষা—মানুষ কি, মানুষ কি হইতে পারে, মানুষের কি হওয়া উচিত, ইহাই বুঝাইয়া দেয়। আমাদের সাহিত্য কি ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে?

আমরা যে কোন পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারি, পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত শতকরা ৮০।৮৫ হারে সচরাচর উপন্যাস বিক্রীত হয়, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে কচিৎ দু চারি খানা। ইংলণ্ডেও প্রায় এইরূপ, স্কটলণ্ডে এবং আমেরিকায় ইহার অর্দ্ধেক। ফ্রান্স এবং জার্ম্মনির হার আমি জানি না। সাহিত্যের গুণ গাহিতে বসিয়া, সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গের আমি নিন্দা করিতেছি না। আমিও উপন্যাসভক্ত। বাজে উপন্যাসকে আমি সাহিত্যের অপব্যবহার বলি, ফিলডিং, স্কট, থ্যাকারে, ডিকন্স, ব্রণ্টে, জর্জ ইলিয়েট, বঙ্কিমের আদর করা উচিত, এবং হইবেও। শতকরা ৩৩।৩৪ খানা উপন্যাস পড়া আমার মতে যথেষ্ট।

আর এক। আমরা পুস্তক সংগ্রহে অনাগ্রহ। আমরা পুস্তক চাহিয়া পড়ি, বা লাইব্রেরী হইতে লইয়া আসি, একবার মাত্র পড়িয়া ফেরত দি। আমরা কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করা যে কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করি না। জানি, এমন কি যাঁহাদের যথেষ্ট অর্থসচ্ছলতা আছে, নিজের লাইব্রেরী করিবার ক্ষমতা আছে, এমন অনেকগুলি জমিদার, রাজা, রায়বাহাদুরও পুস্তক চাহিয়া পড়েন। ষ্টেট্‌সম্যান, ইংলিসম্যান লওয়া আছে—দেউড়ীর শোভার জন্য, বাড়ীতে এক খানা অভিধানও নাই! পুস্তক কেবল ফটো তুলিবার সময় হস্তের শোভা-সম্পাদন জন্য নহে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কতকগুলি ভাল পুস্তক নিজের রাখা উচিত। কেন না এমন কতকগুলি পুস্তক আছে, যাহা একবার বা দুইবার পড়িলে গত দিবসের সংবাদপত্রের মত পুরাতন হয় না। কতকগুলি পুস্তক আছে, যাহা চিরনূতন। বৎসরে একবার বা সহস্রবার পড়—প্রতিবারেই তুমি নূতন-কিছু শিখিবে, নূতন আনন্দ উপভোগ করিবে। এই Masterpiece-গুলি প্রায়ই পড়িতে হইবে, বুঝিতে হইবে, উপভোগ করিতে হইবে। এই Masterpiece-গুলি দ্বারা তোমার জীবন গঠিত করিতে হইবে, ইহাদের মধ্যে তোমায় বাঁচিতে হইবে।

আর কতকগুলি পুস্তক আছে যাহার কোন কোন অংশ অতি সুন্দর। সে অংশসমূহ দাগ দিয়া রাখিতে হয়, সময়ে সময়ে দেখা উচিত। এ গুলিও সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই জন্য বেকন বলেন, "Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested."

আর একটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয় দেখা যায়, বাঙ্গালায় যাঁহারা লেখক তাহারাই

পাঠক। লেখকের নিকট ভিন্ন পুস্তকের আদর নাই। আবার যাঁহারা পড়েন, তাঁহারাই লেখক। পড়িলেই লেখক হইতে হইবে, এ বড় ভয়ঙ্কর কথা! ঘরে ঘরে এত প্রতিভা ফুটিলে সাহিত্য জলিয়া যায়! হয় এই,—সাহিত্যে ভীরুতা এবং রেষারেষিতে ভরিয়া যায়; প্রকৃত প্রতিভা লইয়া একটা মতামাতি থাকে না। হয় এই,—ইহাতে নিজ পরিবার মধ্যে অশান্তি, শিক্ষিতদিগের মধ্যে সাহিত্যের উপর একটা বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া, আর নিজের ইহকাল নষ্ট করা। আমি আমার পাঠকবর্গকে হাতে ধরিয়া অনুরোধ করি, একটু বুঝিয়া, আপনাকে চিনিয়া, লেখক হইবেন। দেখিবেন,—

"The world with masters is so covered o'er,
There is no room for pupils any more."

দেখিবেন, যাঁহারা এ সাহিত্যপ্লাবিত যুগে সুলেখক বলিয়া নাম কিনিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম করিয়াছেন; কত অধ্যবসায় এবং কতখানি বুদ্ধি ও হৃদয় লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নূতন কিছু বলা, বা মনের ভাব sincerely প্রকাশ করা, এবং সেই কথা জগতের কথা হওয়া—যাঁর তাঁর কাজ নহে।

আমরা যখন সাহিত্যের গুরুত্ব বুঝিতেছি না, বলিতে পারি, আমরা সাহিত্য উপভোগও করিতেছি না।

কি কি পড়িতে হইবে?

ইহার উত্তর দিতে একজন প্রকৃত পণ্ডিতের আবশ্যক। আমার সে গর্ব্ব নাই। এ বিষয়ে সকলেরও একমত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে, বন্ধুত্ব ভাবে কথার মত, দুই চারিটা কথা কহা মন্দ নহে।

সাহিত্যের মধ্যে কি কি পুস্তক পড়িতে হইবে, এক কথায়, এমন এক-একজন গ্রন্থকারের রচনা,—"who has enriched the human mind, who has really added to its treasure, who has got it to take a step further, who has discovered some unequivocal moral truth, or penetrated to some eternal passion, in that heart of man where it seemed as though all were known and explored, who has produced his thought, or his observation, or his invention under some form, no matter what, so to be great, large, acute, and reasonable, sane and beautiful in itself; who has spoken to all in a style of his own, yet a style which finds itself the style of every body—in a style that is at once new and antique, and is the contemporary of all the ages."*

কোন এক গ্রন্থকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নহে। ইহাতেই সাহিত্য পাঠের দোষভাগ লাভ হয়। লেখক হইলে তাঁহার mannerism এর প্রতি পাঠকের একটা অন্ধ ভক্তি জন্মে। অনুকরণকারীর এবং একদেশদর্শীর মূল্য অতি অল্প।

কোন গ্রন্থ পড়িতে হইলে, তাহার রচয়িতার জীবনী (যদি পাওয়া যায়) সঙ্গে সঙ্গে পড়া উচিত। নহিলে মূল কথা পাওয়া যায় না, অনেক সময় বুঝা যায় না, ভাল লাগে না। মানুষটী ও বিষয়টা (man and matter) দুইটাই আয়ত্ব করা উচিত, এবং

* Sainte Beuve

লেখকের সময়াবস্থাও (age) জানা উচিত।

কবিতা, নাটক, প্রহসন, রহস্য, উপন্যাস, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, উপদেশ, হেঁয়ালী প্রভৃতি সাহিত্যের বিভাগ অনেক; পুস্তকও অসংখ্য। সাধারণ এক ব্যক্তি সাহিত্যের সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত হইতে পারেন না। যাঁহার যে বিষয়ে রুচি বা লক্ষ্য, তিনি সেই বিভাগের প্রথম, বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত পুস্তক পড়িতে পারেন, ক্ষতি নাই। বরং সে বিভাগে তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান বা অধিকার জন্মিবে। কিন্তু বলিয়া রাখি,—"To spend too much time in studies, is sloth; to use them too much for ornament, is affectation; to make judgment only by their rules, is the humour of a scholar."*

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, একদিন কোন কোন পুস্তকে এক একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল; আজ আর তাহা নাই। আজও তোমাকে যে সেই পুস্তকগুলি জীবনের সহচর করিতে হইবে, তাহা আমি বলি না। সেই পুস্তক বা পুস্তকগুলি যে কাজ করিতে ফুটিয়াছিল, সে কাজ সমাধা হইয়া গিয়াছে। এখন সে সময় নাই, ইচ্ছা হয় ত, সে ধরণের পুস্তক এক আধ বার দেখা ভাল।

কি কি পড়িতে হইবে, সাধারণ সাহিত্য-চর্চাকারীদিগের জন্য এই প্রবন্ধে আমার একটা পুস্তকের তালিকা দেওয়া উচিত ছিল। দিলে, হয়ত, অনেকের সহিত মতে মিলিত না; আমি যাহা ভালবাসি, হয়ত অনেকে তাহা বাসেন না। এবং তালিকা দেওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। তবে, যাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমি—Stopford Brooke, Mrs. Oliphant, Frederic Harrison, Carlyle, Emerson প্রভৃতি মহাত্মার পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বা পুস্তকগুলি পড়িয়া আপন আপন রুচি অনুযায়ী পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পরামর্শ দি। Emerson বলেন:—(১) "Never read a book that is not a year old; (২) Never read any but favoured books; (৩) Never read any but what you like" Lord Lytton-এর মত,—"In science, read by preference the newest books; in literature, the oldest."

বাঙ্গালা সাহিত্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" এবং শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা" হইতে যথেষ্ট উপদেশ পাওয়া যায়। এই দুইখানি পুস্তক প্রচারিত হইবার পর আরও কয়েকখানি উত্তম পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; পাঠকগণ একটু অনুসন্ধান করিলে নিজেরাই জানিয়া লইতে পারেন।

সাহিত্য চর্চ্চায় আমরা আস্থা-শূন্য। য়ুরোপের অনেকেই ৪।৫টী ভাষা শিখেন। শিখিবার সহজ উপায়ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কালিদাস, সেক্ষপীর, গেটে, মোলেয়ার, হিউগো, এবং দান্তে প্রভৃতির মূলগ্রন্থ (original) পড়া উচিত

উপসংহার-কালে একজন প্রধান সাহিত্যবিদের* কিছু কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমার এ প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা সম্ভবতঃ

* Bacon.

* Morley

ইহাতেই চাকিয়া যাইবে। কথাটি বড়ই সারগর্ভ, সাহিত্য-চর্চা-কারী মাত্রেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। তাহা এই—

"Bacon is right, as he generally is, when he bids us read not to contradict and refute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and to consider. *Yes, let us read to weigh and to consider*"

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ও পারে।

১

এ পারে নাই ফুলের খেলা
বয় না কো মলয় বাতাস,
বসন্ত আসিবে কেমনে গো?
জাগিবে কেমনে মধুহাস?

২

ঘোর মরুময় ভূমি হেথা,
পড়িতেছে নাহি যায় গণা
কত যাত্রী মরণের কোলে
ছাইতেছে তপ্ত বালুকণা।

৩

প্রদোষের মধুর কিরণ
হেথা যেন গরল সমান,
সঙ্গীতের নির্ঝরিণী জল
নাহি করে হেথা কেহ পান।

৪

কোথা পাখীদের গীতসুধা?
ঊষার পরশ-গীত কোথা?
ফলফুলহীন গর্ব্ব-তরু
শুধু একা দাঁড়াইয়া হোথা!

৫

উহার পরেতে ব'সে কই
কোন্ পাখী হরষিত প্রাণে?
ওর ক্ষুদ্র ছায়াখানি ল'য়ে
কাহারে তুষিবে ছায়াদানে?

৬

বাসনা আকুলি ওঠে কেঁদে
হেথা নাই আশ্রয়ের ছায়া,
সুখস্মৃতিগুলি মরমর—
জীর্ণ হ'য়েছে তাদের কায়া।

৭

শিহরিয়া দেহ মন প্রাণ
অশান্তির তপ্ত বায়ু বয়,
কখন দহিয়া যেতে হবে
এই শুধু এই হেথা ভয়!

৮

যদি বা ভাবের দেশ হ'তে
কৃপা করি দু-একটি ভাব
আসে সুকোমল করিবারে
হৃদি, ক'রে ফেলে গো পাষাণ।

৯

এমনি প্রকৃতি-বিপরীত
হেথায় সকল কাজ বঁধু,
বরষে না বারি মেঘজাল
বালুকার কোলাহল শুধু!

১০

চল বঁধু চল হেথা হ'তে
এ পারে আর রয়না কো।
উতরাই আইস এ পার
ওই র'য়েছে প্রেমের সাঁকো!

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আঁধারে আলোক।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

ভগবদ্গীতা। ১০।২০।

ঘোরা অমানিশি। ঘনঘোর কৃষ্ণমেঘে দিগ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন। ভীম তামস অন্ধকারে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতাগ্নি ভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত লেলীহান জিহ্বা বাহির করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চমকাইতেছে। সেই বিষম বিদ্যুৎ-চমকে শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে—চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছে,—অন্ধকারে অন্ধকার আরও ঘনীভূত—আরও বিভীষিকাময় হইতেছে। জগৎ স্তম্ভিত। জীবকুল সংজ্ঞাহীন—নিদ্রার মোহিনী মায়া-বরণে আবরিত। তরুরাজির শোভাময় শ্যামল দেহ অনন্ত অন্ধকারগর্ভে নিমগ্ন। যেন মহাপ্রাণে ক্ষুদ্র প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে। জীব-প্রাণ সমীরণ স্তব্ধ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে চমকাইয়া ঘনশ্বাস ফেলিতেছে। শীর্ণকায়া প্রবাহিনী প্রবাহহীন,—যেন বিষাদ-সাগরে গা ঢালিয়া আলুথালুভাবে অনন্ত শয়নে শায়িত আছে। কাল মেঘের কাল ছায়া সেই স্রোতস্বিনীবক্ষে পতিত হইয়াছে,—যেন পবিত্র-হৃদয়া কোমল-প্রাণা প্রেমময়ী সুন্দরী, মলিন কৃষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছাদিত করিয়া, পাপ জগৎ-চক্ষু হইতে আপনার লাবণ্যময়ী পবিত্রকান্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। কিন্তু, কি সুন্দর মহান্ নিস্তব্ধতা। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভীমরূপ অন্ধকারের বিরাট শরীরে কোমলতাময়—আবেশময় নিস্তব্ধতা গা ঢালিয়া যেন ভয়ে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কি মনোহর! পরমপুরুষের কি অনির্ব্বচনীয় মহান্ অভিব্যক্তি! কি সুন্দর!

সম্মুখে অনন্ত অন্ধকার-ক্রোড়ে, কল্লোলিনী আবেশময় অবশ অঙ্গে—কেমন এক ভাবে পড়িয়া আছে। পার্শ্বে ভীষণ শ্মশান। সেই মহা শ্মশানে শত সহস্র জলন্ত-চিতায় মহা ঘোর অন্ধকাররাশি প্রদীপ্ত শিখায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি আকুল-প্রাণে বালুকাময় নদীগর্ভে বসিয়া আছি।—বসিয়া কত কি ভাবিতেছি। সে আকাশ পাতাল ভাবনার শেষ নাই—কূল-কিনারা নাই। ভাবনার ঘোরাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, এমন সময়ে নিকটে একটা শৃগাল হঠাৎ ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।—সে বিকট চীৎকারে আমার চমক ভাঙ্গিল। তখন সন্ত্রাসে চারিদিকে চাহিলাম—দেখি—সম্মুখে একটা বিকট নর-কপাল খল্ খল্ অট্টহাস্যে জলন্ত আঁধার রাশি লহরে লহরে উদ্গীরণ করিতেছে। সে জলন্ত আঁধার লহরী যেন অনন্ত ছায়াপথ তরঙ্গায়িত করিয়া বিশ্ব-ত্রিভুবন গ্রাস করিতে ছুটিতেছে! ভয়ে, আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

কিন্তু হায়, এইত পরিণাম। এইত জীব-জগতের শেষ অবস্থা, তবে কিসের জন্য এত ভয়? এই নর-কপালেইত আমার পরিণাম!—নর-কপালইত আমার এই যত্নে রক্ষিত সোণার শরীরের শেষ পরিণতি হইবে!

দুদিন পরে এই প্রজ্জ্বলিত আঁধার তরঙ্গে আমার হৃদয় আঁধারে মিশিয়া খেলিতে থাকিবে। আজ প্রধূমিত আঁধার-রাশিতে বেষ্টিত আছি,—কাল এই আঁধারই আবার ধূ ধূ জ্বলিয়া আমার শেষ করিবে। তখনত উভয়ে মিলিয়া এই অদ্ভুত বিশ্ব-রহস্যের আঁধারমাখা সঙ্গীত আঁধারমাখা ঘোর অট্টহাস্যে গাহিতে থাকিব। তখনত উভয়ে কেমন ভাই-ভাই প্রাণে-প্রাণে মিলিয়া প্রীতি-আলিঙ্গন করিতে থাকিব। আজ তোমার সহবাসে ঘৃণা করি, তোমাকে দেখিলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠি, কাল কিন্তু তোমারই মুখে মুখ দিয়া প্রীতি-ভরে চুম্বন করিব। হায়, তবে এ বৃথা ভয় কেন?

"ভয়! আমায় দেখিয়া ভয়।" সহসা যেন এই কথা বলিয়া সেই নর-কপাল বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। তখন আমার কি হইল জানি না। কেন তেমন হইল তাহাও বলিতে পারি না। মুহূর্ত্তমধ্যে এ ত্রিসংসার ভুলিয়া গেলাম—আমার আমিত্ব উড়িয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ভীম নরকপালের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখি, সেই বিকট নর-কপাল যেন ক্রমিক বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সূর্য্যোদ্ভাসিত প্রদীপ্ত রজতগিরির ন্যায় এক মহাভয়ঙ্কর ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।—সেই বিরাট-শরীরে এই অনন্ত জগৎ বিশ্ব সংসার পরিব্যাপ্ত হইয়াছে! সেই মহাভীম বিরাটপুরুষের সর্ব্বাঙ্গে প্রদীপ্ত চিতাভস্ম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিতেছে—যেন জলন্ত রজত-তুফান সেই মহাকাশের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতেছে।—গলদেশে প্রলম্বিত নৃমুণ্ডমালা কঙ্কালসার কোটীবদনে নীলাভ চিতাগ্নি-শিখা জ্বালিয়া বিশ্বসংসার দগ্ধ করিতেছে! গগনব্যাপী ভীম জটাজুট শত-সূর্য্য-প্রদীপ্ত প্রজ্জ্বলিত শিখার ন্যায় অনন্ত ব্যোমপথে ছুটিতেছে। আর সেই বিরাট-মূর্ত্তির ভীমভুজদ্বয় অনন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। চক্ষু মুদিলাম। কতক্ষণ পরে আবার চাহিলাম। তখন দেখি,—সেই বিরাট পুরুষের এক হস্তোপরি এক দিব্য পরমসুন্দর শিশু স্ফুটিতোন্মুখ পদ্মকোরকের ন্যায় হাসিতেছে। সে হাসিতে কত সুধা ক্ষরিতেছে—কত মুক্তা ঝরিতেছে—কত চন্দ্র হাসিতেছে—কত পারিজাত ফুটিতেছে! সে সুধামাখা প্রাণহরা অর্দ্ধস্ফুট হাস্যধ্বনিতে কত ভ্রমর মধুর ঝঙ্কার দিতেছে—কত সুন্দর ক্ষুদ্র পাখী স্বর্গীয় স্বর-লহরীতে আকাশ মাতাইয়া গাহিতেছে। কুসুম সুষমা-গঠিত শিশু যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের সুদূর স্বর্গীয় সঙ্গীততরঙ্গে ভাসিতেছে! আর অন্য হস্তোপরি এক পূতিগন্ধময় ভীষণাকার গলিত শব বিকটদশন-পংক্তি বিস্তার করিয়া বিভীষিকাময় অট্টহাস্যে বিশ্বচরাচর সন্ত্রাসিত করিতেছে। সে হাসিতে ঝলকে ঝলকে জলন্ত আঁধার ছুটিতেছে—ঘন-ঘোর চিতাধূম উদ্গারিত হইতেছে—মহাশ্মশানের মহাভয়ঙ্কর প্রেতমূর্ত্তি নাচিতেছে। সে বিকট হাস্য-ধ্বনিতে কত শৃগাল পৈশাচিক মুখব্যাদানে বিকট চীৎকার করিতেছে—কত ভীমাকার কাক বিকৃতস্বরে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

তখন দেখিতে দেখিতে দেখি, সেই বিরাট-পুরুষের সর্ব্বসংহারক বিরাট মুখমণ্ডল অনন্ত ব্যোমপ্রদেশ অতিক্রম করিল। সেই অনন্ত-যোজন-বিস্তৃত অতি ভীম-

ভয়ঙ্কর দ্রংষ্ট্রা-করাল বদনগহ্বরে নীলাভ-জলন্ত-অন্ধকার মহাবেগে ভীম-শব্দে আলোড়িত হইতেছে। সেই ঘোরাবর্ত্তনে কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বুদ্বুদের ন্যায় নিমিষে উত্থিত হইয়া জলিতেছে —আবার নিমিষেই নিবিয়া সেই অনন্ত-অন্ধকার গর্ভে কোথায় ডুবিয়া যাইতেছে! ঘুরিতে ঘুরিতে কত গ্রহ কত উপগ্রহ বিলীন হইয়া যাইতেছে। আবার কত গ্রহ হইতে কত উপগ্রহ সমুৎপাদিত হইয়া সেই ভীষণ অন্ধকারাবর্ত্তে ঘূর্ণাকারে ছুটিতেছে। কত সৌরমণ্ডল কত জলন্ত ধূমকেতুর প্রচণ্ড আঘাতে পলকে চূর্ণীকৃত হইয়া আণবিক আকারে পরিণত হইতেছে। কত অনন্ত কোটি কোটি চন্দ্র—কত অনন্ত কোটি কোটি পৃথিবী আপন আপন কেন্দ্রে ঘুরিয়া, কত কোটি কোটি সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঐককেন্দ্রিক হইয়া বৈদ্যুৎবেগে ঘুরিতেছে! আর কত পরার্দ্ধ কোটি কোটি সৌরজগৎ—এক নিত্য, অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত মহাশক্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া—কত পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ ক্রোশ পরিধি লইয়া ভীমবেগে ঘুরিতেছে! সেই অতিভীষণ আয়ত বদন-গহ্বরে কত কোটি কোটি যোজন-বিস্তৃত ছায়াপথ শুভ্রবস্ত্রের ন্যায় আঁধারবক্ষে ভাসিতেছে।—আর সেই দীপ্যমান্ নীহারিকামণ্ডল ভেদ করিয়া কত ঘূর্ণমান সৌরমণ্ডল মহাবেগে ছুটিয়া খেলা করিতেছে।

সেই কাল-পুরুষের সম্মুখে এক বিরাট ত্রিশূল।—অনন্ত-ভেদী সেই ভীমত্রিশূলের সুশাণিত অগ্রভাগে মহাপ্রলয়াগ্নি থাকিয়া থাকিয়া মহাভীমশব্দে সহস্র-শিখায় জলিয়া উঠিতেছে। কত শশী-সূর্য্য-সমন্বিত অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই করাল মুখমধ্যে বৈদ্যুতিক বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘন নিশ্বাস-প্রজ্বলিত ভীষণ নাসারন্ধ্র পথে ছুটিয়া বাহির হইয়া, সেই সম্মুখস্থ ভয়ঙ্কর প্রলয়-বহ্নি-শিখায় আহুতি দিয়া পড়িতেছে, এবং নিমেষমধ্যে সেই জলন্ত শিখা-তরঙ্গে নিলীন হইয়া মহাবেগে তরঙ্গায়িত হইতেছে। কত পরার্দ্ধ যোজন বিস্তৃত অতি ভীষণ নাসারন্ধ্র দিয়া প্রদীপ্ত নীলাভ অন্ধকার নিশা মহাবেগে ভীমশব্দে বাহিরিতেছে; সেই জলন্ত নিশ্বাস-তরঙ্গে কত প্রলয় বিষাণ এককালে ধ্বনিত হইতেছে! সেই প্রলয়-নিশ্বাসে কত জলন্ত উল্কাপিণ্ড—কত প্রজ্জ্বলিত ধূমকেতু তড়িত-বলে ছুটিতেছে, এবং তাহাদেরই প্রচণ্ড আঘাতে কত রাশিচক্র পলকে ভস্মীভূত হইয়া অণু পরমাণু আকারে সেই প্রজলিত মহা প্রলয়াগ্নি-শিখায় বিলীন হইতেছে।

কি প্রহেলিকাময় ভীষণ দৃশ্য! কি অদ্ভুত মহান্ বিশ্বরহস্য!! পলকের জন্য এই অচিন্তনীয় মহান্ দৃশ্য চক্ষে ভাসিল—আবার পলক মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে যুগপৎ হৃদয় স্তম্ভিত হইল—সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। চক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জগৎসংসার মহাবেগে ঘুরিতে লাগিল। সন্ত্রাসে চক্ষু মুদিয়া আসিল। ধারণাশক্তি লুপ্তপ্রায় হইল। তখন এই অনন্ত সংসার কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য আপন সত্বা বিস্মৃত হইলাম। সকলই যেন ছায়াবাজির খেলা—সকলই যেন ভীষণ জাগ্রত-স্বপ্নের ভয়াবহ দুঃস্বপ্নমাখা স্মৃতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।"

এই বিষম অবস্থায় শূন্যপ্রাণে সংজ্ঞা-

শীনের ন্যায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রাণের ভিতর দিয়া কি জানি কেমন একটা বিদ্যুৎ যেন চমকাইয়া গেল। প্রতি অসাড় অবশ শিরার ভিতর দিয়া কি এক অভিনব শক্তি যেন ছুটিয়া গেল। তখন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকাইয়া উঠিলাম। মুদিত নয়ন বিস্ফারিত হইল।—দেখি, সেই শ্মশানপার্শ্বেই বসিয়া আছি—জলন্ত অন্ধকাররাশি আমাকে ঘেরিয়া তেমনই নৃত্য করিতেছে। এবার আঁধারময় ক্ষুদ্র হৃদয় দিগন্তব্যাপী বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার দেখিয়া নাচিয়া উঠিল—মহাপ্রকৃতির ভীষণতা-মাখান, শান্ত, সুন্দর সুগম্ভীর ভাবে বিমোহিত হইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত অনন্ত অন্ধকারে—এই ক্ষুদ্র হৃদয়ব্যাপ্ত শান্ত অন্ধকার আকৃষ্ট হইল। ক্রমে অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র প্রাণ সেই অনাদি অনন্ত অন্ধকারের মহাপ্রাণে মিশিতে লাগিল।—যেন পরমাত্মায় জীবাত্মার সমাবেশ হইতে লাগিল। তখন শিহরিতশরীরে—স্তম্ভিতহৃদয়ে ডাকিলাম,—"প্রভো। অনাদি অনন্ত দেব! তুমি কোথায়?"

অকস্মাৎ সেই সুপ্রশান্ত সুগভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। এই শব্দাঘাতে সেই নির্ব্বাত নিষ্কম্প অনন্ত শূন্যদেশ তরঙ্গায়িত হইল। তখন সেই অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া—অনন্ত প্রদেশ আলোড়িত করিয়া—অনন্ত ব্যোমপথে ধ্বনিত হইল—"তুমি কোথায়?" বায়ু কাঁপিয়া উঠিয়া শন্ শন্ শব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"তুমি কোথায়?" কল্লোলিনী যেন ঐ শব্দময়ী সঞ্জীবনী-শক্তিবলে প্রাণ পাইয়া ক্ষুদ্র বীচিমালা বক্ষে দোলাইয়া স্বর্গীয় সুমধুর সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল—"তুমি কোথায়?" বিদ্যুদ্দাম নিমেষের জন্য অন্ধকার-পরিব্যাপ্ত মেঘমণ্ডল বিতাড়িত করিয়া তীব্র-হাস্যচ্ছটায় বিশ্বভুবন ত্রাসিত করিয়া হাসিয়া বলিল—'তুমি কোথায়?"

এই শব্দে সম্মুখস্থিত সেই ভীষণ নরকপালটাও যেন আমার প্রতি চাহিয়া খল্ খল্ বিকট-হাস্যে হাসিয়া উঠিল। বড় ভীত হইলাম। তখন, সেই ভয়ভঞ্জন বিপন্নবান্ধব অনাথনাথকে একমনে ডাকিতে লাগিলাম। "দয়াময়, পাপীর গতি, কোথায় প্রভু?" পাপীর সে ডাক বুঝি দয়াময় শুনিলেন। তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে চাহিয়া দেখি—হৃদিসরসে এক শোভাধার প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভাসিতেছে। সেই নীলোৎপলোপরি কিরীটকুণ্ডলধারী নীলিমাময় এক চতুর্ভুজ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্মিতবদনে বিরাজ করিতেছেন। সেই সান্তের ভিতর অনন্ত পূর্ণপুরুষের নীলাভ অনন্ত জ্যোতিতে ক্ষুদ্র হৃদয় স্তম্ভিত হইল। সম্মুখে অন্ধকার-বক্ষে সেই নীলিমাময় কমনীয়-কান্তি অপূর্ব্বমূর্ত্তি ভাসিতেছে।—পরম পুরুষের চারু-হাস্যচ্ছটায় দিগন্তব্যাপ্ত জলন্ত অন্ধকার হাসিতেছে। সেই নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব বপুতে পূর্ণপুরুষের পূর্ণবিকাশ। যেদিকে তাকাই, প্রতি পদার্থেই সেই শান্তির উৎস সৌমবপু অনন্তপুরুষ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিলাম—অনন্ত আকাশে সেই অনন্তদেব পূর্ণজ্যোতিতে বিরাজ করিতেছেন। নদ, নদী, পর্ব্বত, তরু, লতা, ফল, পুষ্প, শস্য—চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থেই সেই মহাপুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন। প্রতি বালুকণা, প্রতি জলকণিকা, প্রতি হিমানিবিন্দুতে

সেই অনন্ত তেজঃপুঞ্জ পরমপুরুষ অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন। অন্ধকারের জলন্ত আঁধারময় প্রতি অণু পরমাণুতে সেই দ্যুতিমান্ পূর্ণ-পুরুষ সুন্দর পরিস্ফুটভাবে বিকসিত রহিয়াছেন।—কোটি কোটি চন্দ্র যেন সুধামাখা জ্যোৎস্না ছড়াইয়া সেই অন্ধকারবক্ষে ভাসিতেছে! তখন সবিস্ময়ে প্রাণ আকুল হইল। সেই অনাদি অনন্ত পুরুষের নীলাভ জ্যোতির্ম্ময় রূপচ্ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া গেল। মনে মনে সেই অনন্ত দেবের চরণে শত সহস্র প্রণাম করিলাম।

চক্ষু চাহিলাম। কিন্তু কৈ, সে মোহন মূর্ত্তি প্রেমের উৎস সবিতৃমণ্ডলমধ্যস্থ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কোথায়? কেবল সেই ঘোর অন্ধকার। সর্ব্বভুবনগ্রাসী অনন্ত অন্ধকার। সকলই আবার সেই জলন্ত অন্ধকারের অনন্তগর্ভে জলিতেছে। কিন্তু এবার অন্ধকার বড় ভাল লাগিল।—অন্ধকার দেখিয়া পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠিল। যেন প্রতি অন্ধকার-কণিকাতে সেই সর্ব্ব-ভুবন-মনোহর প্রসন্নানন জ্যোতিষ্মান্ মূর্ত্তি অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিতেছেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভারতের সৈনিক-বিভাগ।

কোষকার লিখিয়াছেন, 'বল' শব্দের অন্যতর অর্থ—সৈন্য। তোমার আমার পক্ষে যাহাই হউক, রাজাদিগের পক্ষে অর্থটা বড়ই সঙ্গত। যদি রাজ্য বিস্তার করিয়া সুশৃঙ্খলে তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সৈন্যবলের ন্যায় রাজার প্রধান সহায় আর নাই। অর্থবল বড় বল বটে, কিন্তু অর্থ আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না। রাজ-অর্থের অনেক শত্রু। সেই শত্রুহস্ত হইতে তাহা সুরক্ষিত রাখিবার একমাত্র উপায় সৈন্যবল। মুসলমানের অর্থের অপ্রতুল ছিল না, তাহার কোষাগার বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাহার সৈন্যবল শেষ সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, মুসলমান তাহার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারিল না, যে প্রকৃত বলবান্ সে আসিয়া তাহা কাড়িয়া লইল। ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে রাজা হীনবল তাহার পক্ষে রাজ্যবিস্তার তো দূরের কথা, করপ্রাপ্ত রাজ্য রক্ষা করাও বড় কঠিন। পায় পায় শত্রু। সকলেই লোলায়িত দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে, কি সুযোগে মুখের গ্রাস ছোঁ মারিয়া লইবে তাহার ফিকির খুঁজিতেছে, এমন অবস্থায় বিশিষ্ট সৈন্যবল না থাকিলে তাহার রাজ্য আর কি টিকে? সৈন্য রাজ্যের প্রাণ। সৈন্যবল না থাকিলে রাজার রাজ্য রক্ষা হওয়া বড়ই কঠিন।

কাজেই রাজ্যের অন্যান্য বিষয় চিন্তার পূর্ব্বে সেই রাজ্য যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য রাজা মাত্রেরই সর্ব্বপ্রথমে সৈন্যবলসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু উপযুক্তরূপ সৈন্য রাখিতে হইলে, খরচ আছে। সৈন্যদিগের বেতন, খোরাক পোষাক দিতে হয়, তাহারা তাহাদিগের

শিক্ষার জন্যও অনেক ব্যয় আছে। সৈন্য যখন রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, তখন তাহার জন্য ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া রাজার উচিত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আবার অযথা ব্যয়ও কর্ত্তব্য নহে। সৈন্যগণ দৃঢ়িষ্ঠ, সুশিক্ষিত ও সমরপটু হইবে, ইহার জন্য সম্ভবমত যে ব্যয় আবশ্যক তাহা অগ্রে করিবে, কিন্তু অন্যায় ব্যয় করিয়া রাজ্য অর্থশূন্য করিবে না। প্রজার অর্থেই রাজার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়, প্রজারাও ন্যায্য খরচের জন্য অর্থ দিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু ন্যায়ের নামে লইয়া রাজা যদি সেই অর্থের যদৃচ্ছা অপব্যবহার করেন তাহা হইলে তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। রাজার অর্থের আবশ্যক হইলেই প্রজাদিগকে তাহা যোগাইতে হইবে, যাহা ন্যায্য খরচ, কি করিবে কাঁদিয়া ককাইয়াও তাহা দিতে হইবে, কিন্তু রাজা যদি না বুঝেন, দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা ব্যয় করেন তাহা হইলে প্রজারা পারিবে কি প্রকারে? প্রজারা জানে, রাজ্যের জন্য সৈন্যবল বিশেষ প্রয়োজন। কেবল রাজার জন্য নহে, তাহাদিগেরও জন্য বটে। রাজ্য রক্ষা না হইলে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবে না, কথায় কথায় ভিন্ন দেশীয়েরা আপতিত হইয়া লুঠ পাট করিবে, দাঙ্গা লড়াই বাধাইবে, স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রাণে মারিবে, যদি জয় করিতে পারে নূতন রাজ্য শাসনের জন্য না জানি কতই কঠোর নিয়ম স্থাপনা করিবে। কাজেই সেই বিপদ হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য রাজ্য রক্ষার প্রধান সহায় স্বরূপ সৈন্য রাখিবার নিমিত্ত পেটে না খাইয়াও তাহারা রাজার হস্তে অর্থ প্রদান করে। রাজা সেই অর্থেই সৈনিক বিভাগ রক্ষা করেন। সুতরাং সে অর্থ খরচের পূর্ব্বে রাজার বুঝা উচিত, তিনি যাহা হয় করিবার কর্ত্তা বটে; কিন্তু তিনি প্রজাদিগের প্রতিভূ ভিন্ন আর কিছুই নন। অযথা দু টাকার স্থানে চারি টাকা ব্যয় করিয়া প্রজাদিগকে করভারে পীড়িত করিলে তিনি ধর্ম্মের দুয়ারে দায়ী।

ভারতের সৈনিক-বিভাগে আমরা এই নীতি-বহির্ভূত কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ভারতরাজ সুসভ্য, ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, অথচ আজও তাঁহারা কিরূপে এমন অন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। ভারতের প্রজা দীনহীন গরিব, অথচ তাহাদিগের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। রাজা যে কর চাহিতেছেন, নীরবে তাহাই দিতেছে,—সৈন্য রাখিবার জন্য যে খরচ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা সে জানে, নিজে এক সন্ধ্যা খাইয়াও সে ব্যয় দিতেছে। কিন্তু ইংরাজ সে টাকার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া বাহুল্য খরচ করিলে সে কুলাইবে কেমন করিয়া? তথাপি কথা নাই। এক সন্ধ্যা খাইত, শেষ সেই এক সন্ধ্যা আধপেটা খাইয়াও কর দিল। ইংরাজ তথাপি ছাড়ে না, বলে—আরো দাও। কাজেই সে আধপেটা আহারও বন্ধ হয়। এদিকে ইংরাজ সেই প্রজার বুকের রক্ত-শোষা টাকায় আপনাদিগের জাতি-ভায়াদিগের উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহাই কি ইংরাজের উচিত?

ইংরাজ বলিবেন, 'যখন জান, সেনা নহিলে রাজ্য রক্ষা হয় না, তখন তাহার জন্য খরচ না করিলে চলিবে কেন?' খরচ করিতে তো কেহ বারণ করিতেছে না।

তাহাতে শুধু রাজার কেন, যে প্রজা স্ত্রী পুত্রকে পেটে মারিয়া কর দিতেছে তাহারও স্বার্থ আছে। যাহা ন্যায়ের কথা, যাহা না হইলে নয়, তাহাতে কে আপত্তি করিবে? কিন্তু ইংরাজ যদি বুঝিতেন, যদি সে অর্থের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, ভারতের সৈনিক বিভাগে যাহা ন্যায্য খরচ তাহাই যদি প্রজাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আর এ আর্ত্তনাদ উঠিত না; প্রজারা যেন নির্ব্বাকে যাহা বলিতেছ তাহাই শুনিতেছে, কিন্তু তাহা হইলে আর মর্ম্মের ভিতর হইতে এরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস বহিত না। ইংরাজের ভারতীয় সেনা বিভাগে ব্যয় অতি বিচিত্র। ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদের ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৭৬ জন সেনা আছে। ইহার মধ্যে গোরা ৬৩ হাজার ৭১ জন, আর নেটিভ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪০৫ জন। যথা—

	গোরা			নেটিভ
গোলন্দাজ—	১১৩০৯	...	.	১৮৬১
অশ্বারোহী—	৪৬৯২	...	...	১৮৫৭৫
ইঞ্জিনিয়ার—	২৮৪	...	...	৩২৫১
পদাতি—	৪৬৭৬৬	...	...	১০৩৭১৮
মোট	৬৩০৭১			১২৭৪০৫

দেখা যাইতেছে, দেশীয় সৈন্য সংখ্যায় অধিক,—বৃটীশ সৈন্যসংখ্যার তুলনায় দ্বিগুণ। সকল শ্রেণীতেই দেশীয় সৈন্য বেশী, কেবল গোলন্দাজ শ্রেণীতে কম। ৫ গুণেরও অধিক কম হইবে। দেখিবামাত্র হঠাৎ মনের ভিতর কেমন একটা কারণ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হয়। দেশীয়গণ কি ভাবে ভাল গোলন্দাজ হইতে পারে না? ইংরাজ এতদুত্তরে যাহাই বলুন, কিন্তু কথাটা মনে লাগে না। বুঝি, আর কোন গূঢ় কারণ আছে। সিপাহী-মিউটিনীর পূর্ব্বে সৈন্য-তালিকা এরূপ ছিল না। তখন দেশীয় গোলন্দাজই বেশী ছিল। কিন্তু এখন তাহার এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কেন? কামান ইংরাজের বজ্রাস্ত্র, সেই কামান চালান ইংরাজ সহজে অন্যকে শিখাইতে চাহে না। সিপাহীবিদ্রোহ হইতে ইংরাজের এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। বুঝি, তাই গোলন্দাজ শ্রেণীতে দেশীয়দিগের সংখ্যা এত কম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে কথা থাক। এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতের এই ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৭৬ জন সেনার খরচ কত পড়ে। যাহা পড়ে তাহা অবশ্য সমস্তই ভারতকেই দিতে হয় ইংলণ্ড তাহার এক ফার্দিংও দেন না। ভারতকে এই জন্য বৎসরে ২০ কোটী টাকা যোগাইতে হয়। একি সাধারণ কথা। শুনিলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়, এই ২০ কোটী টাকার মধ্যে মাত্র পাঁচ কোটী টাকা ১ লক্ষ ২৮ হাজার নেটিভ সৈন্যের জন্য খরচ হয়, আর বাকি ১৫ কোটী ৬৩ হাজার গোরা সৈন্যের সেবায় ব্যয়িত হয়। ভগবান্ জানেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে।

বলিবে, বৃটীশ সেনা রাখিতে সহজেই বেশী খরচ পড়ে। অন্যান্য য়ুরোপীয় রাজ্যের মত বৃটনে সৈন্য-সংগ্রহের সুবিধা নাই। অন্যান্য দেশে রাজা যাহাকে ইচ্ছা পল্টনে ভর্ত্তি করিতে পারেন, কিন্তু বৃটীশ পার্লেমেণ্ট এ ক্ষমতা হইতে রাজাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই সৈনিক সংগ্রহ করিতে সেখানে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ড হইতে ভারতে

সৈন্য পাঠাইতেও অল্প খরচ নয়। উত্তম কথা। কিন্তু কথাটা কি, এত খরচ পত্র করিয়া বৃটীশ সৈন্য নাই বা পাঠাইলে। ভারতে যে বৃটীশ সৈন্য আছে সে তো কেবল সম্ভ্রমের ঠাট মাত্র। একটা কথা আছে—কাজে কুড়ে ভোজনে দেড়ে। ভারতের বৃটীশ সেনা অধিকাংশ তাহাই। কাজের বেলায় কেবল হাঁক ডাক সার, হাতে হেতেড়ে বড় একটা সহজে কিছু হইয়া উঠে না, অথচ এক একজন এক একটী কুম্ভকর্ণের উদর লইয়া বসিয়া আছেন, সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতেছেন, তথাপি কিছুতেই পেট ভরে না। শীতের প্রবল উত্তুরে বাতাসে, প্রাবৃটের ভীষণ বর্ষাবাতে, নিদাঘের অনলবর্ষী খররৌদ্রে অনাহারে বা কদন্ন ভোজনে প্রাণান্তিক কষ্ট সহিবার বেলা নেটিভ, আর পুরস্কার ও বাহবা লইবার সময় গোরার দল। যুদ্ধ করিতে, তোপের মুখে যাইতে, মরিতে আগে কালা সম্প্রদায়, আর উপাধির বেলা রবার্টসের দল। তাই বলিতেছিলাম, এ বৃটীশ সৈন্য রাখিয়া সম্ভ্রমের ঠাট বজায় রাখিবার কি প্রয়োজন? রাখিতে হয়, রাখ, কিন্তু তাহার জন্য দরিদ্র প্রজার কলিজার অধিক প্রিয় এত পরিশ্রমের অর্থ জোর করিয়া গ্রহণ করা কি রাজধর্ম্ম? তোমাদের কটা যুদ্ধ তোমরা বৃটীশ সৈনিকের রণদক্ষতায় জিতিয়াছ? আজ তোমারা কেন, যদি ভারতের সৈনিক তোমাদিগের জন্য অস্ত্র না ধরিত, তোমার ক্লাইভ কি কখন এখানে স্থান পাইতেন? তার পর, এত দিন ধরিয়া তো দেশীয় সৈনিকের বল ও সমরপটুতা দেখিলে, সে দিনের মিসর-যুদ্ধে কি হইল? ভারতের সৈনিক সেই বিজাতীয় ভূমে কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রচার করিয়া আসিল? অন্যে নয়—তোমাদিগেরই জেনেরাল তাহাদের কত প্রশংসা গাহিলেন, মহারাণীও কত সাধুবাদ করিলেন,—তবে দেখিয়া শুনিয়াও কি ইহাদের বলে সন্দেহ হয়? ভারতে এত ব্যয়ে বৃটীশ সৈন্যের কিসের প্রয়োজন?

তবে একটা কথা আছে। সকল দিক্ আট ঘাট বাঁধিয়া কাজ করা উচিত। পরে পস্তান বড় দোষ। বলিবে, 'ভারতীয় সৈন্যের উপর এতই কি বিশ্বাস! তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া যদি বৃটিশ সৈন্য সব ছাড়াইয়া দিই, আর, তার পর যদি ভারতীয় সৈনিকেরা বিপক্ষ হইয়া বসে, তখন উপায়? বিদেশ বিভূঁই—কে রক্ষা করিবে? শেষ সপরিবারে ভারত-সাগরে ডুবিয়া মরিতে হইবে, শ্বেতদ্বীপে ফিরিয়া সে সংবাদ দিবার জন্যও এক প্রাণী থাকিবে না। বৃটিশ সৈন্য ছাড়াইয়া দিয়া এই সাত সমুদ্রপারে নিঃসহায় অবস্থায় থাকিব কোন্ যুক্তিবলে? ইহাদের উপর এতই কি বিশ্বাস?' কথাটা তোমাদিগের পক্ষে সঙ্গত বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমরা কি আজও ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারিলে না? তোমরা নাকি অকৃতজ্ঞ, তাই এ কথা বল, তাই ভারতবাসীর রাজভক্তিতে সন্দেহ কর। "মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"—আমনু চিরকাল যাহারা এই কথা বলিয়া আসিতেছে তাহাদের রাজভক্তিতে সন্দেহ করিও না। এক [illegible] Ninteenth Century নামক কাগজে তোমাদেরই একজন স্বজাতীয়—মহামতি হাইণ্ডম্যান-তোমাদিগকে ভারতীয়ের অচলা রাজভক্তির বিষয় অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেক

কথা বলিয়াছিলেন। বেশি দিনের কথা নয়, স্মরণ আছে তো। দুঃখ হয়, সে কথা আর তুলিয়া কি করিব? তোমরা কে—কোথায় ছিলে—সামান্য বণিক্ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ভারতে কেমন করিয়া এ অটল রাজ্য স্থাপন করিলে—সে সব মনে পড়ে না কি? মনে পড়ে না কি, পলাশীর সেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইতে কি রাজপুতানায়, কি মহীশূরে, কি মারহাট্টাভূমে, কি পঞ্চনদে, সাগরে, ভূধরে, মরুভূমে যেখানেই তোমাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে, সেখানেই ভারতীয়গণ কর্ত্তৃকই সে ধ্বজদণ্ড প্রোথিত হইয়াছে। অধ্যাপক সিলী (Seeley) যথার্থই বলিয়াছেন, ভারত ভারতীয় কর্ত্তৃকই বিজিত হইয়াছে। তবু—তবুও অবিশ্বাস! তবুও সন্দেহ!

ইংরাজ এক সিপাহীবিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। কিন্তু, মূলে সে দোষ কাহার? তোমরা আপনাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে—ভারতবাসীর যাহা প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী সেই ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবে—দোষ কাহার? কিন্তু তাও বলি, সে কটা রেজিমেণ্ট—কটা সিপাই ক্ষেপিয়াছিল? তাহাতেই যখন তোমরা পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিলে, আজও যখন তাহার শঙ্কা ঘুচে না, তখন এক লক্ষ ২৮ হাজারের কাছে তোমাদের ৬১ হাজার কোথায় লাগিবে? সকলে মিলিয়া ফুৎকার দিলে ও মুষ্টিমিত সৈন্য কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহা ভাবিয়াছ কি? মনে করিও না যে, তেমন দিন আসিলে উহারা তোমাদিগের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। কিন্তু সে ভয় তোমাদের নাই। ভারত সে দেশ নহে। ভারতীয়েরা তেমন জাতি নহে। তবে তোমরা নাকি শঙ্কা কর, সন্দেহ কর, অবিশ্বাস কর, তাহাই এ কথা বলিলাম। ভাল, তোমাদিগের ভিতরে ভিতরে যদি সেই ভয়ই থাকে, একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে সে ভয়ের কোন কারণই দেখিতে পাইবে না। সে যখন ছিল, তখন ছিল, এখন আর তাহা নাই। কেন নাই তাহা ভারতের সৈনিকদিগের অধুনাতন শ্রেণী ও অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই সহজে স্পষ্ট বুঝা যায়।

মিউটিনীর পূর্ব্বে প্রায় এক দেশ ও এক জাতি হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। অযোধ্যা ও পঞ্জাবই তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী ভিন্ন অন্য জাতীয় সৈন্য প্রায় ছিল না। কিন্তু এখন আর সে ব্যবস্থা নাই। এখন, নানা জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। এক রেজিমেণ্টে চারি পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখা যায়। এক বেঙ্গল আর্মির পদাতি দল আট কোম্পানি, এবং অশ্বারোহী দল আট ট্রুপে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগ স্বতন্ত্র জাতি লইয়া গঠিত। শিখ, পাঠান, পঞ্জাবী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী, দোগরা, এবং গুরখা—এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতিতেই আজিকার সৈন্য-অঙ্গ সংগঠিত। ইহাদের দেশ স্বতন্ত্র, ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এক জাতি অন্য জাতিকে হিংসা করে, এক জাতি অন্য জাতিকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে, এক জাতি অন্য জাতির ছায়া মাড়াইলেও আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। কেহ কাহারও অনুরক্ত নহে, কেহ কাহারও মতানুবর্ত্তী নহে, কেহ কাহারও মঙ্গলপ্রার্থী নহে। সবাই বিধর্ম্মী, বিজাতি,—

মত, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যে পরস্পর-বিরোধী। কখনও এই সকল জাতি যে এক হইয়া, এক মন্ত্র সাধনা করিয়া, এক উদ্দেশ্যে প্রাণ ঢালিবে সে আশাও নাই, সে ভরসাও নাই, সে ভয়ও নাই। তবে, কেন তোমরা ভীত হও, কেন তোমরা সন্দেহ কর? আর, তোমরা এত বুঝ, সত্যই কি তোমরা এই সহজ কথাটা বুঝিতে পার না? পার বৈ কি। তবে কথাটা এই, যে, বৃটীশ সৈন্য রাখিতেই হইবে। ভারতের টাকায়, যেমন করিয়া হউক, স্বজাতির উদর পুরাইতেই হইবে। তবে লোকে বলিলে তাহার একটা জবাব দেওয়া ত চাই। ও তাই! কথার কথা—স্তোকবাক্য—ছুতা।

ক্রমশঃ

দুইখানি ছবি।

(১)

অশ্রু-প্রস্রবণ।

যুবার আকৃতি অশ্রু-প্রস্রবণে
হইতেছে পরিণত,
যুগল নয়নে উথলিত ধারা
ধীরে ধীরে প্রসারিত,
ললাট শ্রবণ মস্তক কুন্তল
হয় নাই চিহ্ন-হারা,
অবশিষ্ট দেহ হ'যে বিগলিত
হইয়াছে অশ্রুধারা;
সম্মুখে দাঁড়াযে বিহ্বল আকার—
রমণী যুবায় হেরে,
বিস্ময়ের সহ উথলি সলিল
বিন্দু বিন্দু গণ্ডে ঝরে॥

চিত্র তলে লেখা—
"কাঁদালে কাঁদিবে হাসালে হাসিবে
বিধাতার নিবন্ধন;
স্নেহে অনাদর করিলে কি দশা
হের অশ্রু-প্রস্রবণ॥"

(২)

বিশাল প্রান্তর জ্যোতি বিভাসিত
মধ্যস্থলে বসি তার,
কবি গাহে গান আপনার মনে
স্তব্ধ বিশ্ব চারি ধার,
শুনিতে সে গান রবি শশী তারা
তড়িৎ জলদ রাশি
নামি শূন্য হ'তে কবির চৌদিকে
কিরণে রয়েছে ভাসি;
ছায়ার আকারে কানন ভূধর
সাগর তটিনী সর—
দেশ মহাদেশ কুটীর প্রাসাদ
কীট পশু পক্ষী নর
বেষ্টিয়া কবিরে ভাসে শূন্যপটে
যেন অচেতন প্রাণ,
বসি তার মাঝে আপনার মনে
কবি গাহে প্রেম-গান।

ঈশান।

---

* Ovid's Metamorphoses অনুকরণে লিখিত।

পিয়ারা বেগম।

উদ্যানে চাঁদ উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, লতা দুলিতেছে, নদী হাসিতেছে—বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায়, প্রাণে প্রাণে হাসি মিশাইয়া গিয়াছে। যেন সুদূর হইতে কাহার হাসি গড়াইয়া আসিয়া মর্ত্ত্যে তাপিতের প্রাণ শীতল করিতেছে, মেঘ মন্দ মন্দ ভাসিয়া যাইতেছে, চকোর উধাও হইয়া তাহার সুধা পান করিতেছে। সুদূর শূন্য হইতে যেন কিসের ঢেউ উঠিয়াছে,—বুঝি স্বর্গের বাতাস বহিতেছে! এক দিক হইতে একটি পুরুষ ও অপর দিক হইতে একটি রমণী আসিয়া সেই থানে দাঁড়াইল। হাতে হাত দিয়া, গাছের তলায়, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল,—লতাগুলি ঝুলিয়া পড়িল, ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িল, রমণীর চিকুরদাম বাতাসে উড়িতে লাগিল,—তাহার পর—তাহার পর, উভয়েই ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

আমাতে ও সুরৎমলে খুব ভাব। ছেলেবেলা হইতে এক সঙ্গে শোয়া, এক সঙ্গে বসা, ও এক সঙ্গে পড়াশুনা হইত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বাল্যকালের সরলতা হারাইয়া ফেলে—কিন্তু আমাদের তাহা আদৌ ঘটে নাই। সজীব, অথলতাপূর্ণ দুইটী সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মত চিরদিনই হাসিয়া বেড়াইতাম। আমার পিতা ও সুরতের পিতা পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা আমাদের পরস্পরের এই মিলনে সাতিশয় আনন্দিত হইতেন। আমি কোন দিন সুরতের মাতাকে 'মা' বলিয়া তাঁহার কোলে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতাম, সুরৎও সেইরূপ কতদিন আমার মাতার কোলেতে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইত। তাহাতে উভয় জননীরই যে কি আনন্দ হইত, তাহা আর কি বলিব! কেহই মনে করিতেন না যে, এটী আমার ছেলে ও ওটী পরের ছেলে। দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে আমরা বড় হইলাম।

২

মুসলমান রাজত্বে আমাদের বাস। আমাদের উভয়ের পিতাই আওরঙ্গজীবের অধীনে ক্ষুদ্র জাইগীরদার, প্রজা। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে আমাদের জনকদ্বয় আমাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা ঢাল, তলওয়ার, বর্শা, সড়কি প্রভৃতি মহোল্লাসে শিক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে মাল, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ সবই অভ্যস্ত হইল। আমাদের রণখেলা দেখিয়া দর্শকগণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, সকলেই একবাক্যে আমাদের প্রশংসা করিত, তাহা শুনিয়া গুরু হৃষ্টচিত্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়েই আমরা উভয়েই অসাধারণ সাহসী ও বলবান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলাম। আমাদের বীরত্বে ও রণোল্লাসে বাদশাহ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

৩

দুই চারি দিনের মধ্যেই গোলকুণ্ডা দেশের রাজার সহিত বাদশাহের যুদ্ধ। সুরৎ ও আমি উভয়েই সেই যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। আমি আমার পিতার মত করিলাম—কিন্তু সুরতের পিতা নিষেধ করিলেন, "এ যুদ্ধে তোমরা যাইতে পাইবে না।" পরে সুরতের পিতার দেখাদেখি আমার পিতাও আমাকে কি ভাবিয়া যাইতে দিলেন না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—বোধ করি আমরা উভয়েই পিতার এক মাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহারা কিসের একটা আশঙ্কা করিলেন।

৪

আমি নিরস্ত হইলাম, কিন্তু সুরৎ কিছুতেই শুনিল না। রাত্রি প্রভাতে বাদশাহের সৈন্য যুদ্ধার্থে কুচ করিবে,—সন্ধ্যার পর আর সুরৎকে কেহ দেখিতে পাইল না।

৫

অনেক অনুসন্ধান হইল। সমস্ত রাত্রি সকলে মিলিয়া খুঁজিয়া বেড়াইলাম। সুরতের পিতা, আমার পিতা, অনুচরবর্গ এবং আমি নানা স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সুরতকে কোথাও পাওয়া গেল না। আমি বাদসাহের সৈনিকনিবাসে গিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তথাপি কেহই কোন খবর বলিতে পারিল না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, বাদশাহের সৈন্য রাজপথ জুড়িয়া খুব ঘোরঘটা করিয়া বীরদর্পে চলিয়া গেল। জগতের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া প্রাতঃসূর্য্য ধীরে ধীরে বড় বড় অট্টালিকার পার্শ্ব হইতে উত্থান করিতে লাগিল। মৃদু মধুর বাতাস বহিতে লাগিল। শেষ আমরা শূন্যমনে শ্রান্ত ক্লিষ্ট হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

হায়! সুরতের মাতার শোকের কথা আর এখন কেমন করিয়া বর্ণন করিব?—মাগী বুঝি তখন যথার্থই পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার আর অন্য কথা নাই, অন্য কার্য্য নাই,—'কেবল হা সুরৎ! হা সুরৎ'!—চোকের ধারার বিরাম নাই, বুকে করাঘাতের নিবৃত্তি নাই! আমার মাতা অশেষ সান্ত্বনা করিলেন, আমিও গিয়া কত বুঝাইলাম। শোকাতুরা কিছুতেই মানিল না। তাহার কাতরতা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে সকলেরই চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

৬

তাহার পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পিতা মাতার চক্ষের ধারা এক প্রকার শমিত হইয়া গিয়াছে.—আর কে কত চালিবে বল? প্রকৃতির এক দিক দিয়া ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, আবার অন্য দিক্ দিয়া সেইখান হইতেই নূতন সদ্যজাত ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। নহিলে পৃথিবী বাঁচিবে কি প্রকারে? দুঃখ রোগ শোক চারিদিকে, প্রতিপদে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিতেছে—এখানে এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে, প্রকৃতির চিরগঠনশীল হস্তের ক্ষণ মাত্র বিরাম পাইলে, হয়ত এতদিন আমরা কোথায় সরিয়া পড়িতাম! তিল তিল করিয়া অণু পরমাণু হইতে একটী জীব সৃজিত হইতেছে, তিল তিল করিয়া এক একটী অণু পরমাণু মধ্যেই আবার তাহা কোথায় মিলাইয়া, মিশাইয়া যাইতেছে! আমি ঘরে বসিয়া একখানি পার্শি কাব্য-

গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলাম, তাহার দুই ছত্র বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিলাম,—

'কাব্য নয়, চিত্র নয়, সকলি মোহের ভুলে—
আজি বা দুদিন বাদে রহিবে মাটির তলে।'

এমন সময়ে সেখানে কে আসিয়া দাঁড়াইল! ঘোর কালো ছায়ার ন্যায় একটী মনুষ্যাবয়ববিশিষ্ট আকৃতি আসিয়া উপরোক্ত দুই ছত্র কবিতার উদ্দেশ্যে বলিল,—

"ঠিক কথা, কিন্তু বন্ধন যে ছিঁড়িবার নয়!"

আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম—সুরৎ!—হাঁ সুরতই ত বটে।—সুরৎ! সুরৎ!—আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সে শরীর নাই, সে কান্তি নাই—সে তেজঃগর্ব্ব-বিস্ফারিত চক্ষু যেন চিরদিনের মত অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে—দেহ অস্থি-চর্ম্মমাত্রসার! কি পরিবর্ত্তন!

৭

সুরৎ আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। আমি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে নানা প্রশ্ন করিলাম। 'আমাদের ফেলিয়া এতদিন কোথায় গিয়াছিলে?'—এতদিন পরে কি মনে পড়িল?—আর, তোমার এ অবস্থাই বা কেন?'

সুরৎ কোন কথাই কহিল না, কেবল স্থির নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে কোন লক্ষ্য নাই, কোন ভাব নাই, কোন ভাষা নাই। স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে কেবল অনন্ত অন্ধকার বিরাজ করিতেছে!

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া সুরতের পিতা মাতাকে খবর দিলাম। তাঁহারা শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! বৃদ্ধ জনক জননী প্রত্যাশা করিতেছিলেন এক,—দেখিলেন আর! সে মূর্ত্তি দেখিয়া হতভাগিনী জননী আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না—উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

৮

সন্ধ্যার পর উষা, উষার পর সন্ধ্যা পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে,—সুরৎ এখন বাটীতেই বাস করে। আর কোথাও চলিয়া গেল না বটে, কিন্তু দিন দিন বড় কৃশ ও ক্ষীণ হইতে লাগিল।

ইহার কারণ?

আমি অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না, রোগও ত কিছু দেখিতে পাই না, তবে এ নির্জীবতারই বা কারণ কি?

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর আমি ভাবিলাম, একবার দেশ পর্য্যটন করাইয়া দেখি। নানা দেশ, নানা লোক এবং নানা জিনিষ দেখিয়া মন যদি একটু সুস্থ হইতে পারে। এ যে শারীরিক রোগ নয়, তাহা আমি এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন না আমার মনে হইতেছে, সুরৎ প্রথমে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়াছিল, "বন্ধন যে ছিঁড়িবার নয়!"

৯

সুরতের বন্ধন দড়ি কি, তাহা আমি ঠিক জানি না, তথাপি আমি এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ইহা—প্রেম! নহিলে এমন সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বসংহারকারী মূর্ত্তি আর কাহার? যে প্রেমের গুণে নদী বহিয়া যায়, ফুল ফুটিয়া উঠে, জ্যোৎস্নায় জগৎ

হাসিতে থাকে, সেই অসীম অনন্ত প্রেমের গুণেই আবার নদীতে ঘোর তরঙ্গ উঠে, প্রকৃতির মধ্যে ভীষণ প্রলয়কল্লোল উত্থিত হয়, মহেশ্বরের দীর্ঘ জটাঘটায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

১০

যদিও সুরৎ আমাকে কিছুই ভাঙ্গিল না, তথাপি আমি সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সুরতের পিতার নিকটে নিঃশঙ্ক-চিত্তে দেশ পর্য্যটনের কথা পাড়িলাম। তিনি শুনিয়া সম্পূর্ণ মত করিলেন।

তাহার পর সুরৎকে সব কথা বলিলাম। শুনিয়া, সুরৎ একটু হাসিল। বলিল,— "কেন?"।

আমি বলিলাম, "তুমি না বল, কিন্তু আমি এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। যাহার যেমন রোগ, তাহার তেমনি ঔষধও ব্যবস্থা।"

"বেশ।"

১১

অনেক দেশ পর্য্যটন হইল। শেষ ঘুরিতে ঘুরিতে দিল্লী সহরে আসিয়া পড়িলাম। মনে হইল, কিছুতেই ত কিছু হইতেছে না—শুনিয়াছি দিল্লীর অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নগর ত আর নাই, যদি এই স্থানে কোন রকমে সুরতের মন আকর্ষিত করা যায়!

সব বৃথা। দিল্লী সহরে পা দিয়াই সুরৎ বলিল, "আবার এখানে কেন? এখান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর—শীঘ্র পলায়ন কর।"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি দ্বিরুক্তি না করিয়াই তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সহিত সুরৎকে লইয়া দেশান্তরে চলিলাম।

১২

ঘোর বন। অনুচরগণ কেহই সঙ্গে নাই। কেবল সুরৎ আর আমি। ধীরে ধীরে শাখা পত্র সরাইতেছি আর অগ্রসর হইতেছি। সুরৎ পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে, আমি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছি।

কোথায়?

কেমন করিয়া বলিব, সে কোথায়! খালি হৃদয়ে অসীম সাহস আর সম্মুখে আশার মরীচিকা। সুরৎ বলিয়াছে, আজ তাহার অধিষ্ঠাত্রীকে দেখিতে যাইতেছে।

১৩

আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই—কেন না এ ঘোর বনে তাহার অধিষ্ঠাত্রী কেমন করিয়া থাকিতে পারে! কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমার সমূহ কৌতূহলের উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, যাইতেই বা ক্ষতি কি? নিতান্ত দুর্ব্বলকায় নহি যে, বন্য পশুতে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। রাজপুত—সশস্ত্রে আছি, তাহাতে ভীতিরই বা কারণ কি?

তাহার পর—চারি দিকে ফুল ফুটিয়াছে, প্রজাপতি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া উড়িয়া বসিতেছে, আর চতুঃপার্শ্বে সেই বনাবৃক্ষ পরিবেষ্টিত নন্দনোপম ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ড, দেবতাদিগের হাস্য-বিকসিত শুভাশীর্ব্বাদে যেন সিক্ত হইয়া গিয়াছে। কি শান্তি, কি মাধুরিমাই তথায় বিরাজ করিতেছে!

সেই ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্যস্থলে অসীম আকাশের নীচে একটী গত-জীবন মানব-

শরীরের সমাধি জাগিয়েছিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী বকুল গাছ—আপাদমস্তক পুষ্পে আচ্ছাদিত হইয়া রৌদ্রতাপ ও বর্ষার ঘোর বৃষ্টিপাত হইতে যেন সতত রক্ষা করিতেছে।

সেই সমাধির পার্শ্বে গিয়া সুবৎ উপবেশন করিল।

১৫

তখন, সুবৎ তাহার হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয় খুলিয়া আমার হাতে দিল, বলিল, "এই অঙ্গুরীয় যাঁহার, তিনি এখন এই সমাধির তলে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আমিও শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করিব। অতএব আমাদের প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুরীয় জগতে রাখিয়া গেলাম—যত্নে রাখিও।"

তাহার পর সুবৎ ধীরে ধীরে সেই সমাধির তলে শয়ন করিল। কে জানে—সেই সময় বকুল গাছ হইতে ঝুর্ ঝুর্ করিয়া অনেক ফুল ঝরিয়া পড়িল—বুঝি দেবতারা তাহাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

আমি অঙ্গুরীয়টী হস্তে লইয়া পড়িয়া দেখিলাম—লেখা রহিয়াছে—

"পিয়ারা বেগম।"

শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

ভৌতিক প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব সকলেও সামঞ্জস্য হইতে পারে, এই কথাটি না বোঝাতেই Kantএর দর্শনের এরূপ অসম্পূর্ণতা আমরা দেখিতে পাই। এই জন্যই তিনি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তত্ত্ব মিথুনের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ দেখিয়াও, তাহাদের পারস্পর্য্য সম্বন্ধ বুঝিয়াও, তাহাদের অভ্যন্তরীণ গূঢ় সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাহাদের পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রতি তিনি এতদূর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ বুঝিয়াও তাহাদের গূঢ় সামঞ্জস্যের সম্বন্ধাতীত অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি সম্যক মনোযোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই তিনি তাহাদের মধ্যে কেবল একটা বাহিরের সম্বন্ধ দেখিয়াই তাহাদের একটা বাহ্যিক সামঞ্জস্য করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু এটা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান যদি বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্বের সহিত জড়িত থাকে, যদি প্রাকৃতিক পদার্থ মাত্রেরই অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে তাহাকে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে জ্ঞানের একটা বাহ্যিক বিরোধের সম্বন্ধ থাকিলে চলিতে পারে না। দেশ কালের অন্তর্গত একটা ভৌতিক পদার্থের সহিত আর একটা ভৌতিক পদার্থের যেরূপ সম্বন্ধ, জ্ঞানী আত্মা এবং জ্ঞেয় ভৌতিক পদার্থের মধ্যে যদি সেইরূপ কেবল মাত্র একটা বাহ্যিক সম্বন্ধ ব্যতীত আর শ্রেষ্ঠতর নিগূঢ়তর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধ কখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারিত না। একটা পদার্থের

সহিত আর একটা পদার্থের যে সম্বন্ধ লক্ষিত হয় তাহা উক্ত পদার্থ দ্বারা কেহই জানিতে পারে না—সে সম্বন্ধ কেবল তাহাদের অতীত, তাহাদের বিরোধের অতীত—অপর এক জ্ঞানের পক্ষেই সম্ভব। আমরা অবশ্য এক ভাবে জগতের অন্যান্য অসংখ্য সত্ত্বার মধ্যে একটী মাত্র সত্ত্বা। এক ভাবে অবশ্য আমরা জগতের দেশ কালের অন্তর্গত প্রাকৃতিক পদার্থ বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহি, সুতরাং এদিক দিয়া দেখিলে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার মধ্যে পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ অপেক্ষা গূঢ়তর উচ্চতর সম্বন্ধ কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু Kantএর কথা যদি আমরা প্রকৃত ভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিয়াছি যে জ্ঞেয় আত্মার জীবন কেবল এই টুকু ভেদে নিঃশেষিত হয় না, প্রত্যুত তাহার একটা উচ্চতর স্বভাব আছে, যে স্বভাবে সে দেশ কালাতীত পুরুষ হইয়া, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার অতীত হইয়া, তাহাদের সম্বন্ধের ভিত্তি স্বরূপ অবস্থান করে। আত্মার এই স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের প্রতীতি হইবে যে আপাততঃ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে একটী বিরোধের সম্বন্ধ লক্ষিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বিরোধ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। জ্ঞেয় পদার্থ সকল সহজ দৃষ্টিতে জ্ঞাতার বিরোধী তত্ত্ব হইলেও, তলাইয়া দেখিলে, তাহারা জ্ঞাতারই জীবনের অভ্যন্তরে নিহিত। আত্মার যে স্বভাবটি দেশ কালের অন্তর্গত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির অধীন সেইটুকুকে বুঝিতে হইলেও আত্মার উচ্চতর স্বভাবের সাহায্যে—তাহারই আলোকে বুঝিতে হইবে।—প্রত্যুত জ্ঞানের আলোকে নিহিত থাকিয়া, তাহারই গর্ভস্থ হইয়াই জ্ঞেয় পদার্থ সকল আপনাদের অস্তিত্ব লাভ করিতেছে। স্বাধীনতা ও নিয়ম প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য অন্যান্য তত্ত্বমিথুনের সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে তাহাদেরও মধ্যে এইরূপ একটা সামঞ্জস্যের ভিত্তি আছে।—ইহাদের মধ্যে যে বিরোধের সম্বন্ধ আছে সেটি অবশ্য আমাদের দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আগে দরকার, কারণ এই বিরোধেই তাহাদের অস্তিত্ব, কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ বলিয়া বসেন যে তাহাদের একেবারে কোন রূপ সামঞ্জস্য নাই, তাহা হইলে যে কেবল তাহাদের কোন সামঞ্জস্য নাই এই কথাই প্রমাণ হয় তাহা নয়, অধিকন্তু সেই সঙ্গে সেই বিরোধেরও অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। Kant প্রমাণ করিয়াছেন এই সকল তত্ত্ব-মিথুনের মধ্যে নিত্য বিরোধের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু কেবল যদি বিরোধেরই উপর নির্ভর করা যায় তাহা হইলে তাহাদের নিত্য সম্বন্ধটুকুও চলিয়া যায়। সুতরাং সেই সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধও চলিয়া যায়। যাহার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের মধ্যে বিরোধ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। শত্রুর সহিত বিবাদ করিতে করিতে যদি আমরা এরূপ প্রতিজ্ঞা করি যে, সে যে দেশে থাকিবে আমি সে দেশে পর্য্যন্ত থাকিব না, তাহা হইলে তাহার সহিত যে কেবল আমার সকল প্রকার সদ্ভাবের সম্ভাবনা চলিয়া যায় এরূপ নয়—বস্তুতঃ সেই সঙ্গে সঙ্গে সকল বিরোধও চলিয়া যায়। আমরা যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া ঝগড়া করি সে ভূমিটুকুও যদি আমা-

দের সাধারণ ভিত্তি না হয়, তাহা হইলে আমাদের বিবাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। বস্তুতঃ সকল বিবাদেরই একটা সীমা থাকা আবশ্যক, এমন একটী গণ্ডি থাকা দরকার যাহার বাহিরে গেলে আর বিবাদ থাকে না। ধনুকের কাঠখানাকে বক্র করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে যেখানে আরও বক্র করিতে গেলে ধনুক গাছটি ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্রভাবেরও ধ্বংস হয়। সুতরাং Kant-এর মতে যিনি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়ম এবং স্বাধীনতা প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের মধ্যে নিত্য বিরোধের সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে তাহাদের বিরোধ সত্ত্বেও তাহাদের নিত্য সম্বন্ধের ধ্বংস নাই, এবং উহাদের মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী হইলেও একটি অপরটির অন্তর্গত। তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে ভৌতিক জগৎ আপাততঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিরোধী হইলেও বস্তুতঃ তাহাতেই তাহার অস্তিত্ব এবং জীবন, দেখাইতে হইবে যে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে নিয়ম স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও, স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ নিয়মেরই রাজ্যে এবং নিয়মের প্রকৃত অর্থ স্বাধীনতারই মধ্যে। মূল কথায় বলিতে গেলে ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে যে, জ্ঞান যে কেবল জ্ঞেয় বিষয়ের বিরোধী তত্ত্ব তাহা নয়, বস্তুতঃ সেই জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয় সকলের আধার এবং বিকাশভূমি। Kant ইহাদের পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ দেখিয়াও তাহাদের গূঢ় সম্বন্ধ দেখেন নাই। দেখেন নাই যে ইহাদের জীবন এভাবে সংশ্লিষ্ট যে একটিকে ছাড়িলে অপরটির জীবন শূন্য, তাহাদের অস্তিত্ব কল্পনার ছায়ায় পরিণত হয়। Kant বুঝাইয়াছেন যে জ্ঞানবিযুক্ত বিষয় আমাদের বোধগম্য হইতে পারে না। কিন্তু এটিও ঠিক যে বিষয়বিযুক্ত বিষয়ী, জ্ঞেয় পদার্থশূন্য জ্ঞানও তদ্রূপ কাল্পনিক অস্তিত্ব মাত্র। অস্তিত্ব অর্থে যেমন জ্ঞেয় বুঝিতে হইবে, সেইরূপ জ্ঞান বলিলেই একটা কিছুর জ্ঞান বুঝিতে হইবে। আত্মজ্ঞানের পক্ষে যেমন ইদংজ্ঞান দরকার, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রেমবিকাশের জন্যও বাসনা রাজ্যে নিয়মের কঠোর শাসন অবশ্য প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেম বৈরাগ্যময় স্বাধীনতা আপাততঃ বাসনার কঠোর নিয়ম শাসনের বিরোধী হইলেও—আংশিক ভাবে ইহারা পরস্পরের বিরোধী হইলেও—ইহারা কখনই সম্পূর্ণরূপে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

এই সকল তত্ত্বমিথুন যদি প্রকৃত পক্ষে কোনরূপেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে, তাহা হইলে ইহাদিগকে বিভিন্ন তত্ত্ব বলিবার অধিকার কোথায় আর রহিল। যখন দেখিতে পাইতেছি একখান চালের একটা দিক ছাড়িলে অপর দিক থাকিতে পারে না, তখন তাহার দুদিকে দুরকম রং দেওয়া থাকিলে সেই দুটা দিককে দুইটা বিভিন্ন বস্তু মনে করা কোনরূপে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। একটা জিনিষেরই দুইটী দিক মাত্র। সেইরূপ এই সকল তত্ত্বমিথুনকেও বিভিন্নরূপযুক্ত একই তত্ত্ব বলি না কেন? প্রত্যুত আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক স্বাধীনতা এবং নিয়ম প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্র কোথায়ও নাই। আধ্যাত্মিক জগৎ এই দৃশ্যমান প্রকৃতির অপর দিক মাত্র, এবং স্বাধীনতা নিয়মেরই অপর পৃষ্ঠা মাত্র।

অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে একই জিনিষকে বিভিন্ন প্রণালীতে পাঠ করিলে যেরূপ বিভিন্ন অর্থ বোধ হয় এখানেও সেইরূপ। প্রকৃতিকে যখন কেবল একদেশদর্শী বিজ্ঞানের চক্ষে পাঠ করি তখন বোধ হয় এই প্রকৃতি কেবল অহরহঃ পরিবর্ত্তনশীল শতধা বিখণ্ডিত অসংখ্য শক্তির সমাবেশ মাত্র—আত্মার স্বাধীনতা আমাদের সীমা স্বরূপ এবং আমাদের বন্ধন বজ্র স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। আবার যখন দর্শনের উচ্চতর ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পূর্ণতর জ্ঞানের আলোকে প্রকৃতির বিশাল বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন বুঝিতে পারি যে এই প্রকৃতি আত্মার লীলাভূমি, তাহারই বিকাশক্ষেত্র মাত্র। প্রকৃতির নিয়ত-বিরোধী ক্রিয়া সকলকে তখন আত্মার বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। মানুষের জীবনের প্রতি একভাবে দেখিলে মনে হয় যে ইহা একটি ঘোর সংগ্রাম ক্ষেত্র মাত্র। মনে হয় মানুষ বুঝি কেবল অসংখ্য প্রাকৃতিক শক্তির শিখরে পরিবর্ত্তনশীল গতির বিরুদ্ধে বিবাদ করিতেই জন্মিয়াছে। এই ভাবে প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এই সংযমী ব্যক্তিরা এই বক্তব্য সময় শরীরকে ও নানাপ্রলোভনপরিপূর্ণ সংসারকে আপনার পরম শত্রু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই সকল ঘটনাকেই আবার অন্য আলোকে পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে এই জীবন সংগ্রামের শত্রু জিত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এই শত্রু জিত হইবেই হইবে এই বিশ্বাসেই এ সংগ্রামের জন্ম এবং এই বিশ্বাসেই জয় লাভের সম্ভাবনা। প্রত্যুত প্রকৃতিকে জয় করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করিয়া আত্মার জীবনের বিকাশেরই জন্য ইহার সৃষ্টি। পূর্ণতর জ্ঞানের আলোকে দেখিলে বুঝিতে পারিবে এই জীবন-সংগ্রাম কোন বিপরীত শক্তির সহিত নয়—প্রত্যুত এ সংগ্রাম আত্মার নিজেরই সঙ্গে, ঐ শত্রু নিজেরই ভিতরে অবস্থিত আর এ সংগ্রামের আঘাত প্রতিঘাত জনিত যে কষ্ট সে কষ্ট আত্মার বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী শুভফলপ্রসূ যন্ত্রণা।

আমরা যে তত্ত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, সেটা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে লোকে সাধারণতঃ দুইটি অপমীমাংসায় উপনীত হয়। আত্মা এবং জড়জগতের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে, তাহাদের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে গিয়া হয়ত কেহ কেহ আত্মার উপর এতটা জোর দিতে পারেন, যে জড়জগতকে আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত আত্মার বিকাশভূমি বলিতে গিয়া বলিয়া বসেন যে আত্মাই একমাত্র সৎ বস্তু, জড়জগৎ কেবল বিকারগ্রস্থ আত্মার স্বপ্নময় অসৎ কল্পনা মাত্র। আত্মা জড়ের অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্ব, অথবা জড়-জগৎ এক ভাবে আত্মার জীবনের অন্তর্গত এ কথা বলিতে গিয়া হয়ত জড়-জগতের নীচতর অস্তিত্বের প্রতি সম্যক মনোযোগ না দেওয়া হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব আত্মার অন্তর্গত এ কথা বলিতে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে জড় জগৎ নাই—সে কেবল বিকারপ্রণোদিত অবান্তর ছায়া মাত্র! অথবা আত্মা এবং ভৌতিক প্রকৃতির মধ্যে উভয়ের

কাহাকেও প্রাধান্য না দিয়া উভয়েরই অতীত অদ্বৈত তত্ত্বের উপর এতটা জোর দেওয়া যাইতে পারে যে সমগ্র প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য করিয়া ফেলা যায়। প্রকৃতির স্বপ্নময় জীবনের অতীত নির্ব্বন্ধ-পুরুষের অন্বেষণ করিতে গিয়া হয়ত প্রকৃতিকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি, বিবাদের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের প্রতি একই প্রকার অস্তিত্ব আরোপ করিতে পারি, এবং তাহাদের অতীত পুরুষের উপর অপরিমিত ঝোঁক দিয়া হয়ত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি যে সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়—জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ও অতীত পুরুষ জ্ঞান ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। এই ভাবে যদি জগতের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহা হইলে দেশকে কেবল অদ্বৈত তত্ত্বের বারিধি সদৃশ মহান জীবনের সতত চঞ্চল উর্ম্মিমালায় পরিণত করিতে এবং সত্য এবং অস্তিত্ব কেবল সেই অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্বেই আরোপিত করিতে হয়।

প্রকৃত সত্যকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া সত্যের উভয় দিকে সমান ভাবে মনোযোগ না দেওয়াতেই এইরূপ অপমীমাংসায় উপনীত হইতে হয়। জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের বিরোধের অতীত সামঞ্জস্যের ভিত্তির স্বরূপ এবং তাহাদের পরস্পর বিরোধী দ্বৈতভাবের মধ্যে অদ্বৈত তত্ত্ব—এই কথাটা একটু এক দিক টানিয়া বুঝিলে জ্ঞেয় প্রাকৃতিক জগৎকে স্বপ্নের ক্রীড়ায় পরিণত করিতে হয়। কিন্তু এ প্রকার সর্ব্বগ্রাসী মায়াবাদ মনুষ্যের সহজ জ্ঞানের ভিত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। মানুষের ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশভূমিকে ঐন্দ্রজালিক মায়ায় পরিণত করে। আর মায়া বলিলেই যে জগতের একটা ব্যাখ্যা হইল তা নয়। জগতের অস্তিত্বের একটা ব্যাখ্যা প্রযোজন। এবং মায়াই যদি জগতের কারণ হয় তাহা হইলে মায়ারও একটা ব্যাখ্যা প্রযোজন। পরন্তু এই মায়া যখন মায়াতীত জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী, যখন একের অভাবে অপরটি শূন্যে পরিণত হয়, তখন একটির উপর আর একটির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া একটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট করিবার কোন কারণ নাই।

এই মায়াবাদের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে গিয়া আর একটি ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহার বিপরীতে তর্ক করিতে গিয়া যদি কেহ এমন বলেন যে প্রকৃতি এবং আত্মা উভয়েই সমানভাবে সত্য, অথবা প্রকৃতির উপর আত্মার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তাহা হইলে বুঝিব যে তিনি Kant-এর দর্শনের মূল তত্ত্ব ভুলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে Kantএর দর্শন যদি কিছু করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে জ্ঞানবিবর্জ্জিত বিষয় কিছুই হইতে পারে না। এ কথাটি আংশিক বুঝিয়া যেমন পূর্ব্বোক্তরূপ মায়াবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি সেই মায়াবাদের বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া যদি কেহ বলেন যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়েই সমান সত্য এবং দ্বন্দ্বরহিত পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে সমানভাবে আপনাকে বিকাশ করিতেছেন, তাহা হইলেও এই তত্ত্বটিকে ঠিক বোঝা হয় না। কারণ যদি বলা যায় যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা নাই, তাহাদের সত্ত্বার কোনরূপ তারতম্য নাই, তাহা হইলে

কোনরূপ বিবোধেরই অর্থ থাকে না। আর বিরোধ থাকে না বলাও যা আর বিকাশ না থাকা বলাও তা। যদি বল পরমাত্মা সমানভাবে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার মধ্যে প্রকাশিত, তাহা হইলে তাহার শেষ অর্থ এই দাঁড়ায় যে পরমাত্মা আদৌ প্রকাশিত নন। বিকাশের অর্থই জ্ঞানের নিকট বিকাশ, এবং জ্ঞানের জীবন বিরোধ এবং বিভিন্নতায়। সুতরাং বিকাশ হইলেই, পরমাত্মাকে আপনার অদ্বৈত তত্ত্বকে বিবোধের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। বিবোধশূন্য বিভিন্নতাবিবর্জ্জিত বিকাশ সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অসঙ্গত কথা মাত্র।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া।

বাঙ্গালীর বিলাত যাইবার কারণ কি? অনেকেই বলিবেন শিক্ষার জন্য। বহু অর্থব্যয় ও শ্রম-স্বীকার করিয়াও এখানে যে সকল বিষয়ের শিক্ষালাভ করা যায় না, সেই সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালীরা বিলাত গিয়া থাকেন। এখানে আইন পড়িয়া মোক্তার, উকিল, এটর্নি, মুন্সব, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ হইতে পারা যায়, কিন্তু ব্যারিষ্টার ও সিভিলিয়ান হইবার উপায় নাই। এখানে রীতিমত কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার (কৃষকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যতীত) কোন রূপ শিক্ষালয় বা সুদক্ষ শিক্ষক নাই, সুতরাং কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার্থীকে বিলাতেই কৃষিবিদ্যা শিখিতে হইবে। সাহেব মহলে চিকিৎসা করিতে হইলে এখানকার মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষিত চিকিৎসক হইলে চলিবে না, সুতরাং বিলাতের চিকিৎসা-শিক্ষা ব্যতীত সে অভিপ্রায় সাধনের অন্য উপায় নাই। এইরূপ গবাদি-পশু-চিকিৎসক, বাষ্পীয়-রথাদি-কল নির্ম্মাতা, এবং চিত্রকর, অধ্যাপক, বক্তা প্রভৃতি হইতে হইলে দুর্ভাগা বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এ সকল ইংরাজ শাসনের কায়দা মাত্র। মৃত মহাত্মা দ্বারিকানাথ মিত্রের ন্যায় উকীলই হউন, আর স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় চিকিৎসকই হউন, ব্যারিষ্টার ও সিভিল সার্জ্জনের কায়দা একটু স্বতন্ত্র। দেশী ও বিলাতী শিক্ষার একটু ভিন্ন মর্য্যাদা।

এক্ষণে বিলাত গমন ও তন্নিবন্ধন জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে একটু বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কতিপয় বিষয় শিক্ষার জন্য বিলাত গমন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। যে সকল বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের দেশে আদৌ হয় না, অথচ যে সকল বিষয়ের অভাব অহরহঃ আমাদের দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং যে সকল অভাবজনিত বিঘ্ন-বিপত্তি দ্বারা আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতেছে না, সেই সকল বিষয়ের জন্য বিলাত গমন, এমন কি জাত্যন্তর পরিগ্রহও

আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে।

রাজনীতি শিক্ষা আমাদের দেশে সামান্যমাত্রই হইয়া থাকে, এবং যে সে ব্যক্তিরও শিখিবার অধিকার নাই। কতিপয় সংখ্যক লোক যাঁহাদের রাজ্যশাসনসম্বন্ধে সামান্যমাত্র সংস্রব আছে তাঁহারাই সামান্যমাত্র চর্চ্চা করিতে পান। কিন্তু মনিবের মনের মতন না হইলে চাকরের কোন কথাই গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং এখানে থাকিয়া তাঁহাদের সে সামান্য সংস্রব কিছুই নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ যদি পার্লেমেন্টের সভ্য হইতেন, কে না স্বীকার করিবেন যে ভারতের সৌভাগ্য-রবি হিন্দুসমাজে এক দিনের তরেও কিরণ প্রদান করিত। একথা শুনিয়া কোন্ দুর্ভাগা ভারতসন্তানের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু বিগলিত না হইত? ইহার জন্য স্বদেশ ছাড়িয়া চির বিলাতবাসী হইতে পারা যায়, ইহার জন্য হ্যাট কোট পরা কালা বাঙ্গালীকে গৌরাঙ্গ ইংরাজের অপেক্ষাও সুন্দর দেখায়, এবং ইহার জন্য জীবন বিসর্জ্জনও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দরিদ্র বাঙ্গালীর ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিবার জন্য সূচ সুতাও বিলাতের সামগ্রী, ও বিলাতের কারিকর নির্ম্মিত, ভিক্ষার্জ্জিত কদর্য্য তণ্ডুল সিদ্ধ করিবার জন্য অগ্ন্যুৎপাদক দেয়াশালাইও বিলাতের সামগ্রী, ও বিলাতের কারিকর-নির্ম্মিত। এই সকল পরহস্তোৎপাদিত দ্রব্যের জন্য আমরা প্রতিক্ষণ পরের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। এই সকল অনর্থের নিরাকরণ হেতু যদি কেহ বিলাত যান এবং দেশে প্রত্যাগত হইয়া যদি তিনি বিলাতী শিক্ষা প্রভাবে ও নিজ বুদ্ধি-চাতুর্য্যে দেশেই ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী কৃষ্ণবর্ণ কোট পেন্টুলান যদি সমগ্র ভারতকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তোলেন, তাহা হইলেও ভারতের তাদৃশ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ব্যারিষ্টার হইয়া মুন্সব, বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ও জমীদারদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার জন্য লালায়িত হইয়া, এবং সিভিল সার্জ্জন ও বিলাতী ডাক্তার হইয়া ভিজিট কমাইয়া দেশীয় চিকিৎসকদিগের অন্ন মারিয়া সাহেব হইয়া থাকা ভাল দেখায় না। আমরা দেখিতে পাই, অনেকেই এখান হইতে Third class, Second class অবধি অধ্যয়ন করিয়া দুই তিন বৎসর পরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন। তাঁহারাই আবার সামান্যমাত্র fee লইয়া হাইকোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে পর্য্যন্ত practice করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। হ্যাট্ কোটের কি অদ্ভুত মহিমা। মোকদ্দমা হারিলেও তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। ইহাতে আমরাও অসন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ইহাতে একটী বিষম সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া থাকি। দেখিতে পাই যাবতীয় উকিল মোক্তারের কার্য্য আজকাল প্রায়ই ব্যারিষ্টার ও এটর্নি দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। দেশীয় উকিলদিগের দুরবস্থা ক্রমেই বাড়িতেছে। যদিও বৎসর বৎসর ২০০।৩০০ ছোটবড় উকীল হইতেছেন, তাঁহারা সংসারে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। কেহ বা উচ্চ শ্রেণীর কেরাণী হইতেছেন, কেহ বা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতেছেন। কেহ

বা Pettifogger হইয়া উকীলত্ব বজায় রাখিতেছেন। প্রতি বৎসরের ব্যারিষ্টার আমদানিতে তাঁহাদের রক্ষা রক্ষা হইবার যোগাড় হইয়াছে। ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইবার উপক্রম হইয়াছে যে, ওকালতী কার্য্য-টা কেবলমাত্র বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টারদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। এখনকার উকীলদিগের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে সেই কার্য্য সাধন করিতে বহু ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে হইবে, অর্থাৎ ব্যারিষ্টারেরাই বর্ত্তমান কালীন উকীলদিগের স্থান অধিকার করিবেন। এবং দেশীয় আইন শিক্ষার আর সামান্য মাত্র আদর থাকিবে না।

ডাক্তারদিগের সম্বন্ধেও বিলাতী শিক্ষা অবিকল এইরূপ। তবে যাঁহারা ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজসরকারে চাকরী পাইয়া থাকেন তাঁহাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহারা নিজে কতকটা সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা দেশের বা সমাজের কি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে? আর যাঁহারা কেবল ২। ৩ বৎসর মাত্র বিলাতে থাকিয়া L. R. C. P. প্রভৃতি উপাধি লইয়া সাহেব ডাক্তার হইয়া আইসেন তাঁহারাও অপর সাম্প্রদায়িক লোকের ন্যায় দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। মূর্খের দেশ—সুতরাং লোকে ভড়ঙ্গে ভুলিয়া যায়। ইংরাজী পরিচ্ছদপরিহিত দেখিয়া ধার করিয়া তাঁহাদের উদর পূর্ণ করিবে, অথচ দেশীয় সুশিক্ষিত অধিকতর উপযুক্ত লোকদিগকে ডাকিবে না। স্বীকার করি যে ইংলণ্ডাদি বিজ্ঞানের দেশ, তথায় বিজ্ঞান শিক্ষা ভালরূপই হইয়া থাকে, ভৈষজ্য বিদ্যা (Medical Science) ভালরূপেই লোকে শিখিয়া থাকে। তাই বলিয়া কি এখানে ভাল চিকিৎসক হইতে পারে না? ৺ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি মহাত্মারা বিলাত গিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিখেন নাই। অথচ, বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, যে অনেক সুশিক্ষিত সিভিল সার্জ্জন ইঁহাদের চিকিৎসা প্রণালী আদর করিয়া অবলম্বন করিতে পারেন। তাই বলিয়া আমরা বিলাতী চিকিৎসা শিক্ষার বিরোধী নহি। যাঁহার ইচ্ছা হইবে বিলাত কেন, আমেরিকায় গিয়া শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু বিলাত-ফেরত হইয়া দেশীয় ডাক্তারদিগের মতন চলিলে এখানে শিক্ষা করিতে কি ক্ষতি ছিল? বাঙ্গালিকে Surgeon Major ও Civil Surgeon-এর পদে অভিষিক্ত দেখিলে নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কিন্তু বিলাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশীয় রাজাদিগের Family Doctor কিম্বা মিউনিসিপালিটীর নিযুক্ত চিকিৎসক হইতে দেখিলে বস্তুতঃই আমাদের বড় কষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল কার্য্য দেশীয় চিকিৎসকেরা করিবেন। বিলাত হইতে আসিয়া এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে হইবে যে, ধুতি পিরাণ পরা দেশী ডাক্তারের পেশা ক্রমে উঠিবে, সুতরাং দেশীয় চিকিৎসা শিক্ষায় শিথিলতা জন্মিবে; পরিশেষে চলতি ডাক্তার হইতে বিলাত যাইতে হইবে।

দেশের উন্নতি সম্বন্ধে ত এইরূপ কতকটা দেখিলাম। এক্ষণে সমাজ সম্বন্ধেও একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। বিলাত-ফেরত

ব্যক্তি মাত্রেই জাতীয় যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া থাকেন কেন? জাতীয় খাদ্য, জাতীয় আচার পদ্ধতি, এমন কি দেশীয় ভাষা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কই রাজা রামমোহন রায়, ৮ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ঠাকুর গোষ্ঠীয় বাবুরা ত বিলাত গিয়া সাহেব হন নাই। এরূপ না করাতে তাঁহাদের মান মর্য্যাদার ত সামান্য মাত্রও ত্রুটী হয় নাই। কর্ম্মস্থলে রাজ-প্রথানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধানে তাদৃশ দোষ হইতে পারে না, কিন্তু ঘরে, হিন্দুর ছেলের হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী চলিতে কি দোষ হইয়া থাকে? সমাজকে এরূপ পদদলিত করার কি আবশ্যক হইয়া থাকে? সকল জাতিই নিজ নিজ সমাজ সংরক্ষণে সমধিক আগ্রহ-শীল। কিন্তু বলিতে পারি না এই সকল মহানুভব ব্যক্তিরা কি কারণে সমাজের উপর এতাদৃশ খড়্গ-হস্ত হইয়া থাকেন। স্বীকার করিলাম দুই তিন বৎসরের মধ্যে সভ্যতার ও জ্ঞানের স্রোত তাঁহাদের ধমনীতে হঠাৎ ছুটিয়া উঠে, তাঁহারা এ অজ্ঞান, অসভ্য ভারতের কিছুই লইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহাদের একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখা উচিত যে তাঁহাদের যে দেশে গিয়া সভ্যতা ও জ্ঞানের উদয় হয় সেই দেশের পণ্ডিত লোকেরা এই অসভ্য ভারতের সামাজিক অনেক সামগ্রী লইতে সশব্যস্ত হইয়াছেন। অধিক কথা কহিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা মহাত্মা কর্ণেল অলকটের প্রতিমূর্ত্তি খানি একবার হৃদয়ে ভাবিয়া দেখুন। ইংলণ্ডীয় মুক্তি ফৌজ স্ত্রী পুরুষে ভারতের বেশ ভূষা, রীতিনীতি অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু অনুকরণ প্রিয় বাঙ্গালী দেশীয় যাহা কিছু ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় সমস্তই যত্নের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখিবেন না যে ইহাতে জাতীয় গৌরব ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে ও দেশ ছারখার হইতেছে। বিলাসপ্রিয় হইয়া যে ভারতের দিন দিন দুরবস্থা করিতেছেন তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখিবেন না।

ইংরাজের রাজত্বেই কেবল বাঙ্গালী সাহেব হইতে ভাল বাসেন কিন্তু ইউরোপীয়েরা মুসলমান রাজত্ব কালে যখন ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ত কই দেশে গিয়া ইজের চাপ্‌কান্ মোগলাই পাগড়ী ধারণ করিতেন না? হ্যাট্‌কোট সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি সাধন না করিয়া বরং কালা বাঙ্গালীকে অধিকতর বেয়াড়া দেখাইয়া থাকে। পেণ্ট্‌লেন, চাপ্‌কান, চোগা পাগড়ী ত রাজকীয় পরিচ্ছদ। কিন্তু অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর তাহা ভাল লাগিবে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন ইংরাজী পরিচ্ছদ ধারণ করা, ইংরাজী চালে চলা পশারের পক্ষে সুবিধা করিয়া থাকে। এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পশার করা নিজের বিদ্যা বুদ্ধিও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ডাক্তার সরকার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ত ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিয়া চিকিৎসা করেন না। এ সম্বন্ধে আমরা ব্যারিষ্টারদিগকে আদালতের কার্য্য সময়ে কিছু বলিতে পারি না। কারণ তাঁহারা রাজাজ্ঞানুসারে আদালতে গাউন পরিতে বাধ্য। কিন্তু বাড়ী গিয়া তাঁহারা কেন দেশীয় বেশ ভূষায় এরূপ অনাদর করিয়া থাকেন? এ বিষয়ে আমরা বাবু রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়কে ধন্যবাদ করিয়া

থাকি। তিনি একজন বিলাতশিক্ষিত সুচিকিৎসক, কিন্তু তিনি সমাজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধারণে তাঁহার প্রতি সকলেরই প্রীতি আছে। বাবু আনন্দমোহন বসুর সম্বন্ধেও আমরা এমন গল্প শুনিয়াছি যে তিনি নাকি বিলাত হইতে আসিয়া গাউন না পরিয়া চোগা চাপকান লইয়া প্রথমে আদালতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যারিষ্টার মহল তাঁহাকে স্বদলচ্যুত করিবার জন্য উদ্যোগ করে, কেহ তাহার সহিত আলাপ করিত না, কেহ বা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কামরায় বসিতে দিতেও আপত্তি করিত। অগত্যা আনন্দমোহন বাবু কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে চোগা চাপকান ছাড়িয়া বিলাতি পোশাক গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কথাটা কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোক যে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবস্থল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমরা স্বীকার করিব যে এই সকল লোক হারাইয়া আমাদের সমাজের ও দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিমান ও সুপণ্ডিত। তাঁহারা বিলাত না গিয়া দেশে থাকিলেও যে বড় লোক হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাহা হইলে তাঁহারা বিলাত সংক্রামক রোগে আর পীড়িত হইতেন না। দেশের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিত। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই বলি আর বৎসর বৎসর বহু লোকের দেশকে দরিদ্র করিবার জন্য বিলাত যাইবার আবশ্যকতা নাই। তবে সিভিলিয়ান হইতে, রাজনীতি, কৃষিবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা শিখিতে বিলাত যাওয়া উচিত। কিন্তু যাহার জন্য বিলাত না যাইলে নয়—সেই সিভিল সার্ভিসধারীদিগের সম্বন্ধেও সে দিন ডাক্তার লিটনার (Dr. Leitner) বিলাতের East India Association সভায় কি বলিয়াছেন তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। স্থান থাকিলে আমরা সে বক্তৃতার অধিকাংশই উদ্ধৃত করিয়া দিতাম, কিন্তু সে স্থান ইহাতে নাই। প্রথমতঃ সিভিল-সার্ভিস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া শেষে বিলাত ফেরতদিগের বিলাতীয়ের অনুকরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন; 'It is only when he becomes an imitator of Europens that his creative talant in art and in capacity for Government and learning are greatly weakened." ইহার অধিক এ বিষয়ে আর কি বলা যাইতে পারে? বাস্তবিক যাহার নিজত্বই রহিল না, তাহার নিকট অপরের প্রত্যাশা কি? ডাক্তার লিটনার এই জন্য বিলাত-শিক্ষিত অপেক্ষা দেশীয় শিক্ষিত খাঁটি দেশীয়দিগকে সিভিল-সার্ভিসে ভর্ত্তি করিতে পরামর্শ দেন। শুধু Leitner নন, Mr. Davies ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর' কথাটা বড়ই ঘৃণাবহ। আমি যার অনুকরণ করিতে পাগল, সেই আমাকে ঘৃণা করে, ইহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? তবে কেন এ বিড়ম্বনা? ময়ূরের দলে যখন মিশিতে পারিবই না, তখন কেন দুটা ময়ূরপুচ্ছ কুড়াইয়া আপনার কাকত্ব ঢাকিবার চেষ্টা? কেন এ আত্ম-বঞ্চনা! ঘরে পরে এ গঞ্জনা কেন? এ দুকুল মজান কিসের জন্য?

শিক্ষার জন্য বিলাত যাইতে হয় যাইব, কিন্তু তাই বলিয়া আপনাকে ভুলিব কেন? সুখের বিষয় আজ কাল এ স্রোত অনেকটা ফিরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই ত চাই। ইহাই ত কামনা। দেশের লোক দেশে ফিরিয়া আসিবেন, দেশের চালে চলিবেন, দেশের উন্নতি করিবেন, ভারত সমাজ আদর করিয়া তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

নায়েব জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিত্রজা মহাশয় যে প্রকার ধরণে জবাব লিখিয়া কৌন্সিল ও প্রেসিডেণ্ট সাহেবের সম্মুখে পেশ্ করিলেন—আজ কালকার দিনের হইলে তাহা লইয়া হুলস্থূল বাঁধিয়া যাইত। অভিযোগের উত্তর পত্রের প্রতি পংক্তিতেই তিনি প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। বেনামী করিয়া ফারম ইজারা লওয়া সম্বন্ধে তাঁহার নামে যে অভিযোগ আসিয়াছিল তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—"আমি বেনামী করিয়া কতকগুলি ফারম নিজ নামে ইজারা লইয়াছি বটে—কিন্তু তাহা গোপনে লই নাই—আমার উপরওয়ালা সাহেব কর্ম্মচারী এ বিষয়ে আমাকে সম্মতি দেওয়াতেই আমি এপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা ব্যতীত নিজ নামে যে সমস্ত ফারম ইজারা লইয়াছি—তাহার জন্য কোন উপর ওয়ালার অনুমতি লই নাই বটে, কিন্তু অনুমতি না লইয়াও আমি অন্যায় কার্য্য করি নাই। আপনারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন—বাঙ্গালার সকল জমীদারের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা কম বেতন পাইয়া থাকে তাহাদের পদগৌরবের উপযুক্ত যান, বাহন, চাকর, বেহারা, আরদালী, আসাবরদার ইত্যাদি রাখিবার খরচ তাহাদের সেই স্বল্প বেতন হইতে কুলাইয়া উঠে না। এ প্রকার স্থলে তাহারা অন্য উপায়ে স্বীয় পদোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া প্রভুর মান রক্ষা করে, প্রভুরাও এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়াও কোন প্রকার আপত্তি বা উচ্চবাচ্য করেন না। ইহাই দেশপ্রচলিত প্রথা। আমি মোটে পঞ্চাশ মুদ্রা বেতন পাই ও কোম্পানীর অধীনে উচ্চ পদের চাকরি করি—এ প্রকার স্থলে পদোচিত গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই আমি এইরূপ করিয়াছি। দেশপ্রচলিত প্রথানুসারে ইহা কোন রূপে দূষণীয় নহে।" গোবিন্দরামের এই প্রকার জবাবদিহির বিরুদ্ধে হলওয়েল সাহেব কিছুই বলিতে পারিলেন না—কিন্তু অন্য প্রকার অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"গোবিন্দরাম অনেক ফারমের প্রকৃত আয় গোপন করিয়া কোম্পানির প্রচুর ক্ষতি করিয়াছেন—কতকগুলি ফারম নিজে বেনামী করিয়া লইয়াছেন বলিয়া অনেক স্থলে দর কমাইয়া দিয়াছেন, অনেক স্থলে প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্যের উপরও আদায় করিয়াছেন, এ প্রকার গর্হিত কার্য্যের জন্য দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহাকে 'ভুড়ুম লাগান' অথবা বেত্রাঘাত করা উচিত।" কিন্তু মন্ত্রীসভায় অন্যান্য সদস্যেরা এক বাক্যে উত্তর করিলেন—"we are not dis-

posed to inflict the lash or fetters on the first native in the settlement." মিত্রজা মহাশয় যে কেবল শাস্তিভোগ হইতে রক্ষা পাইলেন এমত নহে—এই প্রকারে সঞ্চিত অর্থের সমস্ত অংশই তাঁহার অধিকারে রহি । এই ঘটনাদ্বারা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয়—"গোবিন্দরামের লাঠীর" বা টাকার জোর সেই সময়ে অতিশয় অধিক ছিল। একে কোম্পানীর অধীনে তিনি বড় চাকরি করিতেন, তাহাতে আবার প্রচুর বিত্তশালী ছিলেন, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহার ক্ষমতার প্রাচুর্য্য ছিল ও সেই ক্ষমতার সহায়ে তিনি হলওয়েল সাহেবের অভিযোগগুলি উড়াইয়া দিলেন।

কেবলমাত্র গোবিন্দরাম মিত্রই যে অন্যায় উপায়ে এই প্রকার অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা নহে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে কোম্পানীর চাকরির ন্যায় সঙ্গত উপায়ে কেহই ধনী বলিয়া পরিগণিত হন নাই। পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইবের দাওয়ান রামচাঁদ ও মুন্সী নবকৃষ্ণ বাহাদুর নবাবের অন্তঃপুরস্থ ভাণ্ডারের আট কোটী টাকার কথা আদতে তাঁহাকে জানিতে দেন নাই। সকল কথা চাপিয়া রাখিয়া মীরজাফর, আমিরবেগ খাঁ, রামচাঁদ, ও নবকৃষ্ণ এই টাকা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। দেওয়ান রামচাঁদ মোটে ৬০ টাকা তলব পাইতেন; কিন্তু এই ঘটনার দশ বৎসর পরে প্রায় সওয়া কোটী টাকা মজুত রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নবকৃষ্ণ মুন্সীও দেওয়ানজীর সহিত সমান বেতন পাইতেন, কিন্তু পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করেন, ও মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় নয় লক্ষের উপর টাকা ব্যয় করেন। তাঁহাদের ইংরাজ প্রভুরাও এ প্রকার উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ে বড় পিছ্পাও ছিলেন না। নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে তখন সাধারণ ইংরাজে ভারতে আসিত না। কিন্তু তাহারা এখান হইতে যাহা সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইত, তাহাতে রাজার হালে কাটাইত। "বেনামী" ও "দস্তকী" কারবার ইহাদের একচেটিয়া ছিল।

গোবিন্দরাম হলওয়েলের অভিযোগ ব্যাপারে মুক্তি লাভ করিবার কিয়ৎ কাল পরে ইংরাজদের সহিত নবাব সরকারের অবনিবনাও হইয়া উঠিল। আলিবর্দ্দি ইহলোক ত্যাগ করিলেন ও নবাব মির্জ্জা মহম্মদ সেরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার মস্‌নদে উপবেশন করিলেন। ইংরাজের সহিত নানা কারণে তাঁহার অকৌশল বাধিয়া উঠিল। ইতিহাস-পাঠকের নিকট সে সকল ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নবাব ঘটনাবশে উত্তেজিত হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায়—নবাবের কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ কালে গোবিন্দরাম তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন। কোম্পানীর নিমক্‌ভোগী বলিয়া তিনি প্রভু-পক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া—ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণামের বিষয় না ভাবিয়া—ইংরাজ-সৈন্যের সহিত মিশিয়া নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। দুর্গ অধিকৃত হইলে চৌপালায় চড়িয়া, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া হাস্যমুখে নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরকারী হুকুমানুসারে অল্পক্ষণ স্থায়ী সেই দুর্গমধ্যস্থ দরবারে গোবিন্দরামকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া আনা

হইল। সেরাজ তাঁহাকে কঠিন প্রহরীবদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। মুরশীদাবাদে তাঁহাকে চালান দেওয়া হইবে, এ কথারও আভাস দেওয়া হইল।

নির্জ্জন অন্ধতমসাবৃত কারা-প্রকোষ্ঠে বসিয়া গোবিন্দরাম মিত্র স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে কারামুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অর্থবল তাঁহার প্রধান বল বলিয়া বিবেচিত হইল, তিনি দুই এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিকে হস্তগত করিয়া নবাবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। ফিরিঙ্গিদিগের উপরেই নবাবের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ, সুতরাং গোবিন্দরাম অনেক কাকুতি মিনতির পর মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চোপদারের উপর পরওয়ানা হইল।

১১৬৪ সালে কর্ণেল ক্লাইব ও ওয়াটসন আসিয়া বাঙ্গালার পলাশী ক্ষেত্রে দেখা দিলেন। পলাশীর রাজসমরে, ঘোর চক্রান্তে বেষ্টিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতার ধূমময় আবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া নবাব মির্জ্জামহম্মদ সেরাজউদ্দৌলা পরাজিত হইয়া ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন। ইংরাজের বজ্রনাদী কামানের মুখে তাঁহার রক্তপতাকা চিরকালের জন্য হীনপ্রভ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ইংরাজ সিংহচিহ্নিত পাতাকা উড়াইয়া জাফর আলি খাঁকে মহাসম্মানের সহিত বাঙ্গালার মস্‌নদে বসাইয়া উৎসবানন্দ ভোগ করিতে মহা সমারোহে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

ইংরাজ জয়োৎসবে মত্ত হইয়া রণবাদ্য করিতে করিতে কলিকাতার ফ্যাক্টরিতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া গোবিন্দরাম মিত্র পূর্ব্ব প্রভুদের সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় যাত্রা করিলেন। পলাশী বিপ্লবে ইংরাজ প্রভুদের মস্তক ঘূর্ণিত হইলেও তাঁহারা প্রাচীন কর্ম্মচারী গোবিন্দরামকে অতি সহজে চিনিলেন। ক্লাইবের নূতন বন্দোবস্তে 'ব্লাক জমীদারের" কাজ উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব হওয়াতে গোবিন্দরাম মিত্র, কোম্পানীর তরফে কলিকাতা পুলিশের ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষমতার যতটুকু অপূর্ণতা ছিল, এই নূতন পদপ্রাপ্তিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করিল।

ইংরাজ কলিকাতার পুরাতন দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া নূতন স্থল নির্ব্বাচিত করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বর্ত্তমান কষ্টম হাউসের অধিকৃত স্থানে প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল, গোলার মুখে তাহা উড়াইয়া দিয়া ইংরাজেরা গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। ফোর্ট উইলিয়মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভারতের বক্ষে ইংরাজের প্রভুত ক্ষমতা চিরকালের জন্য দৃঢ় নিবদ্ধ হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে, গোবিন্দপুরে অনেক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর বাস ছিল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়রাম ঠাকুর এই সময়ে গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া পাথুরিয়াঘাটায় বাস করেন। জয়রাম ঠাকুর যে কারণে বাধ্য হইয়া গোবিন্দপুর ত্যাগ করেন, গোবিন্দরাম মিত্রও সেই কারণে বাধ্য হইয়া কুমারটুলীতে বাস করেন। গোবিন্দপুরে ইংরাজের দুর্গ নির্ম্মাণই তাঁহাদের এই প্রকার বাস পরিবর্ত্তনের প্রধান

কারণ। গোবিন্দরাম গোবিন্দপুর ত্যাগ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে "গোবিন্দপুর" নামও লোপ পাইল।*

কুমারটুলিতে আসিয়া মিত্রজা মহাশয় পঞ্চাশ বিঘা ভদ্রাসন ঘিরিয়া লইলেন। তাহার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড পুরী নির্ম্মিত হইল। চারিদিকে চক্ ও চাঁদনী সমেত সুবৃহৎ পূজার দালান ও তাহার পশ্চাতে অন্তঃপুরস্থ প্রকোষ্ঠগুলি নির্ম্মিত হইল। বাহিরের বৈঠকখানা সংলগ্ন ত্রিতল হর্ম্ম্যের সকল ভাগে "চীনের পাগরে" সুমণ্ডিত করিয়া "রংমহল" নির্ম্মিত হইল। এই "রংমহলে" উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্যগীতের স্রোত বহিত। "নন্দনবাগান" তাঁহার প্রমোদকানন হইল, পূর্ব্বে নন্দনবাগান কলিকাতার সীমার বাহিরে অর্থাৎ "মারহাট্টা ডিচের" বহির্সীমাভুক্ত ছিল, গোবিন্দরাম স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহা কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া লইলেন। "নন্দনবাগান" প্রকৃতই নন্দন কানন হইয়া উঠিল। একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাতে দুইটী "জলটুঙ্গি" বা জলনিবাস নির্ম্মাণ করা হইল। মিত্রজা মহাশয় "নন্দনবাগান" কলিকাতার সীমাভুক্ত করিয়া যেরূপ নাম বাড়াইয়া গিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহা তাঁহার বংশধরগণের পক্ষে নামকরণে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল কলিকাতার হার অনুসারে নন্দনবাগানের খাজনার হার নিয়মিত হইয়া থাকে। তাঁহার বংশধরগণের বর্ত্তমান অসচ্ছলতা ও বিষয় বিভাগ নিবন্ধন ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া পড়িয়াছে।

গোবিন্দরাম মিত্র মহা সমারোহে দুর্গোৎসব ও কালী পূজা করিতেন। শাস্ত্রের বর্ণনার মর্ম্ম যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইত। স্বয়ং মিত্রজা মহাশয় আদ্যোপান্ত এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেন। "মহাশক্তি", "লক্ষ্মী" প্রভৃতির গাত্র হরিতাল-রঞ্জিত না করিয়া সুবর্ণপাতে মণ্ডিত করা হইত। ডাকসাজের গহনার পরিবর্ত্তে সেই সুদীর্ঘ প্রতিমা-মূর্ত্তিগুলি আদ্যোপান্ত স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত করা হইত। প্রতিমার 'কাঠাম' অতিশয় বৃহৎ হইত বলিয়া প্রত্যেক দেব দেবী মূর্ত্তি কাঠামর সহিত অসংন্যস্ত ভাবে নির্ম্মিত হইত ও বিসর্জ্জনের সময় "মহাপায়া" "চতুর্দ্দোল" "পালকী" প্রভৃতি করিয়া সেই প্রতিমাগুলি বিসর্জ্জন হইত। গহনাদি বহুমূল্য বস্তু গুরুদেব খুলিয়া লইতেন ইহা তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। পূজার পনর দিন পূর্ব্বে শাস্ত্রসম্মত বিধানে বোধন বসিত ও প্রতিদিন এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী ভোজন হইত। মোট কথায় শরতের প্রারম্ভ হইতেই মিত্রজার প্রকাণ্ড পুরী আনন্দ-কোলাহলে উৎসবময় ভাব ধারণ করিত। আজ কালকার দিনে ঘোর তামসিকতাময় শারদীয়োৎসবে এ পবিত্র চিত্র অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শত

* কেহ কেহ বলেন গোবিন্দরাম মিত্র হইতেই "গোবিন্দপুর" নামের উৎপত্তি। কিন্তু অপর পক্ষের মতে কলিকাতার সর্ব্ব প্রাচীন অধিবাসী শেঠদিগের "গোবিন্দজীউ বিগ্রহের নাম হইতেই "গোবিন্দপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কারণেই নামের উৎপত্তি হউক না কেন, ফোর্ট উইলিয়মের নির্ম্মাণের পর হইতেই ইহা লোপ পাইয়াছিল।

বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মহামায়ার যে প্রকার ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা হইত আজ কাল তাহার ছায়া মাত্র কেবল অপরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মিত্রজার আমলের "পঞ্চাশমণী" নৈবিদ্যের কয়েকখানি থাল আজও মিত্র পরিবারের কোন সবিকের স্বত্বাধীনে রহিয়াছে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অতিথিশালার ব্যাপারেও মিত্রজা কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশ করেন নাই। চিৎপুরের ভগ্নপ্রায় নবরত্ন তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। এই নবরত্নের সান্নিধ্যে তিনি একটী সুবৃহৎ "জোড়াবাঙ্গলা" নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে "গোকুলচন্দ্র," "বলদেব," প্রভৃতি বিগ্রহ ও কয়েকটী শালগ্রাম শিলা ষোড়শোপচারে পূজিত হইত। "জোড়াবাঙ্গলার" সন্নিহিত বলিয়া এই নবরত্নও "জোড়াবাঙ্গলা মন্দির বলিয়া কথিত হইত।

ইংরাজ মহলে মিত্রজার বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলিয়া কোন কোন মহোৎসব উপলক্ষে বড় বড় ইংরাজেরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হইতেন। তৎকালীন ইংরাজেরা বাঙ্গালীর সহিত বড় মিশিয়া থাকিতেন, কিন্তু "ডিনার পার্টির" নাম গন্ধও ছিল না। ক্লাইব, ভান্সিটার্ট প্রভৃতি গবর্ণরগণ দুই একবার মিত্রজার অতিথি হইয়াছিলেন।

১১৭৩ সালের আষাঢ় মাসে—অশীতি বৎসর বয়সে প্রভুত ক্ষমতাশালী নায়েব জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র অতুল ঐশ্বর্য্য ও পুত্র কন্যা রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার "লাঠীর জোর" তাঁহার সহিত শেষ হইয়াছিল। তিনি ইংরাজের আমলে যে প্রকার উচ্চপদে প্রভুত ক্ষমতা পরিচালন করিয়া চাকরী করিয়া গিয়াছিলেন—ভবিষ্যতে কোন বাঙ্গালীর অদৃষ্টে সেই প্রকার সম্মান ঘটে নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহার সকল কার্য্যের কোন লিখিত বিবরণ নাই। নানা স্থান হইতে "খণ্ডাংশ" সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, পাঠক তাহাতেই গোবিন্দরাম মিত্রের পরিচয় পাইবেন।

গোবিন্দরাম মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রঘুনাথ মিত্র পিতৃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। রঘুনাথ মিত্র মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। মহারাজা নন্দকুমারের যে বৎসর ফাঁসী হয় রঘুনাথ সেই বৎসরে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। পিতার পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিয়া দান ধ্যানাদিতে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর পর যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সুখে কাটাইয়া ছিলেন। পিতার ন্যায় পূর্ণ সমারোহে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করিয়া তিনি অনেক পরিমাণে পিতৃনাম রক্ষা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মিত্রের একটী অবিনশ্বর কীর্ত্তি আজও বনগ্রামে বর্ত্তমান আছে। বনগ্রামের অন্তর্গত বৈরামপুর গ্রামে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের সময় সাতিশয় জলকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে রঘুনাথ মিত্র বহুব্যয়ে এক সুদীর্ঘ সুগভীর পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। পুষ্করিণীর সহিত একটী আম্রকানন তৈয়ার করিয়া দেন। এই সমস্ত আমগাছে যে ফল হইত তাহা সাধারণের সম্পত্তি। এই আম্র পক্কাবস্থাতেও কৃষ্ণবর্ণ থাকায় আজও ইহা "কেলোর আঁম" বলিয়া পরিচিত। বৈরামপুরের রঘুরাম মিত্রের পুষ্করিণীটী আজও "মিত্রপুকুর" বলিয়া পরিচিত হইয়া

আসিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ মিত্র প্রায় দশ বৎসর জীবিত ছিলেন। ১১৮২ সালের প্রারম্ভে চারি কন্যা, দুই পুত্র ও কয়েকটী প্রপৌত্র রাখিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সুবিখ্যাত স্যর এডওয়ার্ড কোলব্রুক ও এইচ কোলব্রুক সাহেবেরা বরাবরই এই প্রাচীন মিত্র পরিবারের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণচরণ মিত্র আসিয়া কোলব্রুক সাহেবকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। এই সময়ে কলেক্টার সাহেবের দেওয়ানের কার্য্য অতিশয় লাভজনক ও গৌরবসূচক ছিল, অনেকেই এই উচ্চপদ লাভের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উপযুক্ত মুরুব্বি না থাকিলে প্রায়ই বিফল-মনোরথ হইতেন। এই কাজে যেমন উপরি পাওনার সংখ্যা অধিক ছিল, তদ্রূপ পদোচিত ক্ষমতাও বড় কম ছিল না। প্রকৃত পক্ষে দেওয়ানই মূর্ত্তিমান কলেক্টার সাহেব হইয়া উঠিতেন। কৃষ্ণ বাবু এই পদ লাভ করিয়া পিতামহের পূর্ব্ব ক্ষমতা অনেকটা সজীব করিয়া তুলিলেন। গোবিন্দরামের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ বাবুর সময়ে মিত্র পরিবারের যে প্রকার সজীব ও আনন্দ-কোলাহলময় অবস্থা হইয়াছিল, ইহার পরে আর কখনও সেরূপ হয় নাই। ইহার পরেই পৈত্রিক একমালি সম্পত্তি ক্রমশঃ বিভাজিত হইতে থাকে।

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র বাবু কৃষ্ণচরণ মিত্র হইতে এই সময়ে মিত্র পরিবারের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়, ইহার অব্যবহিত পরে গৃহবিবাদে সেই উন্নতির মূলে দৃঢ় কুঠারাঘাত পড়ে। অনেকে বলেন কৃষ্ণ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র অভয়চরণ মিত্র হইতেই এই গোলযোগ প্রথম উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ বাবু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভয় বাবুকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভাশালী দেখিয়া কোলব্রুক সাহেবের নিকটে পরিচিত করিয়া দেন। খুল্লতাতের পৃষ্ঠপোষকতায় অভয় চরণ ২৪ পরগণার কলেক্টারের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হন। অভয় বাবু স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভার সহায়ে শীঘ্রই কলেক্টর সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা জরিপ হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কলেক্টার সাহেব এই কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও পূর্ণ ক্ষমতা স্বীয় দেওয়ান অভয় বাবুকে অর্পণ করেন। অভয় বাবু অতিশয় দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সরকার হইতে খুব বাহাদুরি লইলেন।

এই জরিপি কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত মিত্র পরিবারের, বিশেষতঃ অভয় মিত্রের, বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। শোভাবাজারের অন্যান্য অংশ মাপ হইয়া গেল। মহারাজ নবকৃষ্ণের সুবৃহৎ পুরীর মাপ আরম্ভ হইল। বহির্ব্বাটীর সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে অন্তঃপুরাধিকৃত স্থানগুলি মাপিবার আবশ্যকতা হইল। মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বীয় অন্তঃপুরের ভিতর কোম্পানীর লোক প্রবেশ করিতে দিতে নিতান্ত নারাজ হইলেন। তিনি মিত্রজাকে বলিলেন, "অন্তঃপুর আর মাপিয়া কি হইবে, একটা মোটামুটি মাপ ধরিয়া দিবেন।" কর্ত্তব্যপরায়ণ অভয়চরণ মহারাজের এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। মহারাজ নবকৃষ্ণকে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তিন সপ্তাহের জন্য সময় দিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত

হইতে হইল। কিন্তু তিনি মনে মনে অভয় মিত্রের উপর জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসা লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু হেষ্টিংসের আমল হইলে তিনি ইহার যাহা একটা করিতে পারিতেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেব সেই সময়ের গবর্ণর। সুতরাং অভয় মিত্রেরই জেদ্ বজায় রহিল।

মহারাজা নবকৃষ্ণের অন্তঃপুর মাপ হইয়া গেল। তিনি সহসা অভয় মিত্রের খুল্লতাত কৃষ্ণচরণ মিত্রের নামে তাঁহার পিতৃকৃত দেনার জন্য এক নালিশ করিলেন। খত খানি সঙ্গে সঙ্গে আদালতে দাখিল হইল। তখন মিত্র পরিবার এজমালিতে ছিলেন, সুতরাং অভয় বাবু প্রভৃতি সকলেই ইহাতে জড়িত হইবার সম্ভাবনা হইল। মহারাজ নবকৃষ্ণের দাখিলী খত খানি প্রকৃত হইলেও কৃষ্ণচরণ মিত্র প্রমাণ প্রয়োগের সহিত নিম্নলিখিত জোবানবন্দী দিলেন—"খত খানিতে যে দস্তখত আছে তাহা আমার পিতা রঘুনাথ মিত্রের দস্তখত বটে কিন্তু ঐ খতের লিখিত বেবাক টাকা মায় সুদ আমরা পরিশোধ করিয়াছি। মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত আমার পিতা মহাশয়ের অতিশয় হৃদ্যতা থাকায় টাকা দেওয়ার সময়ে ঐ খতখানি ফিরাইয়া লওয়া হয় নাই। মহারাজ নবকৃষ্ণ মিথ্যা করিয়া এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন।" আদালত প্রমাণ পাইয়া এই ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, ও মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। মহারাজ নবকৃষ্ণ এই ব্যাপারে বড় মনস্তাপ পাইলেন।

বাবু কৃষ্ণচরণ মিত্র ঢাকার কলেক্টার সাহেবের দেওয়ানী করিতেন। তিনিই বংশের মধ্যে প্রথমে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র মিত্রের বিবাহ সময়ে নন্দন বাগানের বাটীতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছিল, গোবিন্দরাম মিত্রের মৃত্যুর পর মিত্রবংশে সেরূপ আর ঘটে নাই। তখনকার বড় লোকেরা কেবলমাত্র বাড়ীতে কামান সাজাইয়া রাখিতে পাইতেন, কিন্তু তাহাতে আওয়াজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রসাদভাজন ছিলেন তাঁহারাই কালে ভদ্রে, কোন মহোৎসবে কামান দাগিতে পারিতেন। কৃষ্ণচরণ বাবুর এইরূপ দুই কামান ছিল, তিনি তৎকালীন গবর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট এই বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করাতে তাহা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল। অনেক উপরিওয়ালা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুতরাং এই বিবাহ উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রাকার হইতে কয়েকটী তোপের আওয়াজ করা হইয়াছিল। এ প্রকার রাজসম্মান ইংরাজের রাজ্য হইয়া অবধি আজও পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী পান নাই। বাবু কৃষ্ণচরণ মিত্র নন্দনবাগানে যে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা আজও বর্ত্তমান আছে, এখনও তথায় মিত্রবংশধরেরা বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণচরণ মিত্রের পৌত্র কাশীশ্বর মিত্র পরিশেষে বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। ইংরাজি ভাষায় তিনি অতিশয় সুদক্ষ ছিলেন—তৎকালীন অনেক বড় বড় সভা সমিতিতে তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে দেখা

যাইত। হুগলীর প্রধান সদর আমিনের পদে অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট অতিশয় প্রশংসা লাভ করেন। বাবু কাশীশ্বর মিত্র কলিকাতায় একটী "শবদাহের ঘাট" স্থাপন করিয়া তৎকালীন একটী প্রধান অভাব মোচন করিয়া দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত কাশীশ্বর বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

গোবিন্দরাম মিত্রের বহুশাখা-বিস্তৃত বংশের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সকলের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে গেলেও প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্তরূপে বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমরা তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন বাবু অভয় চরণ মিত্র ও বারাণসীর বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অভয় বাবুর সম্বন্ধে আমরা উপরে দুই চারিটী কথা বলিয়াছি। চব্বিশ পরগণার কলেক্টারের দেওয়ান হইয়া তিনি স্বাধীন ভাবে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করেন। সৎ কর্ম্মেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় ছিল। গোবিন্দরাম মিত্রের প্রথা অনুসারে তিনিই মহা সমারোহে দুর্গা ও কালী পূজা করিয়াছিলেন। তিনি কতদূর দাতা ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাতেই প্রমাণ হইবে। এক সময়ে অভয় বাবুর কুলগুরু কুমারটুলির বাটীতে শুভাগমন করেন। শিষ্য অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন—সুতরাং গুরুদেব প্রায়ই কুমারটুলিতে আসিয়া থাকিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে গুরুদেব অভয় বাবুকে বলিলেন—"বৎস অভয়চরণ, আমি এত বড় বনিয়াদি পরিবারের গুরু, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি আমার প্রধান শিষ্য—এতবার কলিকাতায় যাতায়াত করিয়াছি, অন্যান্য বড় লোকের বাটীতে গিয়াছি—কিন্তু কখনও লাখ টাকা একত্রে কতগুলি হয় দেখিলাম না।" অভয় বাবু গুরুকে লাখ টাকা দেখাইবার জন্য দুই দিন সময় প্রার্থনা করিলেন। তৃতীয় দিবসে কাছারী হইতে বাটী প্রবেশ করিয়া গুরুদেবকে লইয়া একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, স্তূপাকার রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"এই দেখুন গুরুদেব! লাখ টাকা কতগুলি, এগুলি আপনাকেই দেওয়া হইয়াছে।" গুরুদেব এ প্রকার অভাবনীয় ঘটনায় অতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া এ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে মিত্র পরিবারের গুরুবংশের অবস্থা অতিশয় উন্নত হইয়া উঠে। আজ কালও মিত্র বংশীয় অনেকের অপেক্ষা এ গুরু বংশের অবস্থা স্বচ্ছল বলিয়া বোধ হয়। আজও লোকে "লাখ টাকা" দানের কথা উঠিলে—"অভয় মিত্রের" গল্প করিয়া থাকে।

জানি না কোন্ পাপে এই সময়ে মিত্র পরিবারের মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল—কি কারণে শান্তি সমুদ্রে সহসা অনিবার্য্য দাবানল জ্বলিয়া উঠিল? এত বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার যাহাতে দুই বেলায় ২।৩ শত পাত পড়িত—যাহা চিরকালই মহোৎসবময় বলিয়া বোধ হইত, তাহা এই সময়ে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে ক্রমশঃ অবনতির অন্ধকারময় গহ্বরে নামিতে লাগিল। এই সময়ে অভয় বাবু তাঁহার

খুল্লতাত কৃষ্ণ বাবুর নামে আদালতে এজ-মালি বিষয় সম্বন্ধে এক নালিশ উপস্থিত করিলেন। নানা প্রকার গোলযোগে ও বিশৃঙ্খলায় ঋণদায় ঘটিতে লাগিল ও ঋণ হইতে সাধারণ সম্পত্তি বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। অভয় বাবু গোবিন্দরাম মিত্রের অনেক বিষয় বেনামে খরিদ করিলেন। কৃষ্ণ বাবু বেনামে "নন্দনবাগান" কিনিয়া লইলেন। আনন্দময় মিত্র রাজসাহী জেলার ডিহি ব্যাস পরগণার জমীদারি স্বীয় নামে ক্রয় করিলেন। ইহার পর কৃষ্ণ বাবুর সহিত অভয় বাবুর বিবাদ তৎকালীন কলিকাতায় বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন বাবু নিমাই মল্লিক ও বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

জীবনের শেষ ভাগে অভয় চরণ মিত্রজা মহাশয় মৈনপুরীর কলেক্টার সাহেবের অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ১৮০৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থলে গমন করেন। মৈনপুরী হইতে তিনি অযোধ্যা, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কর্ম্মস্থলে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার শরীরের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছিল, সেই বিদেশে পরিবারবর্গ কেহও নিকটে ছিলেন না—একমাত্র খুল্লতাতপুত্র শম্ভুচন্দ্র তাঁহার অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাটী প্রস্থানের নিমিত্ত আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা কালব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১২১৫ সালের কার্ত্তিক মাসে অভয় চরণ মিত্র আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া বিদেশে জীবলীলা সম্বরণ করিলেন।

শম্ভুচন্দ্র এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অর্থবল থাকিলেও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গঙ্গাযাত্রার কোন উপায় করিতে পারিলেন না বলিয়া বড় মর্ম্মপীড়া পাইলেন। মৈনপুরী হইতে ফরেকাবাদ প্রায় এক দিনের পথ। অষ্টাদশবর্ষীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণ শম্ভুচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া শেষ কৃত্য করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যুবকের প্রতিজ্ঞা নানাবিধ অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও পূর্ব্ববৎ স্থির রহিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাহক সংগ্রহ করিয়া একখানি পালকীতে ভ্রাতার শবদেহ তুলিলেন। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেই পালকীর পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া ফরেকাবাদে উপস্থিত হইলেন। ফরেকাবাদে জাহ্নবী-তীরে সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে যথোচিত-উপায়ে শবদাহ হইয়া গেল। ক্ষুণ্ণমনে কাতর হৃদয়ে ভ্রাতৃবিরহ-শোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। শম্ভুচন্দ্র অভয় বাবুর খুল্লতাত কৃষ্ণচরণ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কলিকাতার বাটীতে এই শোচনীয় সংবাদ উপস্থিত হইলে, অভয় চরণের বিধবা পত্নী যথেষ্ট শোকসন্তপ্ত হইলেও প্রফুল্ল হৃদয়ে পরলোকে স্বামী সঙ্গে অনন্ত মিলনে মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে প্রকৃত আর্য্যললনার ন্যায় স্বামীর "খড়ম" হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতানলে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহলোকে কেবল অভয় মিত্রের ছয় পুত্র, অতুল সম্পত্তি ও অক্ষত সম্মান পড়িয়া রহিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধরগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায়

তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পৌত্র আনন্দময় মিত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে বাস করিলেন। রাজসাহির জমীদারির আয় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, সুতরাং বারাণসীতে আসিয়া তিনি এক উচ্চদরের ধনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ের পুত্র রাজেন্দ্র বাবুই বারাণসীতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বহুকাল বারাণসীতে বাস করার জন্য রাজেন্দ্র বাবু প্রকৃত হিন্দুস্থানী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপাদি কিছুই ভুলিয়া দেন নাই।

কাশীধামে রাজেন্দ্র বাবু যে প্রকার সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব করিতেন, তাহাতেই এই অঞ্চলে তাঁহার যশোরাশি বিশেষরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মিত্রবংশের প্রথম পুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র যে প্রকার উচ্চদরের শক্তিপূজা করিতেন, রাজেন্দ্র বাবু তাহা অপেক্ষা সমারোহের আরও এক মাত্রা বাড়াইয়াছিলেন। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি প্রায় ২৫০০০ টাকা ব্যয় করিতেন। দরিদ্রকে অন্ন দান বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করিয়া তিনি সকলেরই আশীর্ব্বাদভাজন হইতেন। নৃত্য গীত ও মহোৎসবাদির আয়োজনেরও ত্রুটি হইত না। এই উপলক্ষে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। স্বয়ং কাশীরাজও এই সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিতেন।

রাজেন্দ্র বাবুর প্রতিমা বিসর্জ্জন ব্যাপার অতিশয় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। প্রতিমা বিসর্জ্জনের অব্যবহিত পূর্ব্বে চারি পাঁচ শত আশা সোটা, ও বল্লাম, বহুল রজত ছত্র, সূর্য্যমুখী, অরুণক, মহীমার্ত্তব প্রভৃতি লইয়া বহুতর লোক অগ্রে ধাবিত হইত। মধ্যে স্বর্ণখচিত রৌপ্যময় চতুর্দ্দোলে, মনোহারিণী দশভুজামূর্ত্তি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতা। পশ্চাতে কতকগুলি হস্তী অশ্ব উপযুক্ত আরোহীতে সুশোভিত—এই প্রকার মহাসমারোহের সহিত প্রতিমা লইয়া গিয়া জাহ্নবীগর্ভস্থ করা হইত। একে ত বারাণসীতে বিজয়ার দিন বিসর্জ্জনের বড় জাঁক, রাজেন্দ্র বাবুর সময়ে, ইহা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে গঙ্গাতীরে এত জনতা হইত যে কোতোয়ালির সাহায্য ব্যতীত শান্তি রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইত।

রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক দানশীলতা ও আমীর-আনা চালের জন্য বারাণসীর সাধারণের নিকট রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অনেক উপাধিধারী রাজার অপেক্ষা উচ্চদরের কার্য্য করিয়া স্বীয় নাম চিরবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বারে শত শত অস্ত্রশস্ত্র শোভিত প্রহরী পুরী রক্ষা করিত, তাঁহার নাক্‌রাখানা হইতে প্রতি প্রহরে নহবৎ বাজিত,—তাঁহার অতিথিশালায় শত শত অভুক্ত ভিক্ষুক প্রতিদিন অন্ন পাইত, তাঁহার রাজপথে বা বিশেশ্বর দেখিতে বাহির হইবার আশায় শত শত দীন দুঃখী পথের দুই পার্শ্ব জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। গরিবে যেমন তাহার দর্শনেচ্ছা করিত, অনেক বড় বড় লোকও তদ্রূপ তাঁহার বন্ধুত্ব প্রয়াসী হইয়া তাঁহার বাটীতে আসিতেন। তাঁহার সময়ে বারাণসী দেখিতে যে সমস্ত বড় বড় জমীদার আমীর ওমরাহ ও নবাব আসিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করি-

তেন। এই সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি পদোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইতে রাজেন্দ্র বাবুর অনেক খরচ হইত। বন্ধুদের প্রীতি বা স্মরণচিহ্ন স্বরূপ তিনি এই সকল আগন্তুককে মণিময় অঙ্গুরীয়, বহুমূল্য শাল, বা অন্য কোন প্রকার প্রীতি-নিদর্শন দিয়া আপ্যায়িত করিতেন। সাধারণের উপকারার্থে রাজেন্দ্র বাবু সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন, তাঁহার বারাণসীর অন্তর্গত মুকুন্দপুর ষ্টেটের সীমাভুক্ত কিয়দংশ জমী এক সময়ে সাধারণের উপকারজনক কোন কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হয়। কমিসনার সাহেব নানা কারণে এই জমী সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ অল্প ক্ষতিপূরণে রাজেন্দ্র বাবু ইহা না দিতে পারেন, কিন্তু এ টুকু না হইলে সাধারণের বড় অসুবিধা হয়। রাজেন্দ্র বাবু অতিশয় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাধারণের এই প্রকার অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া তিনি বিনা মূল্যে সরকারের প্রয়োজনীয় উক্ত ৮২ বিঘা জমি সাধারণের হিতার্থে বিনা বাক্যব্যয়ে অর্পণ করেন। এই জমীর কিয়দংশের উপর দিয়াই বর্ত্তমান বেণারস রাজঘাট রেলওয়ে চলিতেছে। এই উপকার স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ৫ই ডিসেম্বরের (১৮৪৯ খৃঃ অঃ) মন্তব্য পুস্তকে রাজেন্দ্র বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

এই সাধারণ হিতকর কার্য্যসাধন উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক ছড়া মুক্তাহার, একটী হীরাঙ্গুরীয়, একটী জড়োয়া খচিত কোমরবন্ধনী. পাক্‌ড়ী, ও তদুপযুক্ত জামা. ও এক-খানী পাল্কী উপঢৌকন দিয়া সম্মানিত করেন।

চুয়ান্ন সালে পারিসের আন্তর্জাতিক মহা প্রদর্শনীতে রাজেন্দ্র বাবু একটী "মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কারুকার্য্য খচিত নাচ্‌মজ্‌লিসের প্রতিমূর্ত্তি" পারিসে পাঠাইয়া দেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহার কারুকার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে "রাজা রাজেন্দ্র" বংশী দাস, ও গুরুদাস নামক দুই পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য, ও অক্ষত সম্মান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। বারাণসী কলেজের বর্ত্তমান সুবিস্তৃত তোরণ, তাঁহার নিজ প্রাসাদ, ইত্যাদি আজও তাঁহার কীর্ত্তি বারাণসীতে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে ধনী দরিদ্র সকলেই দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অমায়িকতা ও সদাশয়তার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজেন্দ্র বাবুর মৃত্যু সংবাদে সাতিশয় ব্যথিত হন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের তৎকালীন গবর্ণর কল্‌ভিন্‌ সাহেবও এই সময়ে একখানি শোক-সূচক পত্র লিখিয়া সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গুরুদাস পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া উঠেন। মিউটীনির সময় গুরুদাস বাবু গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া "খেলাৎ" পান। আজ কাল বারাণসীতে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

চিন্তা করিতেছে, আর একজন এক এক বার মাথা হেট করিতেছে আবার তৎক্ষণাৎ তির্য্যকনয়নে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে, আর কত কি ভাবিতেছে। ইহারা অন্য কেহ নয়, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত হেমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ।

হেমচন্দ্রের চিন্তার কুল কিনারা নাই। সে কি একটা? কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা ভাবিবে? একেবারে যে সব গুলা আসিয়া মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছে। তেমন একটা ঘটনা ঘটিলে লোকে অধীর হইয়া পড়ে, আর এ উপর্য্যুপরি বিপদের পর বিপদ্, সে কেমন করিয়া সামলাইবে? ভগবন্ কেন এমন করিলে? যাহাকে মারিবে মনে কর তাহাকে কি এমনই করিয়া মারিতে হয়! সেই মা—সেই আনন্দময়ী জননী চিরদিনের জন্য অভাগাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন—আজও দশ রাত্রি অতীত হয় নাই—সে শোক কি ভুলিবার? তার পর এ কি! বসুমতী! বসুমতী কে? কেন তাহার জন্য প্রাণ কাঁদে? ঘোর দুর্য্যোগের সময়ে একবার বিজলীর ন্যায় দেখা দিল, অভাগার অন্ধকার হৃদয় আরও অন্ধকারতর করিয়া, কোথায় লুকাইল? হেমের স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে এ কেবল তাহারই অদৃষ্টফল। নহিলে সেই প্রকৃতিপুত্তলী এতদিন তো কোথাও যায় নাই! তাহার মাতা, প্রতিবেশীমণ্ডলী, গ্রামস্থ সকলেই যে তাহার জন্য হাহাকার করিতেছে। বুঝি তাহার সহিত দেখা না হইলে সে বালিকার এ অবস্থা ঘটিত না। হেম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, মাতৃশ্রাদ্ধের পর একটু সুস্থির হইয়া ভাল করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিবে; কিন্তু কি দৈববিড়ম্বনা! হেম তাড়াতাড়ি চতুর্থের দিন বহিয়া যায় বলিয়া, ছুটিয়া বাড়ী আসিল, বাড়ী প্রবেশ করিতে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা ভগ্নহৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, সে বহুজনপূর্ণ প্রকাণ্ড পুরী শূন্যময়, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, একা বিরাজ ভিন্ন সে বাড়ীতে আর কেহ নাই। বিরাজ হেমকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল। শুনিয়া হেম বসিয়া পড়িল, অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে হেম উঠিয়া দাঁড়াইল, বাষ্পপীড়িত কণ্ঠে বলিল "বিরাজ, আমি আসি।" তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। বিরাজ বলিল "রাত্রি হইয়াছে, কোথা যাইবে, মুখে জল দাও।" হেম কোনও কথা বলিল না। কথা বলিবার ক্ষমতা তখন তাহার ছিল না। নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। বাহিরে রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়াছিল, সে হেমের মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া গেল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। সংক্ষেপে হেম তাহাকে দুই এক কথায় সব বুঝাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বাটীর বাহির হইলেন। অবাক্ হইয়া বিরাজ দাঁড়াইয়া রহিল। সেই রাত্রেই হেম কত স্থান খুঁজিল, কত লোককে মনোরমার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল, কেহই কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। তখন দুইজনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অন্বেষণ করিতে লাগিল। পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কোন সন্ধানই মিলিল না। বড় রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে হতাশাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আজ দুইজনে আসিয়া এই দোকানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া পর্য্যন্ত হেম কেবল আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয়ই আলোচনা করিতেছে। মনোরমা—মনো-

রমা কোথায়? সংসারের একটী মাত্র যে বন্ধন ছিল তাহাও ভগবান্ ছিন্ন করিয়াছেন! বিধাতঃ তোমার এ কেমন বিচার ঠাকুর? এই কি তোমার দয়াময় নামের মহিমা? হেম প্রতিজ্ঞা করিল, যদি মনোরমার দেখা না পাই তবে এ শূন্য পৃথিবীর বোঝা হইয়া আর থাকিব না। কিন্তু তাহাও তো এখন হইতেছে না, আজও যে মাতৃ অশৌচের কাচা গলা হইতে নামে নাই। নয় দিন হইয়া গেল, কাল অশৌচান্ত, পরশ্ব শ্রাদ্ধ। তাহারই বা কি হইবে? সে কথা মনে হওয়ায় হেম আকুল হইয়া উঠিল, এতদিন এ কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই। কি হইবে? উপযুক্ত সন্তান জীবিত থাকিতে মাতার প্রেতকৃত্য হইবে না? বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। হেম গাঁটে হাত দিয়া দেখিল আর পাঁচ গণ্ডা পয়সা মাত্র সম্বল আছে, সে তো আর দুই দিন রামকৃষ্ণের আফিমের খরচেই যাইবে।' রামকৃষ্ণ আর কিছু খান না খান দুবেলায় আধ ভরি আফিম নহিলে কোন মতেই চলে না। একদিন মৌতাতের সময় একটু বহিয়া যাওয়ায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, হেম সেই পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের জন্য আগে আফিমের যোগাড় বাধিয়া তবে অন্য কিছু করিত। হেম দেখিল, পাঁচ আনার পয়সা মাত্র—আর কিছু নাই। চক্ষে জল আসিল। নিঃশব্দে তাহা মুছিয়া ফেলিল। একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার জন্য প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করিয়া উঠিল, হেম তাহা পারিল না। পারিলে বুঝি ভাল হইত। বড় কষ্টে এক মাত্র সান্ত্বনা রোদনে; সে রোদনে যে বঞ্চিত তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর নাই।

হেমের চিন্তার আর তো 'ওর' নাই, রামকৃষ্ণও নিশ্চিন্ত নহে। ভাবিতেছে, "এ কি? কোথায় শ্বশুরালয়ে কিছু টাকাটা সিকাটা পাওনার আশায় গেলাম, তা না হইয়া এ কি বিপদ্ জড়াইয়া ধরিল? চলিয়া গেলেও তো যাইতে পারি, কিন্তু তাও বা পারি না কেন? হেমকে এ বিপদে একা ফেলিয়াই বা যাইতে মন সরে না কেন? শ্যালক তো গণ্ডায় গণ্ডায় অনেক আছে, তাহাদের কাহারও জন্য মন তো কখন এমন হয় না, তবে হেমের জন্য হঠাৎ কেন এমন হইল? এ অতি অন্যায়। কুলীনের হৃদয়ে এত দয়া ভাল নয়। অতি শব্দটা বড় খারাপ; ইহাতে ব্যবসা মারা যাইবার লক্ষণ। আর মনোরমা?—মনোরমা স্ত্রীটা নিতান্ত মন্দ নয়। তাহাকে পাইলে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পাওনা সম্বন্ধে আর কস্মিন্ কালে কোন সম্ভাবনা নাই। পিতার আজ্ঞা, শ্বশুরবাড়ী হইতে মাসিক অন্ততঃ দশ টাকা না পাইলে স্ত্রী গ্রহণ নিষেধ। পিতৃ-আজ্ঞাই বা অবহেলা কি করিয়া করা যায়?" রামকৃষ্ণ একটু বিষণ্ণ হইল, নিস্তব্ধে মনের তৌলদণ্ডে পিতৃ-আজ্ঞা ও স্ত্রী গ্রহণ দুইটী বিষয় তুলনা করিতে লাগিল। সহসা পেটের ভিতর চিড়িক্ পাড়িয়া উঠিল। সেই বসুমতীদের বাড়ীতে যে আহার হইয়াছিল, তার পর আজ কয় দিন একরূপ আহার নাই বলিলেই হয়। পথে পথে দোকানে ঘাটে দুই এক আনার জল খাবারে সে ক্ষুধার কি হইবে? ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় রামকৃষ্ণ একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। দেখিল, সেই দোকানের দক্ষিণ ধারে প্রকাণ্ড মাচার উপর থবকে থবকে আহারীয় সামগ্রী সাজান রহিয়াছে

রামকৃষ্ণ যতক্ষণ ময়রা জাতির নির্ব্বু-দ্ধিতা ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের পথ আলোচনা করিতেছিল, ময়রার পো ততক্ষণ তক্তাপোষের উপর বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা টানিতেছিল, আর মোড়লদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। দোকানী ব্রাহ্মণ দুই জনকে দেখিয়া, এক সঙ্গে দুইটা খরিদ্দার লাভ হইল ভাবিয়া, "আসতে আজ্ঞে হয়, বসুন" বলিয়া প্রথমে বড় খাতির যত্ন করিয়াছিল। এখন দেখিল, এ ভুয়ো খরিদ্দার, ভাবগতিক বড় ভাল নহে। সুতরাং দোকানীও আপনার পূর্ব্বের ভাব পরিবর্ত্তন করিল। এখন আর সে তেমন যত্ন করিয়া কথা কহে না, পা ধুইতে বলে না, নজে তামাক সাজিয়া আগে রামকৃষ্ণকে হুঁকা দেয় না। এখন তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইলে দশবার চাহিতে চাহিতে তবে দোকানী একবার কলিকাটী খুলিয়া দেয়, তাও যাহা দেয় সে 'পোড়া 'গুল' মাত্র। দোকানীর ব্যবহারে রামকৃষ্ণ মনে মনে বড়ই চটিয়া গেলেন। তাহার সর্ব্বনাশের বিধান সূচক অনেক কথা মনে মনে উচ্চারণ করিয়া মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। দোকানী গবিষান হইয়া সেই ভাবেই তামাক খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিল।

গল্পটা এমন কিছু একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া হইতেছিল না। কথায় কথায় যাহা উঠিতেছিল, তাহাই লইয়া আলোচনা হইতেছিল। যাহার যতদূর অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন সে সেই সমস্ত প্রয়োগ করিতে ক্রটী করিতেছিল না। প্রথমতঃ সেই দিনের সেই প্রচণ্ড রৌদ্র লইয়াই গল্প উঠিল। রৌদ্রের কথা যখন পড়িল তখন

ইহা সে দোকানে প্রবেশ করিবার সময়েই দেখিয়াছিল। এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া তাহাদিগের সহিত তাহার সেই উদ্রিক্ত ক্ষুধার কি সম্বন্ধ তাহাই বিচারে প্রবৃত্ত হইল। আগে বলা হয় নাই, ইহা একখানি ময়রার দোকান। সেই মাচার উপর কোথাও চেঙ্গারি করা চিঁড়া, মুড়কি, মুড়ি, কোথাও থালার উপর কদমা, বিরখণ্ডি বাতাসা, আর সকলের উপর এক থালা সন্দেশ—এ সব এক সঙ্গে মিলিয়া কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রামকৃষ্ণের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। রামকৃষ্ণ আরও একটু উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিল। দেখিল, তাহারই উপর একদিকে শিকায় চারি পাঁচ খানি দৈ বহিয়াছে, আর পার্শ্বে কাঁচায় পাকায় এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা ক্ষুদ্র এক গাছি দড়ি অবলম্বনে রূপের দোলায় দুলিতেছে। রামকৃষ্ণ আরও দেখিল, মাছি, মৌমাছি, বোল্তা সেই স্থানটীকে একেবারে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া রামকৃষ্ণের মনে বড়ই কষ্ট হইল। এই সব সামগ্রী দেবতা ব্রাহ্মণের সেবায় না লাগিয়া কি না কতকগুলা যৎসামান্য কীট পতঙ্গের ভক্ষ্য হইতেছে, ইহা ভাবিয়া রামকৃষ্ণ ময়রার চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্দেশে মনে মনে বিস্তর গালি দিল। ভাবিল, "ময়রা জাতি কি বোকা, আমি রামকৃষ্ণ শর্ম্মা—স্বকুলভঙ্গের বেটা—আমি আসিয়া ইহার দোকানে বসিয়াছি, দোকান পবিত্র হইয়া গেল, তা, ও কি না চিনিতে পারিল না, এমন সুযোগ হাতে পাইয়াও এত বড় পুণ্যটা সঞ্চয় করিতে পারিল না। বেশি কি, ফলাহারের যোগাড়টা ভাল রকম করিয়া দিলেই হইত; দক্ষিণা! তাহা না হয় নাই লইতাম।"

অবশ্যই সেই রৌদ্রের ভাবী ফল যাহা তাহারও কথা পড়িল। সুতরাং অজন্মা ও সাধারণ শস্যের অবস্থা ঘটিত আলোচনা আরম্ভ হইল। অজন্মা হইতেই মন্বন্তরের কথা। এই সময়ে মাঝে হইতে একজন একটু টীকা করিয়া স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, ঘোর কলি বলিয়াই এই সব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, পৃথিবী আর অল্প কালই থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে মন্বন্তর হইতে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের কথা উঠিল। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইল। তাহা কেহ দেখে নাই, সকলেরই শোনা কথা, যে যেমন শুনিয়াছিল সে তেমনি বলিতে লাগিল, যে শুনে নাই সে আরো বেশী করিয়া বাড়াইয়া বলিল। সেই মন্বন্তরে নাকি পেটের দায়ে কত লোকে পুত্র কন্যা বিক্রয় করিত, কত কত বড় ঘরের মেয়ে অনাহারে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। ইহাই ধরিয়া প্রসাদ বলিল, সে ছেলেবেলা তার আয়ির মুখে শুনিয়াছে, তাহার আয়ির পিস্‌তুতো ননদের খুড়শ্বশুর নাকি সেই সময়ে একটী মেয়েকে কুড়াইয়া পায়, তার মত রূপ বিশ্বাঙ্গালায় কেহ কখন দেখে নাই। প্রসাদ যখন বলিল, তখন, নফরই বা ছাড়িবে কেন? সেও এমনি দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া গল্প বড়ই জমাইয়া তুলিল। তখন অন্য কথা গিয়া স্ত্রীলোকের রূপের কথা আন্দোলন হইতে লাগিল। নিধু বিধু, হারাণী পরাণী, জয়া মায়া ইত্যাদি অনেক নামের পর শেষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, আজ দুই দিন হইল যে মেয়েটীকে পদ্মর মা পথে একেলা দেখিয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবার জন্য যত্ন করিয়াছিল তাহার মত রূপ কেহই কখনো দেখে নাই।

কথাটা হেমের কানে বাজিল। অমনি সর্ব্বশরীর যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। হেম আপনার চিন্তা রাখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার সেই গল্পের প্রতি মন দিল। রামকৃষ্ণ তখনও তাহার নিজের উদ্রিক্ত ক্ষুধা আর সম্মুখে শোভমান অথচ সেই অস্পৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী, আর তরুণীভার্য্যার বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় সেই সব দেবভোগ্য সামগ্রীর অধিকারী এই নির্ব্বোধ "বোকা মযরা বেটা এই সকল তত্ত্বে মীমাংসা লইয়া বিব্রত ছিল; সুতরাং এ গল্পের প্রতি মন দিবার সময় তাহার ছিল না।

হেম শুনিলেন, দোকানী বলিতেছে, "মেয়েটী বোধ হয় কোন বড় ঘরওয়ালা হইবে।"

অন্য একজন বলিল "তাই বা কেমন করিয়া বলি। পরনে তো দেখিলাম, একখানি সামান্য চিকুট।"

দোকানী বলিল 'বোধ হয় বড় ঘরের মেয়ে, এখন আর সে অবস্থা নাই। বড় বিপদে না পড়িলে কি অমন করিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়?"

নফর বলিল 'আহা, যখন সকলে আসিয়া তাহার বাপ মার কথা জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েটী একটীও কথা কহিতে পারিল না, কেবল ডাগর ডাগর চোক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, দেখিয়া এমনি দুঃখ হইল।

দোকানী বলিল "কে আছে না আছে কিছুই বলিল না?"

প্রসাদ বলিল "কোন মতেই তো বলিবে না, তার পর পদ্মর মা তাহার সিঁতেয় সিঁদুর

ও হাতে রুলি দেখিয়া বিস্তর পীড়াপীড়ি করায় শেষ নাকি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, তাহার ভাই ও স্বামী দুইজনে তাহার মার মৃত দেহ সৎকার করিতে গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিল, সে আজ আট দিন হইল, আজও তাহাদের কেহ ফিরে নাই, তাই, সে পাগলের মত তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সেই ভাই ও স্বামী ভিন্ন আর তাহার কেহই নাই।”

হেম নীরবে শুনিতেছিল, কথাগুলা যেন শেলের মত হাড়ে হাড়ে বাজিল। বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। চোখ দিয়া জল ফাটিয়া আসিতে লাগিল। “মনোরমা—কোথায় বোন্, এই যে আমি” —চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইল। হেম তাহা পারিল না। তখনও আবার শুনিল, ফকিরচাঁদ বলিতেছে, ‘তোরা সব এক এক জন এক একটী বোকার রাজা। ও সব মিথ্যে—সব মিথ্যে। বলে,—নষ্টস্য কান্যা গতি—নষ্ট মেয়ে মানুষের অনেক কান! আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে হলপ করে বল্‌তে পারি, সে মেয়ে কখনই ভাল নয়। সে নিশ্চয়ই কারু সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, ছোঁড়া এখন পালিয়েছে, আর ছুঁড়ী পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চে। তা হবে না? ও তো কথাই আছে—

‘আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে,
পশ্চাৎ কাঁদিতে হবে অশ্রু ঝোর ঝরে।’

—কথা গুলা বিষাক্ত শরের মত হেমের কানে গিয়া আঘাত করিল। হেমের কণ্ঠা হইতে সমস্ত মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হেট মুখে কপাল টিপিয়া বসিয়া হেম মনে মনে বলিল ‘মা গো, আর কত মা, কোথায় আছ ডাকিয়া নাও!’

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়াই হউক, শ্রম ক্লান্তি অবসাদ বা মনের একাগ্রতা জন্যই হউক, অথবা বিধাতার করুণা বশতই হউক, সেই ভাবে নতমুখে বসিয়া বসিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে হেমের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সহসা কানের গোড়ায় একটা বিষম চেঁচামেচিতে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ রগড়াইয়া হেম চাহিয়া দেখিল, দোকানীতে ও রামকৃষ্ণে বড় ঝগড়া বাঁধিয়াছে, যে সমস্ত লোক বসিয়া গল্প করিতেছিল তাহারা সেখানে কেহই নাই। হঠাৎ এরূপ বিবাদের কারণ কি হেম তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু শুনিল, রামকৃষ্ণ বলিতেছে, আমি বেগের গাঙ্গুলি—বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, কত রাজরাজড়ায় আমার পা পূজা করবার জন্য লালায়িত, আর আমি স্বইচ্ছায় তোর দোকানে পায়ের ধুলা দিয়াছি, তুই তো তুই, তোর চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, তা তুই ছোটলোক তার মর্য্যাদা কি বুঝবি? তুই কিনা—”

“রামকৃষ্ণের সে কথা শেষ না হইতেই দোকানী বলিয়া উঠিল—দেখ ঠাকুর, চৌদ্দপুরুষ তুলো না, ভাল হবে না বলছি। আমি ছোট লোক হই ছোট লোকই আছি, তুমি না হয় বড় লোক; যে তোমার ঐ কাটা পা পূজো কর্ত্তে চায় সেখানে যাও, এখানে আর গোল করিও না।”

রামকৃষ্ণ রাগিয়া বলিল “কি এত দূর আস্পর্দ্ধা দেবতা ব্রাহ্মণে হতশ্রদ্ধা -

আমি কে তা চিনিলি না, আমায় বলিস্ কি না উঠিয়া যাও!"

দোকানী একটু হাসিয়া বলিল "চিনিয়াছি, ঠাকুর তোমায় চিনিয়াছি। কেন আর ঘাঁটাইয়া দু কথা শুনিবে। কুলীন বামন কি আবার বামন। কুলীনের কি জাত আছে?"

রামকৃষ্ণ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল—বসিয়া ছিল, দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল "কি! এত বড় কথা! উচ্ছন্ন যেতে হবে জান না।"

দোকানী বলিল—'উচ্ছন্ন যেতে হয় আমি যাইব, তুমি এখন যেখানে যাবে যাও। উঠ, ঠাকুর, তোমার সঙ্গীকে ডাক, বাহিরে যাও, আমি ঝাঁপ বন্ধ করি, ঘুম পাইয়াছে।"

ধীরে ধীরে হেম মাথা তুলিল, বলিল "ডাকিতে হইবে না, আমি আপনিই উঠিতেছি, তা এর জন্য এত দাঙ্গা হাঙ্গামা কেন, বাপু?"

দোকানী উত্তর করিল—"সহজে না হইলেই দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে হয়।"

বেশি কথা কহিবার সময় হেমের নহে, বেশি কথা কহা হেমের স্বভাবও ছিল না। ধীরে ধীরে বলিল 'উঠিতেছি।"

এই সময়ে ঝনর ঝনর ঝড়র শব্দে একখানি ঘোড়ার গাড়ি সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিকটে না আসিলেও দূর হইতেই সে চিরশ্রুত শব্দে বুঝা যাইত, গাড়ীখানি তৃতীয় শ্রেণীর। দোকানের সম্মুখে রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড বাদাম গাছ। সেই গাছতলায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়িখানি দেখিয়া হঠাৎ তাহা কি রঙের তাহা ঠিক্ করিয়া উঠা বড়ই কঠিন। মীমাংসা করিতে গেলেও এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা গিয়া থাকে। বর্ত্তমান দর্শক বলিবেন, গাড়ীখানি লাল—ঠিক্ লাল নয়—একটু একটু মেটে লাল রঙের; আরোহী বলিবেন, ইহার কিছুই রঙ নাই, তিনি গাড়ীতে উঠিবার সময়ে রঙের কোনও চিহ্ন দেখেন নাই, কিন্তু গাড়োয়ান কিছুতেই এ সব স্বীকার করিবে না, সে বলিবে সে অনেক টাকা খরচ করিয়া তাহাতে বার্ণিস করিয়াছিল। তা যাই হউক, সূর্য্যের কিরণে পুড়িয়াই হউক, আর রাস্তার সুরকির গুঁড়া লাগিয়াই হউক, গাড়ি খানি আচক্রশীর্ষ রাঙ্গা রঙে রঞ্জিত। বয়োধর্ম্মে এক দিক্ একটু নুয়াইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এক দিকের চাকা উচু ও একদিকের নীচু হইবারই কথা। কত কাষ্ঠখণ্ডের তালিকা সংযোগে তাহা নির্ম্মিত তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এক দিক্‌কার একখানা দরজা, কি জানি কেন, নির্ম্মাতার স্মৃতিভ্রংশে গঠিতই হয় নাই, রৌদ্র নিবারণের জন্য সে দিকে একটা মোটা কাপড় টাঙ্গান রহিয়াছে। সে গাড়ির বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গঠন, বিচিত্র শব্দ, বিচিত্র গতি। এ-হেন শকটের বাহকদ্বয়ও অবশ্যই যে বিচিত্র জীব হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, নহিলে সেই কঙ্কালসমষ্টিদ্বারা যে গাড়িটানারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে তাহা কেহ কখন বিশ্বাস করিতে পারে না। একটার মেরুদণ্ড অপরটার মেরুদণ্ড হইতে উচ্চতায় অন্যূন এক ফুট ৫ ইঞ্চি হইবে। প্রথম যখন পৃষ্ঠদেশ হইতে মাপ চলিত, তখন যে ছোট, সে তাহার সহযোগীর সহিত উচ্চতা পোষাইয়া' লইবার জন্য তাহার মেরুদণ্ডটী পিঠ হইতে অল্পদিনের মধ্যে

এতই ছাড়াইয়া তুলিয়াছিল যে, আর অল্প দিনেই প্রায় সমকক্ষ হইতে পারিত, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীও যখন দেখাদেখি আপনার মেরুদণ্ড পিঠের উপর ঠেলিয়া তুলিল, এবং তদধিক স্ফীততায় পৃষ্ঠদেশ হইতে মেরুদণ্ডের সম্যক্ বিচ্ছেদ ঘটিবার লক্ষণ হইয়া উঠিল, তখন আর কোন উপায়ই রহিল না। অশ্ব দুটী বিষম বকেয়া। চক্ষে জল ঝরিতেছে, মুখে গাঁজা উঠিতেছে, পায়ে ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে; কিন্তু উপায় নাই—গাড়োয়ান ছাড়ে না, তদধিক আরোহীও ছাড়ে না,—গাড়োয়ান একটু থামাইতে চাহিলে আরোহী রাগিয়া উঠে। তবে এখন যে থামিয়াছে, সে আরোহীর নিজের গরজে। আরোহী একটী সভ্যবেশধারী বাবু।

গাড়ি দাঁড়াইবা মাত্র আরোহী বাবু গাড়ির দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দোকানের দিকে তাকাইলেন। দোকানী তাহা দেখিল, কাজেই হেমের সঙ্গে আর কথা হইল না। দৌড়িয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—"কি চাই বাবু, আসুন, তামাক ইচ্ছে করুন।"

বাবুর নামিয়া দোকানে গিয়া একবার 'তামাক ইচ্ছে' করিবার মন হইয়াছিল কি না ঠিক্ বলিতে পারা যায় না, কিন্তু হঠাৎ দোকানের ভিতর হেম ও রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল; কি জানি কেন, রৌদ্রের ভাণ করিয়া দরজাটী কতক মুদিয়া দিলেন। বোধ হয় তখনই গাড়ি চালাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলেন দোকানী সম্মুখে দাঁড়াইয়া। একটু থতমত খাইয়া তাহাকে বলিলেন, "আর নামিব না, আমায় একটা ডাব দাও।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দোকানী দৌড়াইয়া সশব্যস্তে একটা ডাব ছুলিয়া মুখ কাটিয়া বাবুর নিকট ধরিল। যদি কেহ দেখিয়া শুনিয়া থাকিত, সে দেখিতে পাইত ডাবের ভিতর হইতে ধূম উঠিতেছে তাহা এত গরম যে স্পর্শ করা দুরূহ। কিন্তু বাবুটার সে সব দেখিবার সময় তখন ছিল না। তাড়াতাড়ি জলপান করিলেন, কতক জল উদরস্থ হইল, কতক নাক মুখে চোখে ও কাপড়ে পড়িয়া ঢেউ খেলিতে লাগিল, কতক বা তাহার ভিতর পড়িয়া রহিল, বাবু তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া, পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দোকানীকে দিলেন। দোকানী পয়সা দুটী হাতে লইয়া তাহার অচলত্বসচলত্ব পরীক্ষা করিতে লাগিল, কাজেই বাবুর চঞ্চলতা সে বড় অনুভব করিতে পারিল না। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে গাড়ি ছাড়িবার জন্য হাঁকিলেন। মাতলিবংশধর গজর গজর করিতে করিতে আবার গিয়া আপনার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। একবার লাগাম ধরিয়া টানিলেন। ঘোটকদ্বয় ভাবিয়াছিল, এইখানেই বুঝি আজিকার মত তাহাদের গাড়িটানা চাকুরির বিরাম হইল, তাহা ভাবিয়া এক্ষণে মহানন্দে ধীরে ধীরে লেজ নাড়িতেছিল; সহসা লাগামের টান পড়াতে একবার চমকিয়া যুগপৎ দুইজনে পশ্চাৎ চাহিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠের সহিত সেই চিরপরিচিত চাবুকের সংস্পর্শ হইবা মাত্র আর বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, মনের কষ্ট মনে মারিয়া, প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঝুপু ঝুপু তালে নাচিতে নাচিতে চলিল। তখন, ঝনর ঝনর

ধড়র করিতে করিতে এঁকিয়া বেঁকিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে গাড়িখানি চলিতে লাগিল, আর, বাবু ভিতরে বসিয়া নাগরদোলার সুখ অনুভব করিতে করিতে চলিলেন।

তখন, দোকানী আসিয়া হেমকে বলিল "কৈ ঠাকুর গেলে না, আর কেন ত্যক্ত কর, আমার বড় ঘুম পাইয়াছে।'

হেম ঈষৎ বিরক্ত হইল; বলিল "কি রকম ঘুম বাপু তোমার? এই তো ডাব কাটিয়া রাস্তায় গিয়া একজনকে দিয়া আসিলে, তখনও কৈ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িলে না।"

দোকানী একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল "সে কথা তোমায় কি বলিব, ঠাকুর? আমরা ব্যবসাদার লোক, খদ্দের পেলে আমাদের ঘুমই কি আর বোদই বা কি।"

হেম বলিল "তা, আমরা কি খদ্দের নই?"

"খদ্দের! খদ্দের হ'লে দোকানে কেন, মাথায় করিয়া বসাইতাম। তোমরা কিসের খদ্দের ঠাকুর? এসেছ সেই দুপুর বেলা, এতক্ষণে সিকি পয়সারও সামগ্রী কি নিয়াছ? বরং ঐ ঠাকুর আমার দেড় পয়সার তামাক পোড়াইয়াছেন। তা যাও ঠাকুর, তার আর দাম চাইনে, তোমাদের মত অনেক খদ্দের দেখিয়াছি, এখন যেখানে যাবে যাও।"

দোকানীর সহিত আর কোনও কথা কহিতে হেম পারিল না। বড়ই অপ্রতিভ হইল। অপ্রতিভ দোকানীর কথার জন্য নহে; অপ্রতিভ এই জন্য যে, বেলা যায়, এতক্ষণ ধরিয়া সে কেবল আপনার চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিল, রামকৃষ্ণের আহারের জন্য সে কিছুই উদ্যোগ করে নাই। হেম, দোকানীকে বলিলেন "অনেক পথ চলিয়া আসিতেছি, তাই একটু বসিয়া ঠাণ্ডা হইতেছিলাম, আর বিশেষ তুমি গল্পে মত্ত ছিলে কাজেই তোমাকে কিছু বলি নাই। তা তুমি শুইতে চাও, শোও, কিন্তু বলিয়া দাও আর দোকান কোথায় আছে, সেখানে গিয়া খাবার দাবার লই।'

দোকানী ভাবিল, খরিদ্দারগুলি নিতান্তই বুঝি ভুয়ো নয়, তখন একটু নরম হইয়া বলিল "হাঁ যদি খাবার ইচ্ছে করেন, অন্যত্র যাবার দরকার কি, এখানেই যোগাড় করিয়া দিতেছি।" তখন দোকানী একে একে তাহার দোকানস্থিত দ্রব্যাদির নাম করিতে লাগিল এবং তাহার মধ্যে কি কি আবশ্যক তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

দোকানীর ব্যবহার দেখিয়া, বড় কষ্টেও হেমের ঠোঁটে একটু হাসি আসিল। হেম রামকৃষ্ণকে বসিতে বলিল। রামকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বেই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, তখনও আপনা আপনি রাগে তিনটা হইয়া ফুলিতেছিল। হেমের কথায় বলিল "কি! এখানে! এই পামণ্ডটার দোকানে জলগ্রহণ! কখনই নয়।"

রামকৃষ্ণের উপর দোকানিও একটু চটিয়াছিল, সে বলিল "ঠাকুর, কুলীন বামনের বড় রাগ তা আমি জানি, কিন্তু এ শ্বশুরবাড়ী নয়। খালিপেটে অত রাগিলে আপনারই ক্ষতি, এখন ব'সে জলযোগ কর।"

দোকানীর কথাগুলা রামকৃষ্ণের বড়ই লাগিল; কিন্তু দেখিল দোকানী কেবল কথায় বলিল না, কাজেও তাহাই করি-

তেছে। সে জায়গা করিয়া পাত পাড়িয়াছে, তাহার উপর চিড়া সাজাইয়াছে, কাছে দৈয়ের বাটী রাখিয়াছে, আর সেই সর্ব্ব-মনোহর দেবভোগ রম্ভা এক একটী করিয়া কাঁদি হইতে পাড়িতেছে। দেখিয়া রাম কৃষ্ণের জিহ্বায় জল আসিল। সুতরাং সেই জলের স্রোতে রাগের গরমটা কতক কাটিয়া গেল। রামকৃষ্ণ রাগ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, জ্বলিত জঠর ততই সেই শোভমান ভোজ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিল; কাজেই ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামকৃষ্ণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।

হেম বলিল 'হাত মুখ ধোও, আহার কর।" তখন হেমের কথা, দোকানীর কথা, আর উদরের কথা এক দিকে, আর একা রাগ এক দিকে, কাজেই রাগ হারিয়া গেল। তখন ক্রোধাগ্নি ও জঠরাগ্নির মধ্যে কোন্ অগ্নি বেশী তীব্রতর তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত অগত্যা রামকৃষ্ণ হাত মুখ ধুইয়া যথার্থ বিচারকের ন্যায় সেই ভোজ্যশোভিত পাত্রের নিকটে বসিয়া তাহা উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেমের অশৌচ, হেম দোকানীর জল খাইবে না। হেম কিছু খাইল না।

আহারান্তে দোকানী তামাক সাজিয়া দিল, রামকৃষ্ণ তামাক খাইতে লাগিল, আসিয়া পর্য্যন্ত সেই প্রথম বার ছাড়া এ রকম তামাক সে আর খায় নাই। হেম পয়সার হিসাব করিতে বলিলেন। দোকানী বলিল—'সাড়ে পনর পয়সা। তা যাক, আপনারা ব্রাহ্মণ, আদ পয়সা আর দিবেন না,—পনর পয়সা।"

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল হেম উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। রামকৃষ্ণ আর একবার তামাক খাইয়া উঠিলেন। উভয়ে দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র হেম দেখিতে পাইলেন সেই বাদাম তলায় যেখানে সেই বাবুটির গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল সেই খানে কি একখানি কাগজ পড়িয়া। কৌতূহল বশতঃ তাহা গিয়া কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, একখানা চিঠি। ছাঁৎ করিয়া হেমের সেই বাবুর কথা মনে পড়িল। বাবু যখন একবার গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখেন, আবার তখনই কিসের জন্য চন্ বন্ করিয়া গাড়ীর ভিতর মুখ লইয়া যান, তখনই যেন হেমের কি সন্দেহ হইয়াছিল। হেম চিঠিখানি গাঁটে গুঁজিয়া রামকৃষ্ণকে বলিলেন "সেই যে একখানা গাড়ি আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়াছিল দেখিয়াছিলে?"

"দেখিয়াছি—কেন?"

"সেই বাবুটীকে দেখেছিলে?"

"দেখছি।"

"চিনিতে পেরেছ?"

"তাকে আর চিনি না?"

"কে বল দেখি?"

"শশী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"শশী।"—কথাটা খট্ করিয়া হেমের কানের ভিতর গিয়া বাজিল। তা, হেম নিজেও তো তাহাই ঠাওরাইয়াছিল; কিন্তু তবু রামকৃষ্ণের মুখে ঐ নাম শুনিবামাত্র যেন একটা নূতন ভাবের উদয় হইল। মানুষের এমন সময় অনেক আসে যখন সে নিজে যাহা বুঝে তাহার প্রতি তখন ততটা লক্ষ্য করে না, কিন্তু যখন অপরের অনুমানের

সহিত তাহার অনুমানের ঐক্য হইয়া যায়, তখন যেন সেই বিষয়টা একটা নূতন আকার ধারণ করিয়া মনের ভিতর হঠাৎ এক প্রকার বিপ্লব করিয়া তুলে। হেমেরও ঠিক্ তাহাই হইল। সে প্রথম দর্শনেই ভাবিয়াছিল, সে বাবু অন্য কেহ নয় তাহাদের শশীই বটে। কিন্তু তখন এ চিন্তার উপর বড় একটা মনোযোগ দেয় নাই, এখন রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সে যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, 'শশী! মহামায়ার ভাই শশী!"

হেম রামকৃষ্ণকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিল। যাইতে যাইতে হেম আবার ভাবিল "শশীই বটে। কিন্তু শশী কেন আমাদিগকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিল না, কেনই বা ত্রস্তে দরজার পাশে মুখ লুকাইল? অবশ্যই শশী আমাদিগকে চিনিয়া থাকিবে। মহামায়া মনোরমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে সেই জন্যই কি লজ্জায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিল না? তা, তার কি দোষ? মহামায়া তার বোন্, কিন্তু বিরাজও তো তার বোন।" হেম ভাবিল, ভগবানের কি সৃষ্টি। এক বৃন্তে দুটী ফুল ফোটে, একটী সৌরভে উদ্যান আমোদিত করিয়া শোভা পায়, তার পর কোনও ঋষিবালা তাহা তুলিয়া দেবপূজা করে, আর একটী কীটের আবাসভূমি হইয়া সেই আশ্রিত কীট-কুন্তনেই ভূমে পড়িয়া লোকের পদতলে মর্দ্দিত হইয়া পচিয়া গলিয়া যায়। মহামায়া ও বিরাজ সহোদরা—ভগবানের কি বিচিত্র সৃষ্টি! এ কথা ভাবিতে মুহূর্ত্তে হেমের সব কথা মনে আসিল। হায় হায়! কি ছিল, আর কি হইল! এমন সংসার একেবারে রাতারাতি ছারখার হইয়া গেল! কেন এমন হইল? কে এমন করিল? ভরন্ত ভাতের হাঁড়িতে লাথি মারিয়া কে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া দিল? হেমের একবার তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু এখন নয়; আগে মাতৃকৃত্য হইয়া যাউক, তার পর মনোরমার সন্ধান করিয়া তবে সে অন্য কাজ করিবে। কিন্তু, মনোরমা।—মনোরমার সন্ধান কোথায় মিলিবে? সহসা সেই দোকানীর কথোপকথন মনে পড়িল। অল্পক্ষণ হেম তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল। কি ভাবিয়া হেম থমকিয়া দাঁড়াইল। রামকৃষ্ণ কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল, হেম তাহাকে ডাকিল। কাছে আসিলে বলিল, "দেখ, এই গ্রামে বোধ হয় মনোরমা আছে। এখানে পদ্মর ঘর কোথায় বাস তাহার সন্ধান লইতে হইবে।"

রামকৃষ্ণ বলিল "অমন করিয়া তুমি তো সব গ্রামই খুঁজিতেছ, কিন্তু কৈ পাইতেছ না তো? অনর্থক এখানে আর দেরি করিয়া কাজ নাই; সন্ধ্যার ভিতর গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিতে পারিব না।"

সে দিন গঙ্গাতীরে পৌঁছিবার কথা ছিল, হেম তথায় গিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে স্থির করিয়াছিল। পরদিন অশৌচান্ত, সুতরাং আজ যাওয়াই চাই। সুধু গেলেই হইবে না, কিছু ভিক্ষারও চেষ্টা দেখিতে হইবে, কাজেই একটু পূর্ব্বে না গেলেই নয়।

হেম বলিল—"তা হউক, আমার খুব মনে হইতেছে এখানেই তাহাকে পাইব। আর জ্যোৎস্না রাত্রি আছে, বেলা যায়, জ্যোৎস্নায় পথ চলিব।"

রামকৃষ্ণ বলিল "তবে চল। কিন্তু পদ্মর মার নাম করিতেছিলে সে কে?"

হেম বলিল "সে এক বুড়ী, আমাদের গ্রামে সর্ব্বদা যাইত, আমি তাহাকে চিনি।" হেম সকল কথা রামকৃষ্ণকে ভাঙ্গিলেন না। রামকৃষ্ণও অতসতো বোঝে না, পদ্মর মার অনুসন্ধানে হেমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় পদ্মর মার সন্ধান মিলিল। দুইজনে গিয়া তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। পদ্মর মা ব্রাহ্মণের মেয়ে, তখন পৈতা তুলিতেছিলেন। হঠাৎ দুইজন বিদেশীকে বাড়ীর ভিতর দেখিয়া বুড়ী কিছু থতমত খাইল। চুল পাকিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে—রামকৃষ্ণ ও হেম তাহার পৌত্রের বয়সী, তথাপি বৃদ্ধা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র মাথায় কাপড় একখানি কম্বল [illegible] আলা বাহির [illegible] দিল। আর, এখনকার মেয়েরা হইলে তখনই অনধিকার-প্রবেশের ধারা ধরিয়া নিশ্চয় তাহাদের প্রতি পিনাল কোডের একটা ব্যবস্থা করিত। রামকৃষ্ণ ও হেম উঠিয়া বসিল, বৃদ্ধা গিয়া পাশের বাড়ী হইতে একটী বালককে ডাকিয়া আনিল। পৌত্রের বয়সী, তথাপি তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লজ্জা! হায় সেকাল!

বালক আসিয়া আপনাদের বাড়ী হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। হেম তামাক খায় না, সুতরাং হুঁকাটী রামকৃষ্ণের একচেটিয়া হইল। একমনে রামকৃষ্ণ হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিল। তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য হুঁকার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা গেল না। হেম দেখিলেন, এ বড় ভাল কথা নহে। সে ভাবিয়াছিল, যাহা বলিবার তাহা রামকৃষ্ণই বলিবে, কিন্তু হুঁকা পাইয়া অবধি রামকৃষ্ণ হইতে সে ভরসার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া হেম প্রথমতঃ বৃদ্ধাকে মাতৃসম্বোধন করিল, তার পর তাহাদের আগমনের কারণ জানাইল।

বৃদ্ধা হেমের মাতৃসম্বোধনেই প্রগলে গলিয়া গিয়াছিল, তার পর যখন জানিল যে হেম মনোরমার ভ্রাতা আর রামকৃষ্ণ তাহার স্বামী, তখন কষ্টের পরিসীমা রহিল না। বলা বাহুল্য, মনোরমাকেই বৃদ্ধা পথ হইতে কুড়াইয়া আপনার বাড়ীতে আনিয়াছিল, এবং দোকানে তাহারই কথা সেই সব লোকে আন্দোলন করিতেছিল। যে সময়ে মনোরমা 'মা মা' করিতে করিতে পথের উপর ধূলায় পড়িয়া মূর্চ্ছা যায়, সেই সময়ে পদ্মর মা তাহার পিত্রালয় হইতে ভাইয়ের সঙ্গে আপনার বাড়ীতে আসিতে- [illegible] সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

হেমের কথায় বৃদ্ধার বড়ই দুঃখ হইল। হেম যদি দেখিতে পাইত তো দেখিত, তাহার চক্ষুদুটীও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধা তখন সেই বালককে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া মনোরমা সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিত, সব বলিল। বলিল—"আহা, বাছার বয়স আমার মেয়ের বয়সের জুড়ি, দেখিতে তেমনিটী। আমি হতভাগী, পদ্ম আমার আমাকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। সেই পর্য্যন্ত আর কোন ছেলে মেয়ের উপর মায়া করি না, তা তাহাকে দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না, মন আপনিই কেমন তাহার জন্য ব্যাকুল হইল। তা, বাছা আমার আমার

ফেলিয়া বাক্সে চলিয়া গেল।” বলা বাহুল্য, বৃদ্ধার কন্যার নাম পদ্ম; সে আজ পাঁচ বৎসর সূতিকাগারে মারা গিয়াছে।

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া হেমেরও বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মনোরমা যখন সেখানে নাই, তখন তথায় আর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। হেম বলিল “তবে এখন আসি।”

বৃদ্ধা সে দিন কোন মতেই যাইতে দিতে চাহে না। হেমের না গেলেই নয়। অগত্যা বৃদ্ধা বলিল ‘তবে, এস; মেয়েকে পাইলে একবার আমায় দেখাইয়া লইয়া যাইও।” একদিনেই মনোরমার উপর তাহার বড়ই মায়া বসিয়াছিল। একদিনেই মায়া বসা নিতান্ত অসম্ভব নয়। জানি না, কি ক্ষণে কে কাহাকে কি দেখে যে প্রাণান্ত হইলেও আর সে তাহাকে ভুলিতে চাহে না। এ দৃষ্টান্ত মনুষ্যচরিত্রে নিতান্ত বিরল নহে।

রামকৃষ্ণ [illegible] হতাশায় মনোরমাকে [illegible] বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল, হেম তাহাকে গা ঠেলিয়া ডাকিল। ডাকিতে হুঁকা, হুঁকা হইতে কলিকা, কলিকা হইতে আগুন সব পড়িয়া গেল। হেম অপ্রতিভ হইল, তাড়াতাড়ি বিছানা ঝাড়িয়া সে সব উঠাইয়া রাখিল। তখন, বৃদ্ধার কাছে বিদায় লইয়া দুইজনে প্রস্থান করিল।

রামকৃষ্ণ বলিল “কৈ হেম, মনোরমাকে তো পাওয়া গেল না।”

“তাইত!” হেম একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

তখন দুইজনে নির্ব্বাকে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণমাত্রেই হেম অপেক্ষা রামকৃষ্ণ অনেক আগাইয়া পড়িল। খানিক দূর গিয়া হেমের কি মনে পড়িল, একবার গাঁটে হাত দিল। দেখিল, সেই কুড়ান চিঠি গাঁটে গোঁজা রহিয়াছে। কেমন কৌতূহল হইল, ধীরে ধীরে চিঠিখানি বাহির করিয়া হেম তাহা খুলিল। ধীরে ধীরে তাহা পাঠ করিল। সর্ব্বনাশ। এ কি! তাহাতে লেখা—‘আমি এ কয় দিন ধরিয়া বসুমতীকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলাম না। দিন রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ সকাল হইতে তাহার বড় জ্বর হইয়াছে। ভয়ানক গায়ের তাত। আমি মেয়ে মানুষ, কি করিব? পত্রপাঠমাত্র তুমি সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিবে।” পত্রে ঠিকানা নাই, লেখিকার নাম নাই।

পত্র পড়িয়া কতক্ষণ হেম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে যেন তাহাকে হাত পা বাঁধিয়া আকাশ হইতে ফেলিয়া দিল। [illegible] করিবার ক্ষমতা তাহার রহিল না। হেম আবার সে পত্র পড়িল।—আবার পড়িল। সেই একই কথা। এ কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! কিন্তু, কে এ? লেখিকার নাম নাই—কিন্তু নাই থাকুক, এ নিশ্চয়ই ব্রহ্মঠাকুরুণ। হেম সে গ্রামের অনেকের মুখে শুনিয়াছিল ব্রহ্মঠাকুরুণই বসুমতীকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে যেই হউক, শিরোনামায় শশীর নাম কেন? তবে কি শশীরই এই কাজ! এই জন্যই কি সে আমাদিগকে দেখিয়া গাড়ীর ভিতর মুখ লুকাইয়াছিল? তা, বসুমতীর সহিত আমাদের পরিচয় আছে সেই বা জানিল কেমন করিয়া? হে ভগবন্, এ কি রহস্য, ঠাকুর? হেম আবার পত্রের এ পিঠ ও পিঠ চারিদিকে ঠিকানার অনুসন্ধান করিল। কিছুই লেখা নাই।

...বারে প্রত্যয় হইল না, দুইবার দেখিল, ...বার দেখিল, ঠিকানা তো নাই। ...নী—তাহার সেই বসুমতীর উদ্দেশ ...ল, কিন্তু, সে যে কোথায় তাহা ...নতে পারিল না। যে বালিকা পীড়িত ...য, না জানি কত কষ্টই পাইতেছে। ... মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। মনে মনে ...ক্ষপ করিতে লাগিল, 'হায়, কেন তখন শশীর গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম না? এখন দৌড়িয়া গেলেও কি আর তাহার নাগাল ধরা যাইবে না?" একবার দৌড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিল, আবার তখনি তাহার অকার্য্যকারিতা মনে হইল। হেম দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। আপনার চির-দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া সজোরে কপালে করাঘাত করিল। [ক্রমশঃ

সখের বাউল

বা

বাউল বিংশতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১ম দল।

...র সুর—রাগিণী পাহাড়ী—একতালা

...ম নহে এই মরুভূমের তরুর ফল।
...সেই সুধাকরে সুধা করে ঢল ঢল্।

তৃষাতুর চকোর যে জন
ঊর্দ্ধমুখে অনিমেষে দ্যাখে অনুক্ষণ
দিবানিশি প্রাণ উদাসী, আঁখি দুটী
ছলছল্।

বিষামৃত লতা রমণী,
...ল ফুলে আলো কোরে আছে ধরণী,
আননে অমিয়া মাখা, নয়নেতে—
রমণীর নয়নেতে হলাহল।

... জগত জীবন
... কোথা থেকে, আসে সমীরণ,
...সেই ... কে আমাদের—
...ধপা ভাই, কে আমাদের আছে বল!

২য় দল।

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী—একতালা

ফক্কিকার,
ফক্কিকার—ফক্কিকার—ফক্কিকার।
আমি চোক্ বুজিয়ে সুধুই দেখি অন্ধকার।
ডুবে ডুবে কতই খুঁজি সাগরের তলে,
কই, মাণিক কই জলে?
তুমি আকাশ-ছাঁদা ধোরে চাঁদা
কবে দিওনা আমার;
ঘোর ওলট্ পালট্ হচ্ছে কেবল, রচ্ছে সকলি,
গোল্ চাকার মতন চক্রখানি বোঁবোঁ করে
ঘোরে আপনি;
এর কোন্‌টা গোড়া, কোন্‌টা আগা?
বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপার।
আছে বিশ্ব-জয়ী-শক্তিময়ী নারী এ ধরায়,
তাই নরে নিধি পায়;
আমার সেই স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ,
ধারি কেবল প্রেমের ধার।

১ম দল।

বাউলের সুর – রাগিণী ললিত বা পুরবী
ঢিমে তেতালা।

বেলা নাই, বেলা নাই রে, হয়েছে যাবার বেলা।
ভাঙা হাটে নবীন ঠাটে আরো কত
খেল্‌বি রে রসের খেলা—
ও পাগল মন, খেল্‌বি রে রসের খেলা!

চারি দিক্‌ ধুঁযার আকার,
সমুখে বিষম ব্যাপার।
কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের
জ্বালা!

॥৭॥

২য় দল।

নিধু বাবুর টপ্পার সুর—
রাগ ভৈরব—একতালা।

সে মুখ-কমল সদা ঢলঢল
হাসি হাসি, সুখে দেখিবে ভাই।
প্রেমের আনন্দ মাঝে মরণের ভয় নাই।
মধুর মধুর মধুর প্রাণ,
মধুর মধুর মধুর ধ্যান,
অতি মধুর সেই-ই দিন, পূর্ণ পরিতোষ পাই।

না জানি কোথায় কি ফুল ফোটে,
সৌরভে হৃদয় নাচিয়া ওঠে,
মত্ত হয়ে খোলা প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই।

॥৮॥

১ম দল।

বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী—একতালা।

সবই গেছি ভুলে,
আমি সবই গেছি ভুলে।
জাগ হে প্রাণের প্রাণ দাও মনের ধাঁধা খুলে।

ভিতরে কাতরে প্রাণী,
সুখী ভেবে অভিমানী,
মরণ যে কি বিষাদ যেন তা জানিনে মূলে।

আহা সে পবিত্র পদ!
পূর্ণানন্দ, নিরাপদ,
পরম সম্পদ আমার, ত্যজি, পূজি নারী-কূলে।

করুণ কিরণে কার
বিকশিল প্রেম আমার,
সৌরভে উন্মত্ত হ'য়ে কারে দিলেম বিনি

স্নেহ ভক্তি ভালবাসা,
মেটেনা—মেটেনা আশা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসি সুধাসিন্ধু-কূ

॥৯॥

২য় দল।

৺রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নন্দবিদায় যাত্রা
রাগিণী ভৈরবী—মধ্যমান।

সে দুটী নয়ন।
জীবন আমার।
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিরণে তাহার।
সে সুধাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
হেসে খেলে চলে যাব, ভাবনা কি তার

যে জন্যে এখানে আসা,
পরিপূর্ণ [illegible]
কুধিয়া অন্যের [illegible]
[illegible]

১ম দল।

ভজনের সুর। ভৈরব—কাওয়ালি।

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই।
আর প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইব না পথ-হারা,
ওই জ্বলে শুক-তারা।
দূর—অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই।
আহা কি সুগন্ধ-ময়
পবিত্র সমীর বয়,
জাগিয়া প্রাণের পাখী কি ললিত গায় রে।
কতই সাধের চাঁদ
রতির মোহন ফাঁদ,
সাধের স্বপন কেন আপনি ফুরায় রে।
আসিছেন ঊষা-রাণী
বিকশিত মুখ-খানি,
কেমন প্রফুল্ল প্রভা দিকে দিকে ভায়।
প্রফুল্ল কুসুম বন, নিমগন তারাগণ,
দিগ্ দিগন্তর কিবা নূতন দেখায়!
আকাশের নীল জল
অতি ধীর ঢল ঢল,
না জানি ভিতরে আছে কি শুভ্র সুন্দর ঠাঁই!
জাগিছে জগত-বাসী
মুখ সব হাসি হাসি,
দশ দিক্ হাসি রাশি, এমন সুদিন নাই।
কল্পনা ললনা বুকে
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে ম'রে যাই।
হে প্রোজ্জ্বল দিনমণি,
মহান্ সত্যের খনি,
উদার আনন্দ মূর্ত্তি।
প্রত্যক্ষ যা দেখি নাথ, সদা যেন দেখি তাই!

॥১১॥

২য় দল।

বাউলের সুর—ললিত ভৈরবী তেতালা।

প্রেমের সাগরে কুল তরণী
চির-বিকসিত নলিনী!
যৌবনেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়-
দেখ তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।
আননে চাঁদের আলো,
চাঁচর কুন্তল-জাল,
অধরে আনন্দ-জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী—
হাসে, নয়নে মন্দাকিনী।
কে তুমি সুষমা মেয়ে
আছ মুখ-পানে চেয়ে
আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো কোরে ধরণী!
সমীর আমোদে ভোর,
ডেকে আনে ঘুম্ ঘোর,
মধুর মধুর গান,
আলসে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজায় বীণা, ঘুমা'য়ে প্রাণে,
প্রাণ যে আমার কি হ'য়ে যায় জানিনি!
জাগিয়া অচেতন,
ঘুমালে জাগে মন;
তুমি সাধের স্বপন-বালা, করুণা-কমলিনী।
ও রাঙা চরণ-তলে
ধর্ম্ম কাম মোক্ষ ফলে,
তুমি, মৃত্যুর অমৃত লতা পাপ-তাপ-হারিণী।
তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার প্রাণে পূর্ণ-চন্দ্রোদয় সারা দিবা-রজনী।

॥১২॥

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

শক্তি-কানন। ইহা এক খানি উপন্যাস। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার রচয়িতা। শ্রীশ বাবু বঙ্গ সাহিত্যে অপরিচিত নহেন; ইঁহারই তত্ত্বাবধায়কতায় 'বঙ্গদর্শন' এক দিন বিশেষ তেজের সহিত চলিয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ বাবুর উপন্যাস লেখা এই প্রথম। এই প্রথমেই শ্রীশ বাবু তাঁহার রচনায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার কথা লইয়া ইহা লিখিত। নায়ক জগন্নাথ আচার্য্য কবিকল্পনার একটী মোহিনী সৃষ্টি। জগন্নাথের হরিভক্তি অতুলনীয়। তিনি চাঁদ দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া পড়েন, পাখীরা যখন তাঁহার চারি দিকে নৃত্য করিতে করিতে কূজন করিতে থাকে, তিনি আত্মহারা হইয়া যান, প্রকৃতি তাহার শান্ত শ্যাম ছবি যখন তাঁহার সম্মুখে ধরে, তখনই তিনি ভাবে গদগদ হইয়া উঠেন; দূরাগত সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে থাকে, শেষ তিনি এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে তখনি তাঁহার "দশা" আসিয়া উপস্থিত হয়—জগন্নাথ তখন ত্রিভুবন তাঁহার হৃদ্‌বিরাজিত সেই বৃন্দাবনধন মুরলীধর হরিমাত্রাত্মক দেখেন, আম্র বৃক্ষকেও কদম্ব বৃক্ষ বলিয়া মনে হয়। প্রসন্ন উদার মূর্ত্তি— তদনিক প্রসন্ন উদার হৃদয়—ভক্তের এরূপ চিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসে দুর্ল্লভ।

আর, এই জগন্নাথের পার্শ্বে জগদীশ! আলোকের পাশে অন্ধকার, দিবার পাশে রাত্রি, পুণ্যের পাশে পাপ! গ্রন্থকার এই দুইটী চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, ভক্তির কাছে কিছু নাই। ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার মুক্তির পথে কেহই কোন কাজের নয়। কিন্তু ইহা দেখাইতে গিয়া, দেখিতে পাই, গ্রন্থকার জ্ঞান-ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠতা অনেকটা মানিয়া লইয়াছেন। আমরা তাহা বুঝি না। বুঝি, ভক্তিই—ভক্তি অর্থে অবশ্য ভণ্ডামি নহে, সাধারণ ভক্তি কথাও বলি না—প্রকৃত ভক্তিই সাধনা একমাত্র সিঁড়ি; জ্ঞানকে তাহার পিছে জুড়িয়া দিবার ততটা আবশ্যকতা নাই জ্ঞান কখন পূর্ণ হয় না, সুতরাং জ্ঞানে ভক্তিকে মার্জ্জিত করা বড় কঠিন কথা তা ছাড়া, জ্ঞানে তর্ক আনে, তর্কে আঁধার বাড়ায়। তাই সাধক বলিয়াছেন—

"ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

জগদীশ দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কিন্তু তাহা ভক্তি ছিল না, তাই তাহার সে দুর্দ্দশা ঘটিল। কিন্তু, মহাপুরুষ যখন তাহাকে শক্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তখনও তো তাহার হৃদয়ে সেই নরকের আগুন নিবিল না। বহু চেষ্টা করিয়াও চিত্ত স্থির করিতে না পারিয়া জগদীশ যখন কাঁদিয়া গুরুর পদতলে আপনার হৃদয়ের অবস্থা জানাইল, তখন হতাশ হইয়া যোগী বলিলেন—"অনেক আশা করিয়াছিলাম এ মহাব্রতের যোগ্য পাত্র তুমি তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানে ভক্তিযোগ না হইলে শক্তি ধর্ম্মের পরিত্রাণ নাই—কোন ধর্ম্মেরই নাই।" গুরুদেবের এ কথায় জগদীশ বিহ্বল হইলেন

বলিলেন—"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" কিন্তু জগদীশ একদিন যখন জগন্নাথকে ঐরূপ জ্ঞানভক্তি-যোগের কথা বলিয়াছিলেন, তখন জগন্নাথ প্রশান্তভাবে বলিয়াছিলেন 'যাই বল—ভক্তিই সব। মহাপ্রভু কি জ্ঞানহীন ছিলেন? তিনি জ্ঞান ছাড়িয়া শুধু ভক্তি সার কেন বলিয়াছিলেন কেন?" মহাপুরুষ গোড়াযই ভুল বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে জগদীশের সম্বন্ধে অতটা আশা করিয়া শেষে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। এবং সেই জগদীশ তাঁহার গুরুদেবেরই পরামর্শে অবশেষ একদিন তাহার সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়া বালকের ন্যায় রোরুদ্যমান কণ্ঠে জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—"আচার্য্য, আমায় দীক্ষা দাও—আর সহিতে পারি না।" জগদীশের সেই প্রগাঢ় জ্ঞানে কি ভক্তিযোগ হয় নাই? হইয়াছিল বৈ কি। তাহা নহিলে সেই দাম্ভিক নাস্তিক কখনই একদিন ভবানীর পদতলে পড়িয়া হৃদয়-যন্ত্রণায় সেরূপ করিয়া লুটাইতে না। তবে গুরুদেব শেষ তাহার জন্য এ ব্যবস্থা করিলেন কেন? গুরুদেব ফুটিয়া কিছু না বলুন, কিন্তু তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন ভক্তিই সার, ভক্তিই মুক্তি, ভক্তিই ভূমানন্দের একমাত্র প্রসূতী। তাই তিনি তাঁহার বড় আশার মন্ত্রশিষ্যকে শেষ ভক্ত-প্রধান জগন্নাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। যে ভক্ত, তাহার নিকট শাস্ত্রই কি আর জ্ঞানই বা কি। শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদ বিধাতার বরে জন্মভক্ত, তাহারা শাস্ত্রজ্ঞানের ধার কোন দিন ধারে নাই। জ্ঞান তো কখন পূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি হয় সে কখন? না, যখন সেই জ্ঞানী সর্ব্বভূতে তাহার উপাস্যকে দেখিতে পায়। কিন্তু সেরূপ জ্ঞানী বড়ই দুর্লভ। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন—

'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

কিন্তু যে ভক্ত, সে জ্ঞানের কোন ধার না ধারিয়াই 'ক' দেখিয়া 'ক'য়ে কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়।

এই উপন্যাসচ্ছলে গ্রন্থকার প্রধানতঃ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, শক্তিধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিরোধী ধর্ম্ম নহে, তাহারা একই ধর্ম্ম। জগন্নাথ আচার্য্য বলিতেছেন,—"শাক্ত যাঁকে ডাকেন মা জগদম্বে বলে, আমি তাঁকেই ডাকি প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ বলে। তিনি বৎস, তিনি সখে, তিনি স্বামিন্! সকলেই ভক্তি প্রেমের সিঁড়ি। সাধারণত তন্ত্র শাস্ত্রে মা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ ঈশ্বরে প্রযুক্ত নয় বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও অন্য সম্বোধনের ছায়া আছে। * * * কালীবিলাস তন্ত্রে কৃষ্ণমাতার রূপ আমার বড় ভাল লাগে—সেইখানে শক্তি ধর্ম্মে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মিশিত হয়েছে। অসুরনাশার্থ ভগবতী কালী রূপ ধারণ করলেন, অসুর বিনাশ হোল, কিন্তু তাঁর ক্রোধ নিবৃত্তি হলো না। সৃষ্টি লোপ হয়। দেবতারা কেহ তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলেন না, তখন নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণ বালক শ্রীকৃষ্ণ রূপে সেই ভয়ঙ্করী উগ্রচণ্ডা দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন—অমনি সে ভয়ঙ্কর ক্রোধের ভাব লয় হল, মাতা সে শিশুকে কোলে তুলে স্তন্য পান করাতে লাগলেন। * * * এ রূপকের অর্থ কি জগদীশ? আমার ত মনে হয় শাক্ত বৈষ্ণবের সন্ধিস্থল এই খানে।"

লেখক এ পুস্তকে কেবল গল্পই লিখিয়া যান নাই, তাঁহার নিজের জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। অনেক তত্ত্ব—অনেক মীমাংসার কথা ইহাতে আছে। কিন্তু গল্পপুস্তকের সমালোচনায় গল্পের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া এতক্ষণ কেবল অন্য কথাই বলিলাম, সুতরাং গল্প সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। সমস্ত গল্পটার একটা সংক্ষিপ্ত সার তুলিয়া দিই সে স্থান আমাদের নাই। জগন্নাথ এবং জগদীশ ছাড়া ইহাতে আরও অনেকগুলি চিত্র দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই যথাযথ বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। হরিদাসের

প্রভুভক্তি ও সরল গোঁড়ামি, লোকনাথের নির্দোষ দুষ্টামি, হৈমবতীর লজ্জাসর্ব্বস্ব প্রেমভরা ভাব, মৃণ্ময়ীর কোমলে কঠোর গৃহিনীপণা, প্রভার বালিকাসুলভ খেলা ধুলা আর হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া কথা কহা—এগুলি বড় মধুর। এত মধুর যে ইহাদের পার্শ্বে সেই দুষ্টা নাপিত বৌ ও দুরন্ত কাপালিক উদ্ধবকে দেখিলেই গ্রন্থকারের উপর পর্য্যন্ত আমাদের রাগ হয়।

এ ছাড়া, ডাল পালা আরও আছে। সবই যে নিখুঁত হইয়াছে তাহা বলি না। নাপিত বৌর চরিত্র বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, উদ্ধব আমাদের ভাল লাগে না, ভৈরবের সব কাজগুলা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। লোকনাথ ও প্রভার চরিত্র আরও যেন একটু ফোটা উচিত ছিল, ফুটিলে ভাল হইত—কিন্তু তেমন ফোটে নাই। আরও খুঁত আছে। ইহার সবই আছে, তবু কি যেন মস্ত বিষয়ের অভাব রহিয়াছে—তাহা ঘটনা-পারিপাট্য। ইহার প্রত্যেক অবয়ব, প্রত্যেক সূক্ষ্ম কশেরুকাটী অতি সুন্দরভাবে গঠিত, কিন্তু ইহা যাহার উপর ভর দিয়া খাড়া থাকিবে সেই মেরুদণ্ডের অভাব। একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেই বোধ হয় যেন নড়্ গড়্ করিতেছে। উপন্যাসের শেষ অংশটা বড়ই টানিয়া বুনিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছে।

তাহা হইলেও ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে ইহার ভাষায়। আগা গোড়া এক চমৎকার মোহিনী ভাষায় লিখিত। পাঠক সে ভাষার সৌরভে এতই মত্ত হইয়া পড়েন যে অন্যান্য গুণ দোষ বিচারের ক্ষমতা তাঁহার তত থাকে না। আমরা এত মিষ্ট ভাষায় উপন্যাস আর কখন পড়ি নাই। স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর, এত সুন্দর যে তাহা পড়িতে পড়িতে আমরা মুহূর্ত্তের জন্য আশে পাশ সব ভুলিয়া কেবল তাহাই প্রত্য[illegible] করিতে থাকি। লেখকের ইহা সাধা[illegible] ক্ষমতা নহে।

Helps to the engali Course foı the Entrance Examinatıon of 1888 শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

পুস্তক প্রণয়নে সাহিত্য-বিদ্ ভাষা এ ভাবের উপর, কবি কল্পনার উপর, ইতি- হাসবেত্তা ঘটনার সত্যাসত্যের উপর, দার্শ নিক গভীর চিন্তাশীলতার উপর এবং গণিত বিজ্ঞানবিদ্ সূক্ষ্মতার উপর লক্ষ্য রাখেন ভিন্নতঃ এক একটির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় অধিকাং গ্রন্থকারগণ উদ্দেশ্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কিন্তু অর্থ-পুস্তক-লেখকে একবারে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়গুলির উপ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেই জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দ অর্থপুস্তক অতিশয় বিরল। কেহ ভাষা উপর লক্ষ্য রাখিয়া, ঐতিহাসিক গবেষণা অমনযোগী হইয়া পড়েন। আবার কে দর্শন বিজ্ঞানের পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয় ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলেন এইরূপে অর্থ-পুস্তক প্রায়ই দোষশূন্য হ না। শরৎ বাবু যে সাহায্য-শরণি খানি লিখিয়াছেন ইহাতে সাহিত্য, ব্যাকরণ ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন সম্বন্ধীয় বিষ মাত্রেরই যথার্থ নিরূপণে বিশেষ মনোযো দিয়াছেন, এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষভাগে প্রবন্ধ-লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এব সমালোচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে দোষের ভাগ অতি সামান্যই আছে পুস্তকের কলেবর তাদৃশ স্থূল নহে, কি একটি মাত্রও আবশ্যকীয় বিষয়ের অঙ্গচ্ছে হয় নাই। যাহা হউক, পুস্তকখানি [illegible] প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের বিশেষ আবশ কীয় তাহার আর সন্দেহ নাই।